মাসুদ রানা
টার্গেট নাইন
দুই খণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

টার্গেট নাইন

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

কাতাঙ্গা আর্মির স্পেশাল স্ট্রাইকার ফোর্স চলল
পোর্ট রিপ্রিভে। নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যাপ্টেন লুইস পেগান
ওরফে মাসুদ রানা।

জেনারেল ফ্রস্টের উন্মাদ বাহিনীর গুলি ও
মানুষখেকো বালুবাদের বিষাক্ত তীর
তুচ্ছ করে চলেছে ওরা।

নিজ দলে রয়েছে এক হিংস্র ম্যানিয়াক। পদে পদে
বাধাবিঘ্ন। পাগল হওয়ার দশা রানার। একটা বাধা ডিঙালেই
এসে হাজির হয় তার চেয়ে বড় আরেক বাধা।
একটা বিপদ কাটলেই উঁকি দেয় আরেক বিপদ।
এলিজাবেথ ভিলে বুঝি পৌঁছানো হল না আর।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

মাসুদ রানা

টার্গেট নাইন

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7085-2
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব প্রকাশকের
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং ইনচার্জ: বি. এম. আসাদ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail. alochanabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

ছেচল্লিশ টাকা

Masud Rana
TARGET NINE
Part-I&II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীল ছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা
মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয়
শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ
কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত
ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ
জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ
অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা
স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩
*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট, অমানিশা।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

টার্গেট নাইন-১

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮১

এক

মার্সেনারি ওরা।

মদ খাচ্ছে ফ্রেড্। গলায় ঠেকে আছে পর্বত প্রমাণ অসন্তোষ। সেটাকেই মদ দিয়ে ধুয়ে নিচে নামাবার চেষ্টা আর কি। কিছুতেই মনকে মানাতে পারছে না সে। যুদ্ধ বিরতির একদিন পরেই আবার কেন তাকে যেতে হবে একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে? তাও আবার ক্যাপ্টেন লুইসের অধীনে। লোকটা যদি শ্বেতাঙ্গ হত তবু একটা কথা ছিল। একটা 'কালুয়ার' আদেশ মেনে চলতে হবে, এটা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারছে না সে।

কিন্তু স্বীকার না করেই বা উপায় কি, অনেক ওপর মহল থেকে পাঠানো হয়েছে লোকটাকে, সম্মুখ-যুদ্ধে প্রমাণ করেছে নিজের যোগ্যতা, তাছাড়া কেমন যেন একটা জাদু আছে ব্যাটার চরিত্রে, ব্যবহারে, কথায়, চাহনিতে। ইউনিটে যোগ দেয়ার সাত দিনের মধ্যে জয় করে নিয়েছে সবার হৃদয়, এক মাসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে নিজের কর্তৃত্ব। ধুলায় মিশে গেছে ফ্রেডের নেতৃত্ব, আধিপত্য, সম্মান—চাঁদের মত নিষ্প্রভ হয়ে গেছে সে এই লোকটির উপস্থিতির সূর্য কিরণে। নিজেকে সবে বিরাট কিছু ভাবতে শুরু করেছিল—আবার পরিণত হয়েছে সে সাধারণ এক মার্সেনারিতে।

'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার কাছে,' একটা ঢেকুর তুলে মন্তব্য করল ফ্রেড। 'একটা বিরাট ঘাপলার গন্ধ পাচ্ছি যেন।' মুখ বিকৃত করে কথাটা শেষ করল সে।

'তোমার মতামতের ওপর আমাদের যাওয়া বা থাকা নির্ভর করছে না, ফ্রেড্। যেতে হচ্ছেই। আমরা আগামীকালই রওয়ানা দিচ্ছি,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব এল। ওয়াশ বেসিনের উপরে লাগানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে শেভিং ক্রীম লাগাচ্ছে ক্যাপ্টেন লুইস, ওরফে মাসুদ রানা।

'তুমি ওদের বললেই পারতে যে আমরা এলিজাবেথভিলেই থাকব—অন্য কাউকে পাঠাও তোমরা।' ক্ষোভ প্রকাশ পেল ফ্রেডের কণ্ঠে। ও আশা করেছিল এবারে কয়েকটা দিন আমোদ ফূর্তি করে কাটাবে।

'কাতাঙ্গা আর্মি আমাদের টাকা দিচ্ছে আদেশ মেনে চলার জন্যে, অবাধ্য হবার জন্যে নয়।' ক্ষুরটা জুলফির নিচে ঠেকিয়ে সাবধানে নিচের দিকে টান দিল

রানা।

'তা ঠিক। কিন্তু তুমিই বলো, এটা কেমন কথা হলো—আমরা ষাট-সত্তর জন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে যাব দুশো মাইল, মাত্র কয়েকজন লোককে উদ্ধার করতে! মানুষখেকো বালুবারা তো আছেই, তার ওপর রয়েছে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া, জেনারেল ফ্রস্ট।' বকবক করেই চলল ফ্রেড। 'যার হাতেই পড়ি না কেন, বারোটা বাজবে আমাদের। কেন বাবা, কি দরকার ছিল এসবের—কি অধিকার আছে আমাদের ওই জংলী বালুবাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে আনার? মাত্র একশো জনই তো—মনের সুখে থাক না ওরা এক একটাকে ধরে, আমরা কেন বাগড়া দিতে যাই? বব্,' খালি গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল ফ্রেড্ বিছানার অন্যপাশে বসে থাকা রবার্ট ফ্লিণ্টের দিকে। 'আরেকটা লাগাও। এবারে হুইস্কি বেশি বিয়ার কম। ...কি ছিরির নাম...টার্গেট নাইন!'

বাধ্য ছেলের মত উঠে গেল বব খালি গ্লাসটা নিয়ে। প্রায় অর্ধেক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে বাকিটা বিয়ার দিয়ে ভর্তি করে গ্লাসটা ফ্রেডকে এগিয়ে দিল। বয়সে ছোট বলে সবার, বিশেষ করে ফ্রেডের, ফাইফরমাস খাটতে হয় ওকে।

প্রচণ্ড গরমে ঘামছে ফ্রেড।

'তিনমাস গুর্খাদের সাথে যুদ্ধ করার পর কোথায় একটু আমোদ-ফুর্তি করব, না, কালই আবার যেতে হবে দু'শো মাইল দূরে কোথায় কারা আটকা পড়ে মরছে তাদের উদ্ধার করতে!'

'সেস্‌ত লা গুর্,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা মুখের সাবান পরিষ্কার করতে করতে।

'কি বললে?' জানতে চাইল ফ্রেড্। ফ্রেঞ্চ একেবারেই জানে না সে। ছয় মাস বেলজিয়ান কঙ্গোতে থেকেও এক বর্ণ ফ্রেঞ্চ শিখতে পারেনি ও। 'গাল দিচ্ছ না তো?'

'যুদ্ধের এটাই রীতি,' ব্যাখ্যা করল রানা।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। কেউ কোন কথা বলছে না। উইলিয়ামের এফ এন রাইফেল পরিষ্কার করার ধাতব আওয়াজ আসছে থেকে থেকে। পা ছড়িয়ে কার্পেটের ওপর বসে একমনে নিজের প্রিয় রাইফেল নিয়ে ব্যস্ত সে।

কোন কিছুই ভাল লাগছে না ফ্রেডের। উইলিয়ামকে খোঁচাবার জন্যে বলল, 'এসো, আমার সাথে একগ্লাস খাও, বিল।'

'জানো তো আমি খাই না, কেন গ্যাঞ্জাম করছ?' ফ্রেডের চোখে চোখ রেখে জবাব দিল বিল। চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব।

হো হো করে হেসে উঠল ফ্রেড। পা দিয়ে ববকে একটা গুঁতো মেরে হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বিলকে দেখিয়ে বলল, 'শুনছ বব্, মিস্টার উইলিয়াম ফিঞ্চ নাকি মদ খান না।' হো হো করে আর একটু হাসল ফ্রেড। 'ওরকম কত দেখেছি! উনি

মদ খান না—আরে ব্যাটা, মদ না খেলে তোর নাকের ডগায় আর গালে কি মশার কামড়ে ওরকম লালচে রং ধরেছে?'

বাম হাতে ধরা রাইফেলটা ডান হাতে চলে এল। খেপেছে বিল। রানা আঁচ করতে পারছে কি রকম সাঙ্ঘাতিক চটেছে ও। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই রানা সাবধান করে দিল, 'মেয়েলোকের মত বিলের পিছু লেগো না, ফ্রেড—ওকে ওর মত থাকতে দাও।'

রানার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যা ফ্রেডকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে থতমত খাইয়ে দিল। কিন্তু প্রচুর মদ খেয়েছে সে। মনে মনে ভয় পেলেও মদের প্রভাবে বকেই চলল, 'হ্যাঁ, ওরকম ডুডু খাওয়া বুড়ো ছেলে আমার অনেক দেখা আছে। আমার বাবাকেই দেখেছি, এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ খাবে না—কিন্তু তার পরেই দেখা যাবে আগের মতই আবার বদ্ধমাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাচ্ছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ও আমার বাবার মতই "ডুডুও খাই টামুকও খাই" জাতের লোক।' উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেছে ফ্রেড। ছেলে বেলায় বাপ-মার কাছ থেকে নিদারুণ অবহেলা পেয়ে দুনিয়ার ওপর মনটা তার একেবারে বিষিয়ে গেছে। পৃথিবীর সব লোককেই মতলববাজ, স্বার্থপর আর অবিশ্বাসী বলে মনে করে সে। রবার্টকে খোঁচা দিল ফ্রেড, 'ধরো না, এক বোতল হুইস্কি খুলে ওর নাকের নিচে ধরো, দেখো তোমাদের ডুডু খাওয়া ছেলের কি অবস্থা হয়।'

উঠে দাঁড়াল বিল। ফ্রেডের দ্বিগুণ বয়স হবে ওর। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু চওড়া কাঁধ আর পেশীবহুল হাত দুটো দেখেই বোঝা যায় প্রচুর শক্তি আছে লোকটার গায়ে। 'তোমার বাপ-মা তো তোমাকে আদব কায়দা শেখায়নি, বাধ্য হয়ে আমাকেই সেটা শেখাতে হবে,' বলেই হুঙ্কার ছাড়ল বিল, 'উঠে দাঁড়া, শূয়োরের বাচ্চা! তোর মুখের মানচিত্র পাল্টে দেব আমি আজ!' রাগে কাঁপছে বিল। অপেক্ষা করছে প্রতিপক্ষ কখন উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। ফ্রেডের উপর খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ও।

এক পা এগিয়ে এল রানা। রওয়ানা হওয়ার আগে এসব ঝামেলা হতে না দেয়াই ভাল। রানার এক পা এগিয়ে আসা আর আগের সতর্ক বাণী দুটোই একসাথে কাজ করল ফ্রেডের মগজে। 'উঠব কেন, তুমি কি নাচতে চাও আমার সাথে? ববকে জিজ্ঞেস করো, আমি ওয়ালস নাচতে পারি না। ববকে বললেই পাশের হোটেল থেকে একটা মেয়ে নিয়ে আসবে তোমার সাথে নাচার জন্যে।' ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চাইছে ফ্রেড।

'উঠে দাঁড়া, হারামজাদা কাপুরুষ!' হাত দুটো একটু উঁচিয়ে মারামারি করার জন্যে প্রস্তুত বিল।

'দেখেছ, কেমন মিঠে সম্ভাষণ করছে বিল। আমার ধারণা হচ্ছে, হয়তো বা কোন কারণে রেগে গিয়েছে ও।' পাশে বসা ববের সাথে গল্প করছে ফ্রেড—যেন

কিছুই ঘটেনি। রাগে অন্ধ হয়ে এগিয়ে এল বিল খাটের দিকে। উঠে দাঁড়াল রবার্ট, রানাও দু'পা এগিয়ে এল, যেন দরকার পড়লে সময় মত ঠেকানো যায়। কিন্তু দরকার হলো না, রবার্টই সুন্দরভাবে সামলে নিল ব্যাপারটা।

'কি করছ, বিল? মদ খেয়ে কে কাকে কি বলল তাই নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে পড়া তোমার মত বয়স্ক লোকের তো শোভা পায় না।'

দু'সেকেণ্ড স্থির হয়ে ভাবল বিল। ধীরে ধীরে রাগের ভাবটা কেটে গেল চেহারা থেকে। রানার দিকে ফিরে বলল 'বস্, আমি তোমার জন্যে নিচে গাড়িতে অপেক্ষা করছি—এই বিষাক্ত পরিবেশে আর এক সেকেণ্ডও থাকতে পারছি না আমি।' ঘুরে নিজের রাইফেলটা তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল সে।

'বড্ড বেশি বেড়েছে! ওকে সাবধান করে দিয়ো, ক্যাপ্টেন, আমার সাথে আবার লাগতে এলে হাড্ডিগুড্ডি ফাক্কি করে দেব বুড়ো হাঁদার।'

ভ্যাপসা গরম ঘরটায়। বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া, ঘামের গন্ধ, মদের গন্ধ—সব মিলিয়ে দম আটকে আসতে চায়।

নীরবতা ভাঙল রবার্ট, 'ক্যাপ্টেন, বিলকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

'মিশন টার্গেট নাইনের জন্যে যা মাল-সামান লাগবে সেগুলো আনতে যাচ্ছি। ওগুলো গুদামে ভরে বিগ জোকে দিয়ে রাতে সবকিছু পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করাতে হবে।' গালের সাবান ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জবাব দিল রানা।

'কতদিনের জন্যে যাচ্ছি আমরা?'

'কত···এ-ই সপ্তাহ খানেক, কি দিন দশেক লাগবে।' ববের পাশে বিছানায় বসে নিজের বুট জোড়া খাটের তলা থেকে বের করল রানা। 'যদি কোন বিশেষ ঝামেলা না হয় তবে দিন দশেকের মধ্যেই ফিরতে পারব আমরা।'

'ঝামেলা মানে?' বিপদের গন্ধে বুক শুকিয়ে গেছে ববের।

'ম'সাপা জংশন থেকে আমাদের যেতে হবে দু'শো মাইল···মানুষখেকো বালুবাদের এলাকার ভেতর দিয়ে।'

'কিন্তু আমরা তো ট্রেনে করে যাচ্ছি। বালুবারা আমাদের নাগাল পাবে কেমন করে? কেবল তীরধনুক দিয়ে ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' সান্ত্বনা পেতে চাইছে বব।

'সাতটা নদী পার হতে হবে আমাদের। তার মধ্যে একটা আবার বেশ বড়,' বুটের ফিতে লাগাতে লাগাতে জবাব দিল রানা।

গুম হয়ে মদের গ্লাস হাতে বসে আছে ফ্রেড। কিন্তু কান তার ঠিকই খাড়া আছে—মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও সব কথা।

'একটা আবার কাঠের ব্রিজ,' বলল রানা। 'সহজেই নষ্ট করা যায়। ট্রেন লাইনও তুলে ফেলা খুব কঠিন নয়। মোট কথা, আমার ধারণা এটা পিকনিকের মত নির্ঝঞ্ঝাট ট্রিপ হবে না।'

'ঘাপলা, পুরো ব্যাপারটাই একটা বিরাট ঘাপলা বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি কেন—কি উদ্দেশ্য? টার্গেট নাইন…আসলে ব্যাপারটা কি?'

'আমরা যাচ্ছি পোর্ট রিপ্রিভে। শহরটা গত তিন মাস থেকে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ হারিয়েছে। আমাদের টার্গেট, অসহায় শিশু আর নারীর সাথে আর যারা আটকা পড়েছে, তাদের উদ্ধার করে আনা।' সিগারেট ধরাল রানা। জোরে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার খেই ধরল, 'ওদের খাবার-দাবার প্রায় শেষ। চারপাশে বালুবা উপজাতীয়রা বিদ্রোহ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরে কেটে ধর্ষণ করে যা-তা কাণ্ড করছে। বালুবারা যদিও পোর্ট রিপ্রিভ আক্রমণ করেনি এখনও, কিন্তু করতে কতক্ষণ? তার ওপর রয়েছে সেন্ট্রাল কঙ্গোলিজ গ্রুপের বিদ্রোহীরা। কেউ বলতে পারবে না ওখানে আসলে কি ঘটছে। ওই দুর্ভাগাদের ওখান থেকে উদ্ধার করে আনা সত্যিই কঠিন কাজ হবে। কিন্তু আমি জানি তোমাদের সবার সক্রিয় সহযোগিতা পেলে ওদের ঠিকই রক্ষা করতে পারব।'

'ইউ এন ও-র লোকেরা একটা প্লেন পাঠালেই পারে,' মন্তব্য করল ফ্রেড।

'ল্যাণ্ডিং-এর জায়গা নেই,' কৈফিয়ত দিল রানা। যেভাবেই হোক এদের সহযোগিতা তার পেতেই হবে।

'হেলিকপ্টার পাঠাক তাহলে।'

'হেলিকপ্টার অতদূর যাবে না—রেঞ্জের বাইরে।'

'চিনি না, জানি না ওদের জন্যে আমাদের মাথা ব্যথা কেন? খোদার ওপর খোদকারি করতে যাই কেন আমরা? খাক না বালুবারা, ওদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে আনার কি অধিকার আছে আমাদের? আমাদেরকে তো আর খাচ্ছে না—কি দরকার ছিল এতসব ঝামেলায় যাওয়ার?' পা দিয়ে ঠ্যালা মেরে রবার্টকে বিছানা থেকে নিচে ফেলে দিল ফ্রেড। 'জাহান্নামে যাক ওরা! যা, একটা মেয়েলোক নিয়ে আয় দেখি।' নেশা ভালমতই ধরেছে ফ্রেডকে।

'মেয়ে কোথায় পাব? বরং তোমাকে আর একগ্লাস মদ বানিয়ে দিই ভাল করে।' ফ্রেডের খালি গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াল রবার্ট।

ধমকে উঠল ফ্রেড, 'বলছি, আমার মেয়ে চাই, যেখান থেকে পারো একটাকে ধরে নিয়ে এসো। এখন আর মদের দরকার নেই আমার।'

'কোথায় মেয়ে পাব, আর কেনই বা সে আমার সাথে আসবে—এ কেমন ঝামেলায় পড়লাম?' এগিয়ে যেতে চাইল বব।

খপ্ করে ববের ডান হাতটা ধরল ফ্রেড। আস্তে আস্তে মুচড়ে পিঠের কাছে নিতে নিতে বলল, 'হারামজাদা, নয় বোঝ ছয় বোঝ না! নিচের বারেই কত মেয়ে আছে ওরকম—কি, যাবি, না হাতটা মুচড়ে ভেঙে দেব?' আর একটু চাপ দিল ফ্রেড।

'কিন্তু ওখানে যেয়ে কি বলব আমি—এই ধরনের কিছু তো করিনি আমি কোনদিন।'

'বাংগু নাকি—এইসব মেয়েমানুষ মুখের ভাষা বোঝে যে ওদের কিছু বলতে যাবে তুমি? কয়টা কড়ু-কড়া নোট দেখাও, সুড়সুড় করে পেছন পেছন চলে আসবে। কি—যাবি, না হাতটা মুচড়ে ভেঙে দেব?' চাপ আরেকটু বাড়াল ফ্রেড।

'আরে বাবা যাচ্ছি···হাতটা গেল, উহ্!' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'দাও, টাকা দাও।'

ব্যাক পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে ববের হাতে ধরিয়ে দিল ফ্রেড। 'দেখো আবার, যাকে তাকে ধরে এনো না, চাম্পিয়ন মাল চাই। বুড়ী-ধুড়ী যদি হয়···' চোখ পাকাল সে।

ওয়ালেটটা পকেটে পুরে মুচড়ানো হাতটা ডলতে ডলতে বেরিয়ে গেল বব্।

'আর এক রাউণ্ড চলবে, ক্যাপ্টেন? আমি নিজে ঢেলে দিচ্ছি।' আপস করার ভঙ্গিতে বলে উঠে দাঁড়াল ফ্রেড খালি গ্লাস দুটো নিয়ে।

'ঠিক আছে, দাও,' জবাব দিল রানা। বুটের ফিতে লাগানো হয়ে গেছে, সোজা হয়ে বসেছে এখন।

হুইস্কি বেশি বিয়ার কম, কেমন অদ্ভুত একটা স্বাদ। তবু দু'ঢোক খেল রানা।

'জানো, তুমি আর আমি—সবার থেকে আমরা দু'জন একটু আলাদা। অন্য রকম। আমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে। মদ আমরা খাই, মদ আমাদের খায় না।' ফ্রেডকে ধরেছে, বেশ বুঝতে পারছে রানা। 'আমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত। তুমি কি বলো, ক্যাপ্টেন?' কথার শেষ দিকটা একটু জড়িয়ে গেল ফ্রেডের।

'আরে, তুমি জানো না, আমি যে তোমাকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন বলে মনে করি?'

রানার গলায় কোন শ্লেষের আভাস না থাকায় অভিভূত হয়ে গেল ফ্রেড। 'ঠাট্টা করছ না তো? সত্যি? আর আমি কি না ভাবতাম তুমি আমাকে বিশেষ পছন্দ করো না। আমাকে মাফ করে দিয়ো বন্ধু, এতদিন কি ভুল ধারণাই না ছিল!' হাত বাড়িয়ে দিল ফ্রেড হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে। রানা অভিভূত ফ্রেডের হাতটা নিল নিজের হাতে।

বব ঢুকল ঘরে। মেয়েটাও এল ওর পিছু পিছু। মেয়েটাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল ফ্রেড। বিছানায় বসে ডাকল, 'এদিকে এসো, পাখি।'

কোন রকম দ্বিধা না করে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে এগিয়ে গেল সে ফ্রেডের দিকে। পায়ে হাইহিল, পরনে গোলাপী রঙের মিনি স্কার্ট। হাঁটুর উপরে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ফ্রেড টেনে নিল মেয়েটাকে কোলের উপর।

জ্যাকেটটা পরল রানা। তারপর কোমরের বেল্টটা একটু নাড়াচাড়া করে

বেল্টে বাঁধা পিস্তলের খাপটা সুবিধা মত জায়গায় ঠিক ডান উরুর পাশে নিয়ে এল।

'আরে, চললে নাকি?' কোলে বসিয়ে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর মত নিজের গ্লাস থেকে মদ খাওয়াচ্ছে ফ্রেড মেয়েটাকে।

'হ্যাঁ।' টুপি পরে যাবার জন্যে তৈরি হলো রানা।

'মাত্র তো মজা আরম্ভ হলো ক্যাপ্টেন, একটু থাকো, অন্তত একবার চেখে যাও।' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে ফ্রেডের।

'না, বিল নিচে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল রানা।

'গুলি মারো শালাকে—ও কি একটা মানুষ যে ওকে বসিয়ে রাখা যাবে না? এসো, ফুর্তি করি।'

'অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, ফ্রেড। আজকের মধ্যেই সব সারতে হবে।'

'লুইস, জিনিসটা একটু দেখো।' বলেই মেয়েটাকে বিছানার উপর চিৎ করে ফেলে স্কার্টটা ওর নাভীর উপর তুলে দিল ফ্রেড। 'দেখো লুইস, এখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে এই জিনিস, আর বাইরে অপেক্ষা করছে বুড়ো হাবড়া বিল। এখনও বলবে তুমি যেতে চাও?' তাকাল রানা—প্যান্টি নেই মেয়েটার, সব দেখা যাচ্ছে। খিলখিল করে হাসছে সে, ফ্রেডের সাথে ধস্তাধস্তি করছে।

'যেয়ো না, লুইস। বন্ধুর মর্যাদা আমি দিতে জানি। এসো, তুমিই প্রথম।'

'বিল আর আমি কারফিউ-এর আগেই ফিরে আসব। ফিরে এসে এই মেয়েকে এখানে দেখতে চাই না।' নির্লিপ্ত ভাবে কথাগুলো বলে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল রানা।

খেপে গেছে ফ্রেড। 'ক্যাপ্টেন লুইস, তোমাকে আমি পুরুষ বলে মনে করেছিলাম। এখন দেখছি তুমিও ওই দলের। একটা আস্ত পাগল তুমি। এমন জিনিস কেউ স্বেচ্ছায় ছেড়ে যায়?' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনল রানা, গজর গজর করছে ফ্রেড।

দুই

হোটেল গ্র্যাণ্ড লিওপোল্ড দ্য সেকেণ্ডের লবি। লোকে লোকারণ্য। বেশির ভাগই সৈনিক—সবার কাঁধেই অস্ত্র ঝুলছে। এক হাতে বিয়ারের গ্লাস, অন্য হাত ব্যস্ত সঙ্গের মেয়েটিকে নিয়ে। ফুর্তি করছে ওরা— কয়েকজন এর মধ্যেই মাতাল হয়ে গেছে। লবিতে কয়েকজন বেলজিয়ানও রয়েছে, বেসামরিক নারী-পুরুষ—পালিয়ে বেঁচেছে কোনমতে। রানা লক্ষ করল একটা বেলজিয়ান মেয়ের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে, তবু সে কোলের বাচ্চাটাকে দোলাচ্ছে তার কান্না থামানোর জন্যে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে—হয়তো বেচারী কোন

প্রিয়জনকে হারিয়েছে।

'আরে, লুইস্ না? চলবে নাকি একটা বোতল?' ডিক্ আর ডগলাস বসে মদ খাচ্ছে লবির অন্য পাশে। সাউথ আফ্রিকান চার্টার পাইলট ওরা।

'অনেক কাজ রয়েছে এখন—রাতে হবে,' হাত নেড়ে জবাব দিল রানা।

'আজ বিকেলেই বাইরে যাচ্ছি—সামনের সপ্তাহে ফিরব,' বলল ডিক ফ্রেজার।

'দেখো বেশি গিলো না আবার—রানওয়ে ঝাপসা দেখবে।' হাসতে হাসতে সাবধান করল রানা। 'ঠিক আছে, সামনের সপ্তাহেই দেখা হবে আবার।' সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সে অ্যাভিনিউ-ডু-কাসাই-এ। গরম ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে টের পাচ্ছে রানা পাশের চুনকাম করা বাড়িগুলো কি পরিমাণ তাপ ছড়াচ্ছে। কয়েক পা এগিয়েই ঘামতে শুরু করেছে ও। ইউনিফর্মের নিচে ঘামের এক একটা ফোঁটা সুড়সুড়ি দিয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। বুক পকেট থেকে গগল্স বের করে পরে নিল সে—প্রায় পৌঁছে গেছে—সামনেই তিন টনের একটা শেভ্রলে ট্রাক নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বিল।

ক্যাপ্টেন লুইসকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিলের মুখ। বেচারা গরমে বসে অপেক্ষা করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল বিল, আদেশ দিল রানা, 'সরে বসো, বিল, আমি ড্রাইভ করব।'

'ওকে, ক্যাপ্টেন,' বলে পাশের সীটে সরে বসল বিল।

অ্যাভিনিউ-ডু-কাসাই ধরেই উত্তর দিকে রওয়ানা হলো ট্রাক। কি যেন বলার জন্যে ছটফট করছে বিল। রানা বেশ আন্দাজ করতে পারছে ও কি বলবে।

একটু উসখুস করে নড়ে চড়ে বসল বিল। গলা খাঁকারি দিয়ে আরম্ভ করল, 'আজকের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত, লুইস।'

'বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ওরকম হয়েই থাকে—ও কিছু না।'

রানা সেন্টিমেন্টাল প্যাঁচাল এড়িয়ে যেতে চাইলে কি হবে, বিল বলেই চলল, 'আমার ওইভাবে বিগড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি।'

কোন জবাব দিল না রানা। বিলের মনটা একটু হালকা না হওয়া পর্যন্ত ও বকবক করেই যাবে, জানে ও। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোর দুরবস্থা দেখতে দেখতে ড্রাইভ করছে রানা। বাড়িগুলো লুট তো হয়েছেই, মর্টারের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বেশির ভাগই। পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া গাড়িগুলো সার বেঁধে পড়ে আছে রাস্তার ধারে।

'হক কথা বললে ঠক্ করে লাগে, এই কথাটা যে কত সত্যি তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি,' বলেই হাসল বিল। 'আমি যে এককালে পাঁড় মাতাল ছিলাম, ফ্রেড সেটা ঠিকই বুঝেছে।'

'শোনো, বিল, গোপন বেদনা সবার মধ্যেই আছে—মানুষ হয়ে জন্মালে ব্যথা

পেতেই হবে, এটাই নিয়তির লিখন। ব্যথা না থাকলে আজ আমরা কেউই এমন টাকার বিনিময়ে যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তাম না। একই পেশায় যখন রয়েছি, আমরা সব ভাই-ভাই।'

ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে কোনদিন ভেবে দেখেনি বিল। মুহূর্তে ভাবালুতা কেটে গিয়ে শিশুর মত সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিলের মুখ। 'হ্যাঁ, আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো পেশায় নিযুক্ত আছি।'

'সবচেয়ে পুরানো বোলো না, বলো দ্বিতীয়!' বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল রানা।

রসিকতাটা বুঝতে পেরে হেসে উঠল বিল।

গাড়ি থামাল রানা একটা বাড়ির সামনে। আগে প্রাইভেট অফিস ছিল, কিন্তু এখন এটা 'ডি' সেকশন স্পেশাল স্ট্রাইকার ফোর্সের সৈনিকদের মেস। ফ্রেডকে হটিয়ে ক্যাপ্টেন লুইস এদের নতুন অধিকর্তা।

সিঁড়ি বেয়ে এগুলো রানা। জনা ছয়েক মিশমিশে কালো শক্তিমান যুবক বসে ছিল বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে। রানাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। 'ইউ এন মার্দি' বলে অভিবাদন জানাল সবাই তাদের ক্যাপ্টেনকে। ইউ এন হস্তক্ষেপ করে যুদ্ধ বন্ধ করার পর থেকে এই অভিবাদনই চালু রয়ে গেছে।

মৃদু হেসে অভিবাদন গ্রহণ করল রানা। এরা প্রত্যেকেই কাতাঙ্গা আর্মির দু'সাহসী, দুর্ধর্ষ সৈনিক। সবাইকে একটা করে সিগারেট বিলাল রানা। কিছুক্ষণ এটা ওটা আলাপ করার পর ওদের ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকল সার্জেন্ট-মেজরের কামরায়।

নানান সরঞ্জাম অগোছাল ভাবে স্তূপ করে রাখা হয়েছে দামী ফার্নিচারের উপরে। ঘরের এক কোণে খালি বোতলের সারি। একজন ওদিকে ফার্সি কার্পেটের উপর শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ডেস্কে বসে সার্জেন্ট-মেজর জো গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন লিখছে—তার সামনে ছয় সাতজন সৈনিক দাঁড়ানো। রানা বুঝল, ওই সরঞ্জামগুলোই বিলি করার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত জো।

'কি খবর, জো, খুব ব্যস্ত নাকি?' বলে এগিয়ে গেল রানা ওর দিকে।

'আর বলবেন না, বস্, এই ব্যাটাদের নিয়ে মহা ঝামেলায় আছি।' সামনের সৈনিকদের দেখিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল জো।

জো-র কথা বলার ভঙ্গি একেবারে আমেরিকানদের মত। যে-কেউ চোখ বন্ধ করে ওর কথা শোনার পর, চোখ খুলে সামনে ওকে দেখে নির্ঘাত চমকে উঠবে। এই কুচকুচে কালো প্রকাণ্ড কাঠামো থেকে নিখুঁত আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা, ভাবাই যায় না। তিন বছরের স্কলারশিপে আমেরিকায় গিয়েছিল কৃষি-কর্মে ডিপ্লোমা নিতে। ডিপ্লোমা তো এনেছেই, সেই সাথে আরও দুটো জিনিস সাথে নিয়ে ফিরেছে। একটা আমেরিকান উচ্চারণ ভঙ্গি, অন্যটা হচ্ছে বিয়ার পান করার আকণ্ঠ তৃষ্ণা—গ্যালনকে গ্যালন বিয়ার খেতে পারে ও।

এক মাস আগের ঘটনা। ক্যাপ্টেন লুইস পেগান-এর ছদ্মনামে কাতাঙ্গার স্পেশাল স্ট্রাইকার ফোর্সে সবেমাত্র যোগ দিয়েছে রানা। নতুন কর্মকর্তার সাথে একটু ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যেই জো বাজি ধরেছে, সে যতটা মদ খাবে তার অর্ধেক পরিমাণও যদি খেতে পারে ক্যাপ্টেন, তাহলে তার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে সে সারা জীবন। মৃদু হেসে রাজি হয়েছে রানা।

শেরিফস্ ইন-এ বসে বিয়ার খাচ্ছে ওরা চারজন। রানার অধীনে আর যারা আছে—জনা পঞ্চাশেক, তারাও এসেছে নতুন ক্যাপ্টেনের কি দুরবস্থা ঘটে, তাই দেখবে। পাইন্ট গ্লাসে করে বিয়ার আসছে। জো-র জন্যে একবারে দুটো করে, আর রানার জন্যে একটা। পাইন্ট গ্লাস রানার সামনে রাখার সাথে সাথেই রানা সেটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে টেবিলে নামিয়ে রাখল। এত তাড়াতাড়ি খাওয়ায় জো অভ্যস্ত নয়, কিন্তু এত মানুষ দেখছে, হেরে যেতে পারে না সে, তাই সে-ও ঢকঢক করে মেরে দিল তার দুই পাইন্ট। আবার বারে গিয়ে নিয়ে এল সে তিন পাইন্ট বিয়ার। এবারও রানা আগের মতই এক চুমুকে শেষ করল তার বিয়ার। রানা জানে, তাড়াতাড়ি খেলে চট করে ধরবে নেশা, কিন্তু ডবল গ্লাস খাচ্ছে বলে ওর চেয়ে অনেক আগেই বেসামাল হয়ে পড়বে জো। রানার দেখাদেখি ঢক ঢক করে দুই গ্লাস শেষ করল সে। এইভাবে চলতে থাকল।

বেশ ধরেছে জো-কে—নিজেই বুঝতে পারছে, হেরে যাচ্ছে ও। পরাজয়ের গ্লানিতে মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এখনও ক্যাপ্টেনের কিছুই হয়নি। সপ্তমবার বিয়ার আনতে গেল জো। বিল আর ফ্রেড রানার সঙ্গে একই টেবিলে বসেছে। ফ্রেডও খাচ্ছে তবে নিজের পয়সায় বলে আস্তে আস্তে রসিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করে। আর এক বোতল কোক নিয়ে বসেছে বিল।

ফ্রেড বলল, 'জো-কে মদে ধরেছে, ও যে কি অঘটন ঘটাবে তা একমাত্র খোদাই জানে!' জো-র হেরে যাওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না ও। ক্যাপ্টেন লুইস অপদস্থ হোক, এটাই সে মনে-প্রাণে চেয়েছিল। লুইস আসার আগে সে-ই ছিল এদের লীডার। কিন্তু লুইস ঢুকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে—এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না ফ্রেড।

খালি গ্লাস তিনটে কাউন্টারে রেখে জড়ানো উচ্চারণে অর্ডার দিল জো বারটেণ্ডারকে, 'আরও তিনটা…জলদি!'

পাশ থেকে আপত্তি এল। কাতাঙ্গা আর্টিলারি ফোর্সের দশ জোয়ান এসেছে একসাথে মদ খেতে। 'আমাদের দশ পাইন্ট দেয়া হলে তারপর তোমাকে দেবে—আমরা আগে এসেছি,' বলল চওড়া কাঁধওয়ালা বিশাল লোকটা।

হঠাৎ করেই খেপে গেল জো, 'না, আমারটাই আগে দিতে হবে! কারণ আমি আগে থেকে খাচ্ছি।'

চটে গেল আর্টিলারির জোয়ান। বারটেণ্ডারকে শাসাল, 'খবরদার! আমার

অর্ডার আগে সাপ্লাই দাও!' বলেই ফিরল জো-র দিকে, 'কোথাকার লাট সাহেব, অ্যাঁ? তারটাই আগে দিতে হবে! সোনার চাঁদ পিতলা ঘুঘু মনে হচ্ছে?...বেশি ঝামেলা কোরো না বাপ, মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যাবে।'

পনেরো সেকেণ্ড লোকটার চোখে চোখে চেয়ে রইল জো। একে ক্যাপ্টেন লুইসের কাছে বাজিতে হেরে যাচ্ছে, তার ওপর আবার এখানেও অপদস্থ হওয়া—সহ্য হয়? বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা ঘুসি গিয়ে পড়ল চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটার চোয়ালে। দু'পা পিছিয়ে গেল সে ঘুসি খেয়ে। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় তাকে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল জো দশ বারো হাত দূরে, ঠিক রানার টেবিলের সামনে।

'হয়েছে—এবার থামো, জো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ দিয়েই উঠে দাঁড়াল রানা। বুঝতে পেরেছে, ওর কথা এখন কানে তুলবে না জো। তুমুল একটা মারপিট বেধে যেতে পারে দুই পক্ষে।

চওড়া কাঁধওয়ালার সঙ্গীরা সবাই একসাথে তেড়ে এল জো-র দিকে। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে জো-র, সামনের লোকটাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলল বারের দিকে। তিনটে খালি গ্লাস সহ পড়ল লোকটা বারের ওপাশে। ঝনঝন শব্দে ভাঙল গ্লাসগুলো। ততক্ষণে রাগবির বল হাতে প্লেয়ারটাকে যেমন বিপক্ষ দল একযোগে ছেঁকে ধরে, ঠিক তেমনি ভাবে ধরল জো-কে বাকি আটজন। আড়চোখে লক্ষ্য করল রানা, জো-র অনুচররা এগিয়ে আসছে চার পাশ থেকে।

সম্মিলিত আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল জো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়াল আটজন সহ। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য! খুব দ্রুত একবার আধপাক ঘুরেই সোজা হলো জো-র সাড়ে তিন মনি বিশাল ধড়। কিল ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল একেক জন একেক দিকে।

ধীরে পায়ে এগিয়ে গেল রানা, থামল জো-র ঠিক তিন হাত সামনে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে জো, চওড়া নাক আরও চওড়া দেখাচ্ছে, পুরু ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে আছে—ঝকঝকে সাদা দাঁত আর গোলাপী মাড়ি দেখা যাচ্ছে—যেন তাড়া খেয়ে রুখে দাঁড়ানো কুকুর। দড়াম করে লাথি চালাল সে ডানপাশ থেকে ধেয়ে আসা একজনের তলপেটে।

'থামবে তুমি, জো?'

'সরে যাও, ক্যাপ্টেন!' উল্টে শাসাল জো রানাকে। 'চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে...ভাল চাও তো সরে যাও সামনে থেকে।'

রানা বুঝল, এই বেয়াড়া লোকটাকে এখুনি যদি শায়েস্তা করা না যায়, তাহলে একে বা এর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। 'ডি' সেকশনে ওর আচমকা অনুপ্রবেশ অনেকের মনেই অনেক রকম প্রশ্ন, হতাশা ও বিরাগ সৃষ্টি করেছে; ওকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে অনেকেরই, স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ

করছে কেউ কেউ। আজই বিড়াল মারবে বলে স্থির করল সে মনে মনে। এস্‌পার ওস্‌পার যা হবার হয়ে যাক আজই।

'শাট্ আপ!' প্রচণ্ড এক ধমক মারল রানা। 'আমি অর্ডার করছি···'

'তোর অর্ডারের নিকুচি করি আমি···ব্যাটা···'

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। প্রচণ্ড বেগে একটা কারাতের কোপ নেমে এল জোর কাঁধে। 'উহ্' বলে চেঁচিয়ে উঠল জো ব্যথার তীব্রতায়। ইতিমধ্যেই পাঁজরের ওপর দমাদম দুটো ঘুসি মেরে পিছিয়ে গেছে রানা দুই পা।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জো। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। এত প্রচণ্ড আঘাত খায়নি সে বহুদিন। হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো। ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা হিংস্র গর্জন ছেড়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর, দুই হাত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সামনে বাড়ানো।

হাঁ-হাঁ করে উঠল কয়েকজন, চিৎকার করে সাবধান করার চেষ্টা করছে জো-কে—কাজটা ভাল হচ্ছে না; ক্যাপ্টেন লুইসকে পরামর্শ দিচ্ছে পিছন ফিরে দৌড় দেবার; কিন্তু এগিয়ে এসে বাধা দেবার সাহস নেই কারও। ফ্রেডের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেল রানা, জো-র উদ্দেশ্যে বলছে, 'ওকে ভালমত শিক্ষা দিয়ে দাও, জো! হাগিয়ে ছেড়ে দাও ব্যাটাকে!'

চট্ করে সেঁটে গেল রানা জো-র গায়ের সাথে। পাঁচ সেকেণ্ড কি করল সে-ই জানে, দর্শকরা শুধু দ্রুত কয়েকবার হাত নড়তে দেখল। যখন আবার দুই পা পিছনে সরে দাঁড়াল ও, সবাই দেখল জো-র একটা হাত মরা সাপের মত ঝুলছে, অপর হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে ডান কাঁধ, নাক দিয়ে ঝর ঝর ঝরছে রক্ত। ভ্রূ কুঁচকে ওর অবস্থা লক্ষ্য করছে রানা।

শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। লম্বা একহারা লোকটার সাথে হেরে যাবে এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি জো। সামলে নিয়েই আবার ধাওয়া করে এল সে। রানা বুঝল, এ ধরনের গোঁয়ার গোবিন্দকে মাটিতে না ফেললে ঠাণ্ডা করা যাবে না, একটা আছাড় খেলেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে শক্তির গর্ব, পরাজয় মেনে নেবে ঝটপট্। লাফিয়ে শূন্যে উঠেই দড়াম করে কারাতে সাইড কিক্ লাগিয়ে দিল জো-র বুকে। টলমল পা ফেলে পিছিয়ে যাচ্ছে দৈত্যটা, সেই গতিকে কাজে লাগাবার জন্যে এক লাফে সামনে চলে এল রানা—প্রাণপণ শক্তিতে হিপ্-থ্রো করল। বিস্ময়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে দেখল সবাই, মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল জোর বিশাল শরীরটা, বাতাসে ডিগবাজি খেয়ে ধপ্পাস্ করে চিৎ হয়ে পড়ল সে বারের সামনে।

গোটা হল ঘরে পিন-পতন নীরবতা। মেঝেতে শুয়েই মাথাটা একটু কাত করে চেয়ে রয়েছে জো ক্যাপ্টেন লুইসের দিকে; দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, যেন মঙ্গল গ্রহের মানুষ দেখছে। দিব্যি জামা-কাপড় ঝেড়ে ঠিক-ঠাক করছে মানুষটা। তারপর, হঠাৎ, আশ্চর্য সুন্দর হাসি হাসল ওর দিকে চেয়ে, হাত বাড়িয়ে দিল, 'ওঠো, তিন

গ্লাস বিয়ার নিয়ে এসো টেবিলে; আমাদের বাজি শেষ হয়নি এখনও।' বারটেণ্ডারের দিকে চাইল, 'আগে ওদের দশজনের বিয়ার দিয়ে তারপর দেবে আমাদেরটা। ক্ষয়-ক্ষতির বিল আমি দেব।'

রানার হাত ধরে উঠে বসল জো। হাসছে বোকার হাসি। সবাই গোল হয়ে ভিড় করে দাঁড়াল রানা আর জো-কে ঘিরে। চমকে গেছে ওরা ক্যাপ্টেনের তেলেসমাতি দেখে।

'নিজের চোখে না দেখলে এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না!' নিচু গলায় বলল বিল।

'ও কিছু নয়,' বলল রানা। 'সাধারণ কৌশল। গায়ের জোরে ওর কাছে আমি নস্যি।'

পাহাড়ের মত উঠে দাঁড়াল জো। প্রথমেই রানার হাত দুটো পরীক্ষা করে দেখল সে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ও-দুটো রক্ত-মাংসের তৈরি। পরীক্ষা শেষ হতেও হাত ছাড়ল না সে।

'বস্, মাফ করে দিয়েছেন তো?'

হাসল রানা। সস্নেহে হাত রাখল জো-র কাঁধে, তারপর আদর করে চুলগুলো একটু এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'বেয়াদবি করেছিলে, শাস্তিও পেয়েছ। এখন আর কারোই রাগ নেই তোমার ওপর। ওকেই জিজ্ঞেস করো না কেন,' চওড়া কাঁধের লোকটাকে দেখিয়ে বলল রানা, 'কি ভাই, তোমার রাগ আছে আর ওর ওপর?'

মনে মনে রাগ থাকলেও যে-লোক অমন আছাড় দিতে পারে তার বিরোধিতা করা সমীচীন মনে করল না ও। ঘুসি খেয়ে কেটে যাওয়া ঠোঁটে হাত বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে সে জানাল: না, কোন রাগই আর নেই তার। আসলে বলতে চায়—তোমার ওপর রাগ নেই, তুমি আমার শত্রুকে শায়েস্তা তো করেইছ, আমাকে আগে বিয়ার সার্ভ করার নির্দেশ দিয়ে আমার মানও বাঁচিয়েছ। মুখে বলল, 'থ্যাঙ্কিউ!'

ঘুরে দাঁড়াল জো। হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বন্ধু, রাগ যদি না থাকে এসো সবাই একসাথে মদ খাই।' বারে যতজন আছে সবার জন্যেই বিয়ারের অর্ডার দিল সে।

এরপর থেকেই রানাকে পীরের মত ভক্তি করে জো। গত বিশ দিনের যুদ্ধে রানার প্রশস্ত মন ও সাহসের পরিচয় পেয়ে ভক্তিটা অন্ধভক্তিতে পরিণত হয়েছে।

একটু গোঁয়ার হলেও হাসি-খুশি মানুষ জো। ওর স্বভাবই এমন যে ওকে ভাল না বেসে কারও উপায় নেই। এই ক'দিনে সে জয় করে নিয়েছে রানার হৃদয়।

সামনের লোকজনকে ঘণ্টাখানেক পরে আসতে বলে তাসের প্যাকেট বের করল

জো।

শেষ চেষ্টা করল রানা। 'আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে, জো। আজ আর খেলব না; থাক।' হাসল রানা। ও জানে, জোকে ঠেকানো যাবে না কিছুতেই। গোটা পঞ্চাশেক ডলার তার খসবেই। তাসে জো-র জুড়ি মেলা ভার। খেলায় হারলে মনে মনে ভীষণ কষ্ট পায় জো। তাই ইচ্ছে করেই হারতে হয় রানাকে। মনে মনে স্থির করে রেখেছে সে, একদিন এই ব্যাপারে ও চমকে দেবে জোকে।

'আরে, বসেন ক্যাপ্টেন, কাজ তো সবারই আছে। আমারটা আমি ঘণ্টা খানেকের জন্যে পিছিয়ে দিলাম, আপনারটাও না হয় আপনি পিছিয়ে দেন। আপনিই তো বস্।' অকাট্য যুক্তি, বসতেই হলো রানাকে। পকেট থেকে গোটা কয়েক নোট বের করে টেবিলে রাখল রানা, 'এই টাকা হারলেই কিন্তু খেলা শেষ। বেশি হারতে আজ রাজী নই আমি। আর আমার হাতে বেশি সময়ও নেই, তাই এই সবটাই একবারে বাজি ধরছি আমি।'

রাজা, রানী আর গোলাম তিনটে তাস নিয়ে অনেক কায়দা করে টেবিলের উপর সাজাল জো। কোন্টা সাহেব ঠিক বের করতে পারলে জিতবে রানা।

'মাঝেরটা, ক্যাপ্টেন! আমি বাজি রেখে বলতে পারি মাঝেরটাই রাজা।' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকটা। খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল সে এতক্ষণ।

'ওর কথা বিশ্বাস করে হারবেন না, ক্যাপ্টেন। আজ সকালেই ও আশি ডলার হেরেছে আমার কাছে।' সাবধান করে দিল জো। ডান দিকের শেষ তাসটা ধরল রানা। জো তাসটা উল্টে দেখাল হরতনের বিবি।

টাকাগুলো পকেটে ভরতে ভরতে হেসে বলল জো, 'দেখেছেন বস্, রানী দেখতে কি সুন্দর, কিন্তু আপনার ক্ষতি ছাড়া ভাল করবে না ওরা কোনদিন।' পরের তাসটা উল্টাল জো, 'এই রকমই হয় ওরা, দেখেন কেমন প্রেম করছে শালী গোলামের সাথে।' শেষ তাসটা উল্টে হাসতে হাসতে বলল জো, 'দেখেন শালা রাজার কাণ্ড। চোখের সামনে তার রানী প্রেম করছে গোলামের সাথে বাম দিকে তাকালেই দেখতে পায়, কিন্তু বোকা রাজা চেয়ে আছে ডান দিকে!'

'আচ্ছা, এবার কাজের কথায় আসা যাক। দশজন বাছাই করা লোক নিয়ে চলো আমার সাথে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' উঠে দাঁড়িয়ে তাসগুলো গুছিয়ে পকেটে ভরতে ভরতে প্রশ্ন করল জো।

'অর্ডন্যান্স থেকে স্পেশাল সাপ্লাই তুলতে হবে আমাদের আগামী কালের ট্রিপের জন্যে।'

এক মিনিটের মধ্যে দশজন লোক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল জো।

'বস্, মাল তুলতে তো কিছু তেল খরচ হবে। দু'বোতল হুইস্কি সাথে নিয়ে নিই—আপনি কি বলেন?'

দিন পনেরো আগে যে দশ কেস্ হুইস্কি লুট করে আনা হয়েছিল তার আর দুই কেস মাত্র অবশিষ্ট আছে। খাঁটি স্কচ্ হুইস্কির যা দাম তাতে এক বোতল হুইস্কি দিয়েই অনেক কাজ উদ্ধার করা যায়। কথাটা মন্দ বলেনি জো।

'হ্যাঁ, এক কেস হুইস্কিও তুলতে বলো ট্রাকে।' রানা জানে যে অর্ডন্যান্সের কোয়ার্টার মাস্টার মালপানি ছাড়া সহজে সাপ্লাই দিতে রাজী হবে না।

'পুরো এক কেস? আপনি কি ওখানকার সব মাল উঠিয়ে আনতে চান?' বিস্ময় প্রকাশ পেল জো-র কণ্ঠে।

'না, বাঁচাতে পারলে আমরাও কিছু খাব। গোটা কয়েক বোতল তো তোমারই লাগবে,' হাসল রানা।

ট্রাকটা অ্যাভিনিউ লে'টরেল দিয়ে পুবদিকে বাঁক নিল।

'আচ্ছা, ব্যাপারটা আসলে কি, বলেন তো, ক্যাপ্টেন? এত আয়োজন কিসের?'

সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল জো। একটা বিয়ারের বোতল খুলে ঢক্ঢক্ করে সবটা খেল। 'আমার লোকজনেরা যুদ্ধের শেষে কোথায় একটু আমোদ-ফুর্তি করবে, না এক ঝামেলা এসে হাজির!'

'খাতায় যখন একবার নাম লিখিয়েছ, অর্ডার মানতেই হবে,' যুক্তি দেখাল রানা।

'তা তো বুঝলাম; কিন্তু লক্ষ লক্ষ ডলার দামের হীরা হাতের মুঠোয় পেলে যে কোন মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবার কথা। পাগল কি আর অর্ডার মানে? কাকে ঠেকাবেন আপনি?'

রানা জানে। তিনটে ড্রেজার দিয়ে লুফিরা জলাভূমি চষে হীরা তোলা হচ্ছে। গত তিনমাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তিনমাসে যত হীরা পাওয়া গেছে সব জমা রয়েছে পোর্ট রিপ্রিভে। সাথে ষাটজন লোক পেলে সে ওই হীরা উদ্ধার করে নিরাপদে কাতাঙ্গা সরকারের হাতে তুলে দিতে পারবে—কাতাঙ্গার ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তাদের এটা বিশ্বাস করাতে রানার অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। নিরীহ নিরস্ত্র লোকগুলোকে উদ্ধারের জন্যে হাতের কড়ে আঙুল নাড়তেও রাজী ছিল না ওরা, হীরার কথাতেই টনক নড়েছে, রাজী হয়েছে রানার প্রস্তাবে। শেষ পর্যন্ত ওদের মানতে বাধ্য করেছে রানা যে, কেউ যদি পারে তবে ক্যাপ্টেন লুইস পেগানই পারবে ওই হীরা উদ্ধার করে আনতে। যদি বিফল হয়, মারা পড়বে সবাই—কিন্তু অত টাকার হীরার জন্যে এই ক'জন সৈন্য বিসর্জন দেয়া চলে।

'শোনো, হীরার কথা তোমার লোকজনকে জানিয়ো না—তাতে ঝামেলা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিযানের মহৎ দিকটাই বলবে ওদের—বিপদগ্রস্ত

সিভিলিয়ানদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা।' নিচু গলায় বলল রানা।

'ওকে, বস্।' আরেকটা বোতল কোদাল সাইজের ঝকঝকে সাদা দাঁত দিয়ে খুলে চুমুক দিল জো।

শিল্প এলাকায় ঢুকে গাড়ির গতি কমে গেল। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল ওরা অর্ডন্যান্স ডিপো। গেটের সামনে গিয়ে হর্ন দিতেই সেন্ট্রি এসে ওদের পাস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, তারপর তার অধীনস্থ কর্মচারীকে বলল গেটটা খুলে দিতে। নিজে খুলে দিলে কি ক্ষতি ছিল? ফালতু ডাঁট। বিরক্ত হলো রানা।

ভিতরে আরও দশ-বারোটা ট্রাক পার্ক করা আছে। গাড়িটা পার্ক করা হলো ওগুলোর পাশে। 'বিল আর জো আমার সাথে এসো। বাকি সবাই ট্রাকেই অপেক্ষা করবে,' নির্দেশ দিল রানা।

ইঁটের খোয়া বিছানো রাস্তায় বুটের মস্ মস্ শব্দ তুলে ওরা তিনজন এগোল মেজরের অফিসের দিকে।

গান্ধী টাইপ স্টীল ফ্রেমের চশমা পরে হোঁৎকা মুখো এক মেজর বসে আছে ডেস্কে। ওদের প্রবেশ করতে দেখে মুখ তুলে চাইল। রানা পকেট থেকে কাগজটা বের করে রাখল মেজরের সামনে। বিরক্তির সাথে একবার চোখ বুলিয়েই বলল মেজর, 'না, এসব জিনিস একটাও নেই আমাদের স্টকে।' বলেই কাগজটা বাম হাত দিয়ে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে অন্য একটা কাগজ টেনে নিয়ে কপট মনোযোগের সাথে পড়তে থাকল।

'কিন্তু প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সই করেছেন এই সাপ্লাই দেয়ার জন্যে,' আপত্তি তুলল রানা।

'প্রেসিডেন্ট কেন, স্বয়ং খোদা সই করলেও কোন লাভ নেই। আমাদের স্টকে ওই জিনিস নেই। আমি দুঃখিত, কিন্তু করার কিছুই নেই।'

মেজরের পিছনে বিরাট গুদামে থরে থরে সব সাজানো রয়েছে। রানার লিস্টে যে সব জিনিস রয়েছে তার সবই যে গুদামে আছে, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে রানা।

'একটু বাইরে আসুন, মেজর, আপনার সাথে কথা আছে।'প্রায় গায়ের জোরেই মেজরকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উঠিয়ে নিয়ে এল রানা ট্রাকটার কাছে।

তখনও মেজর বলে চলেছে, 'নেই, আমি কোত্থেকে দেব?' ট্রাকের পিছনে হুইস্কির কেসটা দেখে মেজরের মুখের ভাব একটু যেন বদলাল।

'বিল, কেসটা খোলো,' আদেশ দিল রানা।

বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে ওটা খুলতে মোটেও সময় লাগল না বিলের। বোতলের সীলগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখেই চকচক করে উঠল মেজরের চোখ। 'এটা কি আপনার অফিস ঘরে নিয়ে যেতে বলব?' হাসছে রানা।

'নিশ্চয়ই!' গম্ভীর মেজর। 'এক্ষুণি!' বলেই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল সে

অফিস-রুমের দিকে।

কেসটা নামিয়ে অফিস ঘরে নিয়ে আসা হলো।

'হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছিল, সব জিনিসই তো আছে দেখতে পাচ্ছি!' টেবিল থেকে লিস্টটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বলল মেজর। 'প্রেসিডেন্টের সইও রয়েছে দেখছি— এখনই আমি আমার সব লোকজন লাগিয়ে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আপনার ঝামেলা হবে মনে করে আমিই লোক নিয়ে এসেছি। আপনি বসে বসে আরাম করুন, যা করার ওরাই করবে,' বিনীত ভাবে বলল রানা।

'খুব ভাল কথা, ক্যাপ্টেন।' তার কাজ কমে গেল বলে আরও খুশি হয়েছে মেজর। 'আপনার লোকদের বলুন দেখেশুনে যা যা দরকার নিয়ে যাবে—কোন অসুবিধা নেই।'

তিন

ঘড়ি দেখল রানা। কারফিউ শেষ হবে ভোর ছ'টায়। এখনও বিশ মিনিট বাকি। ফ্রেড আর বিল নাস্তা খাচ্ছে। বব আর রানা আগেই সেরে নিয়েছে। এককাপ কফি ঢেলে নিল রানা। ভিতরে ভিতরে ছটফট করছে সে। দেরি হয়ে গেল অনেক, কিন্তু সত্যিই উপায় ছিল না। পুরো একটি মাস লেগেছে তার নানা বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে আজকের ট্রিপটার প্রস্তুতি নিতে। কফি শেষ করে আবার ঘড়ি দেখল রানা, আরও পাঁচ মিনিট বাকি। ট্রাক পর্যন্ত পৌঁছতেই পাঁচ মিনিট লেগে যাবে। তাড়া দিল ফ্রেড আর বিলকে জলদি প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্যে। আগেই প্যাক করে রাখা হ্যাভার স্যাকটা তুলে নিল নিজের পিঠে।

ট্রাকের কাছে গিয়ে জো-র দেখা পেল রানা। বেচারা নিজেই সারা রাত পাহারা দিয়েছে। 'নাও ঝটপট উঠে পড়ো,' বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে আশা করছি সন্ধ্যার আগেই ম্'সাপায় পৌঁছতে পারব আমরা।'

ট্রাক এসে থামল ট্রেন লোডিং শেডের কাছে। দলের অন্যান্য লোকও সবাই পৌঁছে গেছে। কিন্তু কোথায় ট্রেন? ট্রেনের কোন দেখা নেই।

'আমি স্টেশন মাস্টারের কাছে যাচ্ছি। বিল, তুমিও এসো আমার সাথে,' পিছন ফিরল রানা।

'একটা কেস এখনও আছে আমাদের,' জো মনে করিয়ে দিল।

'থাক ওটা।' খেপে গেছে রানা। দরকার পড়লে পিটিয়েই পথে আনবে সে স্টেশন মাস্টারকে। চলে গেল ওরা দুজন।

ঝাড়া দুই ঘণ্টা পর দেখা গেল রানাকে, এঞ্জিনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এঞ্জিনটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে লোডিং শেডের দিকে।

'মশিয়ে, ট্রেন নিয়ে আমরা কি পোর্ট রিপ্রিভে যাব?' প্রশ্ন করল ড্রাইভার। ছোটখাট মানুষটা। একটু যেন ঘাবড়ে গেছে ও।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রানা।

'কিন্তু ওই পথে ট্রেন চলেনি তিন মাস। লাইন ঠিক আছে কি নেই, কেউ বলতে পারবে না।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল এঞ্জিন ড্রাইভার কার্লস।

'জানি। দেখে শুনে চালাতে হবে তোমাকে,' বলল রানা।

না, মারধোর করতে হয়নি রানার। স্টেশন মাস্টার কোন ড্রাইভারকেই রাজী করাতে পারছিল না বলেই এই দেরি। জেনে শুনে প্রাণ খোয়াতে কেই বা রাজী হবে? অনেক ভজিয়ে ভাজিয়ে কার্লসকে রাজী করিয়ে পাঠিয়েছে স্টেশন মাস্টার।

'ইউনাইটেড নেশনসের ঘাঁটি আছে পুরানো এয়ারোড্রোমের কাছে। ওরা তো বাধা দেবে,' বলল কার্লস।

'অত সব তোমার ভাবতে হবে না,' বলল রানা। 'আমাদের পাস আছে। তুমি শুধু আমার নির্দেশ মত চালিয়ে যাবে। কোন অসুবিধাই হবে না তোমার। প্রথম শেডের একটু আগে এঞ্জিনটা থামাও। লোডিং-এ সুবিধা হবে।'

ট্রেনটা থামতেই লাফিয়ে নিচে নামল রানা। 'জলদি সব মাল ওঠাও,' নির্দেশ দিল রানা বিল আর ফ্রেডকে। ট্রেনের ছয়টা কম্পার্টমেণ্টে মাল তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

দুপুর বারোটা নাগাদ সব মাল তোলা শেষ হলো। ফ্রেডকে ডাকল রানা। 'কয়জন আসেনি?'

'আট জন।' জবাব দিল ফ্রেড।

রানা জানত পুরো ষাটজন লোক পাওয়া যাবে না শেষ পর্যন্ত। 'বায়ান্ন জন—ঠিক আছে, চলবে,' মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বলল রানা।

অর্ডন্যান্স থেকে আনা ওয়াকি টকির একটা দিয়েছে রানা এঞ্জিন ড্রাইভার কার্লসকে। দ্বিতীয়টা দিয়েছে ফ্রেডকে; আর তৃতীয়টা রেখেছে নিজের কাছে। ওয়াকি টকিতেই রওয়ানা হবার নির্দেশ দিল কার্লসকে। 'ইউনাইটেড নেশনসের ঘাঁটি পর্যন্ত আস্তে আস্তে যাও। কোন ঝামেলা দেখলেই স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে যাবে। বুঝেছ?'

'ও কে, মশিয়ে। আপনার নির্দেশ মতই কাজ হবে,' জবাব দিল কার্লস। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ট্রেনটা। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা পেরিয়ে গ্রাম্য এলাকা দিয়ে চলেছে তারা এখন। রানার পাশে বসেছে বিল। ফ্রেড অন্য কম্পার্টমেণ্টে সব মালামালের চার্জে আছে।

দূরে ইউনাইটেড নেশনস-এর ঘাঁটিটা দেখতে পেল রানা। মৃদু একটা কেমন যেন উত্তেজনা অনুভব করছে রানা। পকেটে রয়েছে জেনারেল তারা সিং-এর সই করা ছাড়পত্র। ইণ্ডিয়ান জেনারেলের ছাড়পত্রের ওরা কতখানি দাম দেবে কে

জানে।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করল বিল, 'ওরা আমাদের কথা জানে তো?'

'খবর তো পৌঁছানোর কথা, দেখা যাক,' চিন্তিত ভাবে জবাব দিল রানা। ওয়াকি টকিতে বলল, 'ফ্রেড, তোমার লোকজনকে ব্রেনগানগুলো থেকে সরিয়ে নাও। আর অন্যদেরও বলো হাতের রাইফেল যেন নামিয়ে রাখে। দরকার হলে আমরা যে মারপিট করে হলেও যাব, এটা যেন ওরা বুঝতে না পারে।'

'ও-কে, লুইস, আমি ব্যবস্থা করছি,' ফ্রেডের জবাব এল ওয়াকি টকিতে।

কাছে এসে যাচ্ছে ওরা।

'ড্রাইভার!'

'উই, মশিয়ে,' জবাব এল।

'ইউ এন পোস্টের পঞ্চাশ গজ দূরে ট্রেন থামাবে তুমি। যদি কোন রকম গোলাগুলি হয় সোজা ট্রেন চালিয়ে পার করে নিয়ে যাবে তুমি আমাদের। বুঝেছ?' নিশ্চিত হতে চাইছে রানা।

'উই, মশিয়ে।' কাঁপা গলায় জবাব এল। গোলাগুলির কথা শুনে ঘাবড়ে গেছে কার্লস। জানালা দিয়ে গলা বের করে বাইরে তাকাল রানা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পোল আর পেট্রলড্রাম দিয়ে তৈরি ব্যারিকেডটা দেখা যাচ্ছে শুধু।

ঠাস। একটা চড় পড়ল র‍্যাল্‌ফ নাইট্‌স্‌-এর গালে। ঘুরে দেখল রানা র‍্যালফের বুকের উপর আগু ওকোলোর ঘুসিটা পড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই কি নিয়ে যেন ওদের তর্কাতর্কি চলছিল—ওদিকে নজর দেয়নি রানা। ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল র‍্যাল্‌ফ। পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা রাইফেলটা তুলে নিয়েছে। চোখ মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝছে রানা র‍্যালফ ঠিকই গুলি করবে। এক লাফে এগিয়ে এসেই লাথি মারল রানা র‍্যালফের হাতে। দুম! ছাদ ফুটো করে বেরিয়ে গেল গুলিটা। রাইফেলটা ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। জামার কলার ধরে ওকে তুলল রানা। বেচারা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। 'হারামজাদা, সবাইকে মারতে চাও? ইউ এন ট্রেসার আর বাজুকার গোলা আরম্ভ হলে বাঁচব আমরা কেউ? আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন কাণ্ড করলে হাতটা ভেঙে দেব।' বলতে বলতেই টের পেল রানা যে ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। কার্লসকে কি নির্দেশ দিয়েছিল মনে পড়ল রানার। ওয়াকি টকির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, 'থামাও কার্লস, শিগগির থামাও।'

ব্যারিকেডের হাত দশেক দূরে থামল ট্রেন।

'ইউ এন মার্দি!' চিৎকার করল রানা। ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ও।

'ইউ এন মার্দি।' জবাব এল একটু দূর থেকে। সতর্ক চোখে নজর রেখেছে সে রানার উপর।

হাতের রাইফেলটা জো-র হাতে দিল রানা, 'তুমি এখানেই দাঁড়াও, যা করার

আমি করছি।' একটু এগিয়েই বাঙ্কারটা চোখে পড়ল রানার। বেশ অনেকগুলো হেলমেট দেখা যাচ্ছে।

'হল্ট!' চিৎকার করে উঠল লোকটা। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। স্টীল হেলমেটের নিচে চোখগুলোও এখন দেখা যাচ্ছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সবাই রানার দিকে।

'গুলির আওয়াজ পেলাম—ঘটনাটা কি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'ওটা অ্যাক্সিডেন্ট,' কৈফিয়ত দিল রানা।

'ওরকম অ্যাক্সিডেন্ট আর ঘটিয়ো না। এখানেও অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেলে বিপদে পড়বে।' লোকটা আইরিশ। কথার ধরনেই বোঝা যায়।

'তেমন কিছু ঘটুক সেটা আমিও চাই না, প্যাডি।' নাম না জানা আইরিশদের ওই নামেই সম্বোধন করা হয়।

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' প্রশ্ন করল প্যাডি।

'আমার কাছে পাস আছে—দেখাচ্ছি।' পকেট হাতড়ে পাস বের করল রানা ওর কথার জবাব না দিয়ে।

'পাস আছে কি নেই সে কথা জিজ্ঞেস করিনি আমি, যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দাও!' রাগ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠস্বরে।

'আমরা পোর্ট রিপ্রিভে যাচ্ছি, আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করে আনতে।' ত্যাড়া লোকটাকে আর না ঘাঁটিয়ে সরাসরি জবাব দিল রানা।

'হ্যাঁ, আমাদের কাছে খবর এসেছে তোমাদের ব্যাপারে। দেখি, পাসটা দেখাও এবার।' একটু সহজ হলো প্যাডি। পাসটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর হুকুম দিল, 'সার্জেন্ট, ব্যারিয়ার সরিয়ে লাইন পরিষ্কার করো।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রানা। এটুকু ভালয় ভালয় পার হওয়া গেছে। লাইন পরিষ্কার। নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে ওয়াকি টকিতে কার্লসকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল রানা। ছয় ঘন্টার মধ্যেই ম্'সাপা জংশনে পৌঁছে যাবে ওরা।

'বিয়ার চলবে, বস্?' জিজ্ঞেস করল জো।

'হ্যাঁ, চলবে।' এখন ছয় ঘণ্টা করণীয় কিছুই নেই।

দাঁত দিয়ে ছিপি খুলতে গিয়ে দুটো বোতলেরই প্রায় অর্ধেক বিয়ার ফেনা হয়ে পড়ে গেল।

'দেখেছেন বস্, কেমন রাগী মেয়েমানুষের মত ব্যবহার?' বোতলটা রানার হাতে দিয়ে বলল জো।

বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে রানা লক্ষ করল ব্রেনগানের কাছে যারা ডিউটিতে আছে তারা ছাড়া আর সবাই শার্ট খুলে আয়েশের সাথে বসেছে। একজন তো তার হেলমেটটাকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে।

'আচ্ছা, আমরা এত আস্তে যাচ্ছি কেন?' এতক্ষণে লক্ষ করেছে জো।

'আমার নির্দেশেই আস্তে চালাচ্ছে কার্লস। বলা যায় না কোথায় কে লাইন উপড়ে রেখেছে। দেখেশুনে ধীরে ধীরেই এগোতে হবে আমাদের।' ব্যাখ্যা করল রানা।

'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন। ওই মানুষখেকো বালুবাদের একদম বিশ্বাস নেই।' আরও একটা বিয়ারের বোতল বাড়িয়ে দিল জো রানার দিকে।

এই গরমের মধ্যে বিয়ার একটা আলাদা আমেজ এনে দিয়েছে। বেশ ভালই লাগছে রানার। অনেক বেশি দেরি হয়ে গেল, এই উদ্বেগ আর তাকে পীড়া দিচ্ছে না এখন।

এতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মুখ খুলল বিল, 'ট্রেনটা কি বলছে শুনেছ?'

'হ্যাঁ, যা খুশি ভাব, ঠিক ঠিক মিলে যাবে,' হাসল রানা।

'আমি ওকে দিয়ে তালও দেয়াতে পারি। শুনবেন?' রানার জবাবের অপেক্ষা না করেই আরম্ভ করল জো। ওর বিরাট পেট থেকে গুরুগম্ভীর সুরেলা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। 'টাক্‌টা টাকার্‌ টাকার্‌ টাকার্‌' এই ছন্দের সাথে অদ্ভুত ভাবে তাল মিলিয়ে গান ধরেছে জো। শুয়ে বসে যারা ছিল তারা সজাগ হয়ে উঠল। গানের তালটা এমনই যে ওরাও যোগ না দিয়ে পারল না। সবাই সমস্বরে গান গাইছে। গানের কথাগুলো নয়, তালটাই মুখ্য।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন উত্তরের মেঘের দিকে।

গান গাইতে গাইতে একসময় ঝিমিয়ে পড়ল ওরা।

বব্‌ উঠে পাশের কম্পার্টমেন্টে গেল ফ্রেডের সাথে কথা বলতে।

'কত বয়স হবে ওর? সতেরো, বড় জোর আঠারো। এতটুকু ছেলে আজ ভাড়াটে খুনী, ভাবতেও কেমন লাগে।' মন্তব্য করল জো।

'এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনদিন ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি। ঠিকই বলেছ, আসলে আমরা মার্সেনারিরা তো ভাড়াটে খুনীই।' একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল বিল।

'এলিজাবেথভিলে একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করত বব। যুদ্ধ শুরু হলো, ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল। কি কারণে জানি না, হয়তো পারিবারিক কোন কারণেই, ওর আর বেলজিয়াম ফেরা হয়নি। এখানে যোগ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ওর।' সমবেদনা প্রকাশ পেল জোর কণ্ঠে। বয়সে একেবারে ছেলেমানুষ আর দেখতেও খুব সুন্দর বলে সবাই ববকে একটু আদরের চোখে দেখে।

'এই হাত দুটো দেখো।' বিলের কণ্ঠ। তাকাল রানা। সুন্দর লম্বা লম্বা আঙুল। আর্টিস্টের হাত।

'দেখো,' আবার বলল বিল। 'কি দেখছ? এই হাত এক সময়ে অভ্যস্ত ছিল সার্জারিতে মানুষের জীবন রক্ষা করায়। আর আজ দেখো, সেই হাতেই মানুষের জীবন রক্ষা করার অস্ত্র না ধরে তুলে নিয়েছি মানুষ মারার অস্ত্র।' ভাবাবেগে শেষের দিকে একটু কেঁপে গেল বিলের গলা।

'জো, আমাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে? খিদে পেয়েছে যে!' অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করল রানা।

উঠে দাঁড়াল জো, 'এখনই ব্যবস্থা করছি, বস্।' আর একটা বিয়ার রানার হাতে ধরিয়ে দিল জো, 'আপাতত বিয়ারে চুমুক দিয়ে খিদেটা একটু ভুলে থাকেন, আমি সবার খাবার ব্যবস্থা করছি।' চলে গেল সে খাবার রেডি করতে।

'তিন বছর আগে আমি ছিলাম হারলে স্ট্রীট রয়্যাল কলেজের সবচেয়ে নাম করা সার্জেন। কঠিন কেস হলেই আমার কাছে পাঠানো হত। সার্জারির কাজ ভালই রপ্ত করেছিলাম আমি।' দুঃখে একটু হাসল বিল। চোখ দুটো দুঃখের স্মৃতিতে বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

'ঘটনাটা কি, সার্জারি ছাড়লে কেন?' লোকটা বলার জন্য ছটফট করছে দেখে প্রশ্ন করল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরম্ভ করল বিল, 'পুরো দশটা বছর লেগেছিল আমার ওইখানে পৌঁছতে। দশ বছরের কঠিন পরিশ্রমের ফলও আমি পেয়েছিলাম। সম্মান, প্রতিপত্তি, বাড়ি, গাড়ি, সুন্দরী বৌ সবই ছিল আমার। বন্ধু-বান্ধব ছিল বিস্তর। হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্তই ছিল।' রুমাল বের করে মুখ আর ঘাড়ের পিছনটা মুছে নিল বিল।

'ওই ধরনের বন্ধু-বান্ধব থাকা মানেই পার্টি। আর পার্টি মানেই বোতল চলবে। সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পরে আমার ক্লান্তি ধুয়ে মুছে দূর করে দিত বোতল। ভালই লাগত। আস্তে আস্তে আমাকে পেয়ে বসল ওটা। কাজের সময়ও ডেস্কে একটা বোতল না থাকলে আমার চলত না। অপারেশনে ভুল ভ্রান্তি করতে আরম্ভ করলাম। থিয়েটারে হাতটা একটু কেঁপে রোগীর আর্টারী যখন কেটে যায়, পিচকারির মত রক্ত বেরিয়ে আমার সাদা গাউনটাকে রক্তে লাল করে দেয়। সেই অনুভূতি তুমি বুঝবে না, লুইস। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দেখছি—কিচ্ছু করার নেই।' একটানা এতগুলো কথা বলে দম নেবার জন্যে থামল বিল। একটা সিগারেট বের করে প্যাকেটের উপর দু'বার ঠুকে নিয়ে ধরাল।

'কাগজে হয়তো পড়ে থাকবে তুমি আমার কথা। কয়েকদিন হেডলাইন নিউজ ছিলাম আমি। দুর্নাম হয়ে গেল। অবশ্য আমার নাম তখন উইলিয়াম ফিঞ্চ ছিল না।' একটু নড়েচড়ে বসল বিল।

'ফ্রিডা, মানে আমার স্ত্রী আর আমি সলস্‌বারীতে একটা তামাকের প্লান্ট কিনে আফ্রিকায় চলে এলাম। দুই বছর ছুঁয়ে দেখিনি বোতল। বেশ ভালই চলছিল। স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। আমরা দুজনেই খুব খুশি। আমাদের এতদিনের স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে।' রুমালটা পকেটে ভরে রাখল বিল।

'একদিন ট্রাকটা নিয়ে শহরে গেলাম। ফেরার পথে আধঘণ্টার জন্যে ক্লাবে থামলাম। আগেও অনেকবার গিয়েছি ক্লাবে; কিন্তু সেদিন ক্লাব বন্ধ করার আগে

পর্যন্ত আকণ্ঠ মদ খেলাম। তারপর এক কেস হুইস্কি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।' আবার রুমাল বের করে মুখ মুছল বিল। 'সেই রাতেই আরম্ভ হলো বৃষ্টি। বানের জলে ভেসে গেল টেলিফোনের থাম, লাইন। বাইরের সাথে আর যোগাযোগ রইল না আমাদের।' আর একটা সিগারেট ধরাল বিল, 'এতদিন পরে আবার আমাকে ওই অবস্থায় দেখেই সম্ভবত সময়ের আগেই সকালবেলা ফ্রিডার লেবার পেইন আরম্ভ হলো। বয়স বেশি—প্রথম বাচ্চা। পরদিন পর্যন্ত লেবার চলতে থাকল। চিৎকার করতে করতে এখন আর গলায় সে জোর নেই, খুব দুর্বল হয়ে গেছে।' চোখ ছলছল করে উঠল বিলের, 'কত অনুনয় করেছে ফ্রিডা ওকে একটু সাহায্য করার জন্যে, কিন্তু আমার কাছে সব যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও ওকে সাহায্য করতে পারিনি। পাঁড় মাতাল আমি তখন।' পকেট থেকে রুমালটা আবার বের করল বিল, মুখ মোছার ছলে চোখ দুটোও মুছে নিল এবার।

'চিৎকারের শব্দ আর কানে আসছে না; মারা গেছে বলে আর চিৎকার করছে না এটা বুঝলাম অনেক পরে।' চুপ করল বিল।

বিলকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা খুঁজে পেল না রানা। জো খাবার নিয়ে এসেছে। ওর হাত থেকে একটা প্লেট নিয়ে এগিয়ে দিল রানা বিলের দিকে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে বিল। একটা হাত রাখল রানা ওর কাঁধে। 'খেয়ে নাও, বিল।' বলে জোর করে প্লেটটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে।

চার

ভ্যাম্পায়ার জেটের শব্দ কানে আসতেই উঠে দাঁড়াল রানা। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখল অনেক উপর দিয়ে উত্তর দিক থেকে আসছে প্লেনটা। ছোট্ট একখণ্ড অভ্রের মত চিকচিক করছে ওটা বিকেলের রোদে। কিন্তু ও কি? চলতে চলতে বাঁক নিল কেন প্লেনটা? ওদের ট্রেনের দিকেই নেমে আসছে!

'ফ্রেড, প্লেনটা আমাদের দিকেই আসছে। ঝামেলা হতে পারে। ব্রেন গানের ডিউটিতে যারা আছে তাদের রেডি থাকতে বলো।' ওয়াকি টকিতে নির্দেশ দিল রানা।

'হ্যাঁ, আমিও লক্ষ করেছি ঘটনাটা,' জবাব এল। 'আগেই সাবধান করে দিয়েছি আমি, ওদের পোস্টেই আছে ওরা।'

উত্তরের ঘন কালো মেঘগুলো এক নজর দেখে নিল রানা। কিন্তু ওর নিচে পৌঁছতে দশ-পনেরো মিনিট লাগবে। মনে মনে হিসেব করল, তারপর আবার ওয়াকি টকি তুলে নিল হাতে, 'কার্লস, ফুল থ্রটলে চালিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে ওই মেঘের নিচে যেতে চাই আমি। বুঝেছ?'

'ও কে, মশিয়ে।' কথা বাড়াল না কার্লস। ইতিমধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে যে ক্যাপ্টেন যে নির্দেশই দিক সঙ্গত কারণ থাকে তার।

'জো, রেডিওটা নিয়ে এসো।' ছোট্ট প্লেনটা ধীরে ধীরে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চার ব্যাগের এই সামরিক রেডিওটা অর্ডন্যান্সের মেজর পুরো এক ক্রেস হুইস্কি পাওয়ার আনন্দে খুশি হয়ে জোর করেই গুঁজে দিয়েছিল রানার হাতে।

'ক্যাপ্টেন, রেডিও।' বেশি কথার মধ্যে গেল না জো। সে-ও বিপদের গন্ধ ঠিকই টের পেয়েছে।

সবগুলো ব্যাগেই চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত চতুর্থ ব্যাগে পাওয়া গেল। প্লেনের পাইলট এয়ার হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করছে, 'এম নাইন টু এয়ার বেস। এম নাইন টু এয়ার বেস, ডু ইউ হিয়ার মি?' জবাব এল, 'রিসিভিং ইউ লাউড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার—গো অ্যাহেড।'

'একটা ট্রেন দেখতে পাচ্ছি আমি নিষিদ্ধ এলাকায়, উত্তর দিকে যাচ্ছে। এটা কি অথরাইজড, নাকি আমি বাধা দেব?'

'এক মিনিট, আমি চেক করে দেখছি,' জবাব এল এয়ার বেস থেকে। কিছুক্ষণ রেডিওর ঘড়ঘড় শব্দের পর আবার এয়ার বেস থেকে সাড়া পাওয়া গেল। 'আমাদের এখানে কোন অথরাইজেশন রিপোর্ট নেই। স্টপ ইট। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

শালারা এয়ার বেসে খবরটা পৌঁছায়নি। সুইচ অফ করে রেডিওটা জো-র দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। দ্রুত নেমে আসায় আকারে অনেক বড় দেখা যাচ্ছে এখন প্লেনটাকে। ট্র্যান্সমিটার নেই ওদের কাছে, পাইলট বা এয়ার বেসের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই। অর্থাৎ যুঝতে হবে। ওয়াকি টকিতে ফ্রেডের সাথে যোগাযোগ করল রানা, 'প্রথম ডাইভে আক্রমণ করবে না ও, কিন্তু পরের বারে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে।'

'ওকে, লুইস, আমরা প্রস্তুত আছি।'

যারা শুয়ে বসে আরাম করছিল তারাও এখন যার যার রাইফেল নিয়ে রেডি। কাউকে কিছু বলতে হয়নি। বাতাসেই ওরা বিপদের গন্ধ টের পেয়েছে—ওরা ট্রেইণ্ড।

ডাইভ দিয়ে দ্রুত নেমে আসছে প্লেনটা। পাইলটকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। খুব কাছে এসে আবার উঠে গেল প্লেনটা আকাশে।

ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ করল রানা। 'স্পীডটা আর একটু বাড়াতে পারো না?'

'ক্যাপ্টেন, এই এঞ্জিন কোনদিন আর এত জোরে চলেনি। ফুল থ্রটলে যাচ্ছি আমরা।'

বিরাট একটা চক্কোর দিয়ে প্লেনটা আবার ওদের দিকে ফিরছে। বব এসে

দাঁড়িয়েছে রানার পিছনে। চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। নিরাপত্তা খুঁজছে ও। ওর ধারণা, ক্যাপ্টেন লুইসের কাছাকাছি থাকাটাই নিরাপদ হবে।

ফ্রেড খুব উত্তেজিত। ডান হাত থুথু দিয়ে ভিজিয়ে জ্যাকেটের কলারে মুছে নিল ও। 'মরণে ডাক দিয়েছে তোকে? আয় শালা!' প্লেনটার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল ফ্রেড। এগিয়ে আসছে প্লেন। রাইফেলটা হাতে তুলে নিল। কটমট করে চেয়ে রয়েছে সে প্লেনটার দিকে। রাইফেলের সেফটি ক্যাচটা বার বার অফ আর অন করছে বুড়ো আঙুল দিয়ে। চলতে চলতে হঠাৎ ডাইভ দিল জেট প্লেন।

'টেক কাভার!' নির্দেশ দিল রানা। পাইলটের বোকামি দেখে একটু অবাকই হয়েছে সে। সাইড থেকে আক্রমণ চালাতে আসছে লোকটা। ট্রেনের প্রত্যেকেই সুযোগ পাবে তাকে গুলি করার। রাটা টাটা টাটা টাটা—স্ট্র্যাফিং করতে করতে গাছগুলোর ঠিক উপর দিয়ে নেমে এল ভ্যাম্পায়ারটা। সবগুলো রাইফেল আর ব্রেনগান গর্জে উঠল পাল্টা জবাবে। 'আ আ আ...' চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল মাইকেল ওকোলো। ঠাস করে রাইফেলটা পড়ল মেঝেতে। রক্তে লাল হয়ে গেছে বুকের জামা। একটা গুলি বুক ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। টলে পড়ে যাবার আগেই ওকে ধরে ফেলল রানা। সাথে সাথেই মারা গেছে মাইক। এখন আর ওর জন্যে কিছু করার নেই। দেহটাকে ধীরে নিচে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্লেনের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গিয়েছে পর পর দুটো গুলি লেগে। ওটা আর বেশিক্ষণ আকাশে থাকতে পারবে না। কিন্তু যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যতটা সম্ভব ক্ষতি ও করবেই। একটানে কিছুদূর উঠে গিয়েই আবার ডিগবাজি দিয়ে নেমে এল প্লেনটা। গর্জে উঠল মেশিন গান, ট্রেনের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল এক ঝাঁক গুলি। প্লেনের নাকটা আর একটু নামিয়ে পাখার নিচে লাগানো রকেট দুটো ছুঁড়ল এবার পাইলট। বেশি নামিয়ে ফেলেছিল, লাইন থেকে হাত ছয়েক দূরে পড়ল রকেট দুটো। বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ছিটকে পড়ল রানা একপাশে।

'ক্যাপ্টেন, লাগেনি তো?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল জোর কণ্ঠে।

'আমি ঠিক আছি। অন্যদের খবর নাও তুমি।' ওয়াকি টকিটা বালুর বস্তার পাশে ছিল বলে বেঁচে গেছে দেখল রানা। 'কার্লস, তোমার কি খবর, চোট পাওনি তো?' ট্রেনের ড্রাইভার অকেজো হয়ে গেলে মুশকিলে পড়বে রানা।

'চোট পাইনি এখনও, কিন্তু ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে আমার। ট্রেন চালাতে গিয়ে শেষে কি প্রাণটা খোয়াব? কি হচ্ছে এসব? ওরা আমাদের মারতে চাইছে কেন?'

ড্রাইভার ঠিক আছে জেনে আশ্বস্ত হলো রানা। 'বিপদ আমাদের সবার জন্যেই সমান—এয়ার বেস আমরা যে যাচ্ছি সে-খবর পায়নি বলেই এই বিপত্তি।' সুইচ অফ করে দিল রানা।

রানার চিৎকারে সংবিৎ ফিরে এল ওদের, একে একে সবাই তাদের রাইফেলে

গুলি ভরে নিল।

জো ফিরে আসতেই রানা জানতে চাইল ক্ষয় ক্ষতি কি হয়েছে।

'না, আর কেউ মরেনি। সামান্য কেটে ছড়ে গেছে কারও কারও, গুরুতর কিছু না,' জবাব দিল জো।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে সামনে এগোল রানা। দেখল বব্ এক কোণে বসে আছে দু'হাতে মুখ ঢেকে। হাবে ভাবে মনে হচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। চোখে লাগেনি তো ওর? চোখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে দেখা গেল কিছুই হয়নি ওর। ভয়ে কাঁদছে। কলার ধরে দাঁড় করাল ওকে রানা। পাশে রাখা রাইফেলটার নল ছুঁয়ে দেখল একেবারে ঠাণ্ডা। একটা গুলিও ছোঁড়েনি বব। রাইফেলটা ওর হাতে গুঁজে দিল রানা, 'পুরুষ মানুষের এত ভয় পেলে চলে? তুমি আমার সাথে এসো।'

'আমি কি করব, ক্যাপ্টেন, ভয়ে আমার পেটের মধ্যে সব আঁকড়ে রয়েছে; হাত পা কিছুই নাড়তে পারছি না!' নিজের অক্ষমতায় হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বব।

একটু বিরক্ত হয়েই ওকে ছেড়ে আবার প্লেনটার দিকে মনোযোগ দিল রানা। পাহাড় ঘেঁষে লম্বা একটা চক্কর দিয়ে আবার ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ওটা।

একটা ব্রেনগান গর্জে উঠল। ট্রেসারগুলো ইলেকট্রিক তারে ঝুলানো ছোট ছোট বালবের মত জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে যাচ্ছে প্লেনটার দিকে। এখনও রেঞ্জের অনেক বাইরে রয়েছে প্লেনটা। তবু কাজ হলো গুলিতে। ডান দিকে সরে গেল ওটা, তারপর দূর থেকেই এলোপাতাড়ি আক্রমণ চালাল। একটাও লাগল না ট্রেনে।

নির্ঘাত ভয় পেয়েছে পাইলট। কাঁচা লোক। হ্যাঁ, ওই তো নাকটা ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছে।

চট করে রেডিও অন করল রানা। পাইলটের গলা শোনা গেল, সাফাই গাইছে, 'ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে আমার। বেসে ফিরে আসছি বাধ্য হয়ে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

মাথার ওপর রাইফেল তুলে ধেই ধেই করে নাচছে জো বিজয়ের আনন্দে। সবাই চিৎকার করছে খুশিতে। ড্রাইভার কার্লসও যোগ দিল ওদের সাথে, একটানা হুইসেল বাজিয়ে চলেছে ও ফুলস্পীডে।

ব্রেনগানের ছাদবিহীন কোচে এসে দাঁড়াল রানা। উত্তরের মেঘগুলোর তলায় এসে গেছে ওরা। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। চরম উত্তেজনার পরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো শরীরটাকে জুড়িয়ে দিল একেবারে।

'জো, ব্রেনগানের কাছে দু'জনকে রেখে অন্যান্যদের কোচে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলো।' রানার নির্দেশ অনুযায়ী দু'জন ছাড়া বাকি সবাই চলে গেল।

'বস্, আর কোন আদেশ যদি না থাকে আপনার, তাহলে আমিও যাই। তাসের বাজিতে হেনরীকে একটু হালকা করি গিয়ে।'

'একদিন তোমার গুমোর আমি ফাঁক করে দেব, জো। ওদের অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দেব ওই খেলায় তোমার জেতার সম্ভাবনা ওদের চেয়ে তিনগুণ বেশি।'

'কেন আমার পিছনে লাগছেন, বস্! আমি তো উপকারই করছি ওর। ব্যাটা অনেক টাকা নিয়ে এসেছে; টাকার গরমে কিছু একটা অনর্থ বাধিয়ে বসার আগেই ওর চুলকানিটা কমিয়ে দেয়াই কি ভাল না?' চোখ টিপল জো।

'ঠিক আছে, যাও।' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'আর হ্যাঁ, তোমার লোকজনদের বলে দিও আমি খুব খুশি হয়েছি আজ ওদের সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল জো তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে।

কাছেই দাঁড়ানো ববের দিকে নজর পড়ল রানার। 'হ্যাঁ, তুমিও ভাল দেখিয়েছ আজ। মেয়েদের মত কেঁদেই যুদ্ধ জয় করেছ।' ইচ্ছে করেই খোঁচাটা দিল রানা। ওর মনে নিজেকে পুরুষ বলে প্রমাণ করার জেদ জাগাতে না পারলে ও এইরকমই থেকে যাবে।

জবাব দিল না বব। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে রইল রানার দিকে। ফিরে এল রানা কোচে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে ট্রেন। রানার মনে পড়ল যে ড্রাইভারকে গতি কমানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি। যোগাযোগ করল সে কার্লসের সাথে। 'কার্লস, বয়লারটা ফাটাতে চাও তুমি? বিপদ কেটে গেছে, এবার আস্তে চালাও।'

'আপনার অর্ডারের অপেক্ষায় ছিলাম, ক্যাপ্টেন, এক্ষুণি গতি কমাচ্ছি,' জবাব এল।

'শোনো, একটা নিরাপদ ফাঁকা জায়গা দেখে ট্রেনটা থামাবে। আমাদের একজন মারা গেছে। ওকে কবর দিতে হবে।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। মাইল খানেক আগে সুন্দর একটা জায়গা আছে, ওখানে থামা আমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ হবে।'

'কিন্তু মাইকেল ওকোলোকে কবর দিতে গেলে আমরা সন্ধ্যার আগে ম'সাপায় পৌঁছতে পারব না। এত ঝামেলা না করে টান দিয়ে ওটাকে বাইরে ফেলে দিলেই তো হয়,' মন্তব্য করল ফ্রেড।

'শোনো—এই মৃতদেহটা মাইকের না হয়ে তোমারও হতে পারত, ফ্রেড। তখন কেউ এই কথা বললে?' স্তম্ভিত হয়ে গেছে রানা ফ্রেডের নীচ মানসিকতায়। 'তুমি মরে গেলে তোমার দেহটা শকুনে ছিঁড়ে খাবার জন্যে আমরা রেল লাইনের ধারে ফেলে যাব? তোমরা কি বলো?' সবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাইককে সম্মানের সাথে কবর দেব আমরা,' সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

'আর এমনিতেও এখন সাড়ে পাঁচটা বাজছে, ছ'টার মধ্যেই অন্ধকার হয়ে

যাবে। মাইককে কবর দিয়ে রাতটা আমরা ওখানেই কাটিয়ে দেব। ভোরের আলোয় রওনা দিলে সূর্য ওঠার আগেই আমরা ম'সাপায় পৌঁছে যাব।' সবার অবগতির জন্যে বলল রানা, 'বালুবা এলাকায় আমরা ট্রেনের হেডলাইট ব্যবহার করলেই বিপদে পড়ব। তাই কেবল দিনের আলোয় চলা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।'

গতি কমে এসেছিল, ঝাঁকি দিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল।

'আমরা পৌঁছে গেছি, ক্যাপ্টেন।' কার্লসের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ওয়াকি টকিতে।

জায়গাটা দু'দিকেই আধ মাইল ফাঁকা। বালুবারা আক্রমণ করলে ওই আধমাইল পার হয়ে আসার আগেই ব্রেনগান ওদের কচুকাটা করে ফেলবে। পছন্দ হলো রানার। আজ রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে।

কেউ কিছু বলার আগেই কোদাল নিয়ে নিচে নামল বব। আজকের কাপুরুষতার গ্লানি তাকে দগ্ধ করছে। একটা পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে কবর খুঁড়তে লেগে গেল সে। কোত্থেকে দুটো ডাল ভেঙে এনে ক্রুশ বানিয়ে ফেলেছে বিল ইতিমধ্যেই। কবর দেয়ার পর মাথার কাছে ক্রুশটা পুঁতে দিল বিল। সবাই মিলে এক মিনিট নীরবতা পালন করল ওরা। টিটকারির হাসি হাসল ফ্রেড—কালা আদমীর আবার কবর!

ট্রেনে ফিরে তিন শিফটে ফ্রেড, বিল আর জো-র উপর মাঝ রাত পর্যন্ত পাহারার ভার দিয়ে গা এলিয়ে দিল রানা। বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে ভাবছে রানা, পদে পদে বাধা এসে পিছিয়েই দিচ্ছে ওকে কেবল। ওদিকে পোর্ট রিপ্রিভের কি অবস্থা কে জানে!' বেশি ভাবতে পারল না রানা, সারাটা দিন অনেক ধকল গেছে আজ···ঘুম এসে মুক্তি দিল ওকে সমস্ত উদ্বেগ থেকে।

পাঁচ

মাঝ রাত থেকে রানার ডিউটি। ভোরে জো-কে উঠিয়ে দিয়ে ওকে নিয়ে ছাদ বিহীন খোলা ওয়াগনে এসে দাঁড়াল সে। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশটা এখনও থমথমে। নিথর নিস্তব্ধ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক একবার দেখে নিল রানা। কোনদিকেই কোনরকম নড়াচড়া নজরে পড়ল না তার। সকালের খবরটা শোনা দরকার। জো-কে রেডিওটা নিয়ে আসতে বলে ঘড়ি দেখল সে। পৌনে পাঁচটা বাজে। কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকায় ছ'টার আগে রওনা হওয়া যাবে না। জো রেডিও নিয়ে আসতেই ব্রাজভিল স্টেশন ধরল রানা। খবর হচ্ছে। 'খবরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি শুনলেন, এবারে শুনুন পুরো খবর। আমাদের

এলিজাবেথভিলের সংবাদ দাতা জানিয়েছেন যে দক্ষিণ কাসাই প্রদেশে ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর একটা ভ্যাম্পায়ার জেটের উপর গুলি বর্ষণ করে কাতাঙ্গা আর্মি শান্তি ভঙ্গ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পাইলট আহত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। তবে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে হাসপাতাল সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেছে।'

খারাপ আবহাওয়ার জন্যে রেডিওটা ঘড়ঘড় করতে আরম্ভ করল। ফ্রেড ওদিকে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'শুনেছ? শালাকে ঠিকই লাগিয়েছি আমি। হাসপাতালে আছে ব্যাটা।'

'চুপ করো। খবরটা শুনতে দাও,' ধমকে উঠল রানা। আবার শোনা গেল: 'পোর্ট রিপ্রিভের পঞ্চাশ মাইল দূরের সেনওয়াটি মিশনে কেন্দ্রীয় কঙ্গোলিজ বিদ্রোহী দল একটা রাশিয়ান ঘাঁটি আক্রমণ করে তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লুট করে পোর্ট রিপ্রিভের দিকে রওনা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মেনীর প্রফেসর…' আর শোনার দরকার নেই, যা জানতে চেয়েছিল জেনে নিয়েছে রানা। খুট করে সুইচ অফ করে দিল।

'বব্‌, আমার ঝোলায় এক বোতল হুইস্কি আছে, নিয়ে এসো তো!' চেঁচিয়ে উঠল জো। 'পাইলটের স্বাস্থ্য পান করব আমরা। ব্যাটা বুঝতে পারেনি কাদের সাথে লাগতে এসেছে!' খবরটা শুনে বড় আত্মতৃপ্তি বোধ করছে সে।

কার্লসকে ঠিক ছয়টায় রওনা হবার কথা বলে দিল রানা। বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে চারদিক। দেখেশুনে এগোতে আর অসুবিধা হবে না ছয়টায়। নিজের বাঙ্কে ফিরে আরাম করে বসল রানা।

হুইস্কির একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল জো রানার হাতে। ব্রেকফাস্টের আগে ড্রিঙ্ক করা পছন্দ করে না রানা, কিন্তু আজকের ব্যাপার আলাদা। খুশি মনেই গ্লাসটা নিল সে।

ফ্রেড, জো, বব্‌, রানা সবার হাতেই গ্লাস। বিল চেয়ে আছে সতৃষ্ণ নয়নে। ওকেও সেধেছিল জো, খাবে না, জবাব দিয়েছে বিল ধন্যবাদ জানিয়ে। কিন্তু আজকের এই খুশির দিনে প্রত্যাখ্যান না করলেও পারতাম, এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে বিলের চোখে মুখে, লক্ষ করল রানা।

'আমরা জখম করেছি, কাজেই দায়িত্ব আমাদেরই—সবাই আমরা ওই মড়াখেকো পাইলটের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি, বটমস আপ।' গ্লাস উঁচু করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল জো। "বটমস আপ" মানে গ্লাসের তলাটা উপরের দিকে উঠাতে হবে—অর্থাৎ কাজ এক ঢোকেই সারতে হবে।

আর এক রাউণ্ড হুইস্কি জোর করেই ঢেলে দিয়ে গেল জো সবার গ্লাসে। আজ ওর মনটা বেজায় খুশি। চোখ বুজল রানা।

'কু-উ-উ'! ট্রেনের হুইসেল শুনে জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখল রানা,

বিরাট করে লেখা রয়েছে: 'ম'সাপা জংশন, এলিভেশন ৯৬৩ মিটার।' বিরাট উঁচু পানির ট্যাঙ্কটাই সবার আগে নজরে আসে। পাশে গোটা ছয়েক ছোট ছোট দালান। স্টেশন ঘরটা শক্ত কাঠের তৈরি। সিকি মাইল দূরে জঙ্গল। যত উত্তরে যাচ্ছে, গাছপালা আর জঙ্গল ততই ঘন হচ্ছে, লক্ষ করল রানা। কয়েকটা খুপরি ঘর দেখা যাচ্ছে ঠিক জঙ্গলটার ধার ঘেঁসে।

'পানির ট্যাঙ্কের নিচে এঞ্জিনটা থামাও। পনেরো মিনিট সময় পাবে তুমি বয়লারে পানি ভরে নেয়ার জন্যে।' ওয়াকি টকিতে নির্দেশ দিল রানা কার্লসকে। সস্‌সস্‌ শব্দ তুলে বাষ্প ছাড়তে ছাড়তে এঞ্জিনটা থেমে দাঁড়াল পানির ট্যাঙ্কের নিচে।

'জো, তুমি এঞ্জিন ড্রাইভারকে পানি ভরতে সাহায্য করোগে যাও। সাথে চারজন লোক নিয়ে যাবে। এখানে বেশি দেরি করতে চাই না আমি।'

'ওকে, বস্।' চারজন লোক নিয়ে চলে গেল সে তার কাজে।

'ফ্রেড, ছয়জন লোক নিয়ে তুমি জঙ্গলের পাশে ওই ঘরগুলো চেক করে এসো। আশে পাশের জঙ্গলও একটু ঘুরে দেখে এসো। কোন উৎপাত এলে ওদিক দিয়েই আসবে।' দায়িত্ব পেয়ে ছয়জন লোক বাছাই করে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ফ্রেড।

'বিল, তুমি ট্রেনেই থাকো। ব্রেনগানারদের সতর্ক করে দাও। জঙ্গলের ওই ঘরগুলো চেক করতে যাচ্ছে ফ্রেড। দরকার হলে ওদের কাভার দিতে হবে। পুবের জঙ্গলটার দিকেও নজর রেখো। কোন কিছু নড়তে দেখলেই সোজা গুলি চালাবে। আমি যাচ্ছি, বয়লারে পানি ভরার কাজে সাহায্য করতে।'

'ঠিক আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই, লুইস, আমি সজাগ থাকব।' রাইফেলটা হাতে তুলে নিল বিল।

পানির ট্যাঙ্কের কাছে এসে রানা দেখল ট্যাঙ্কে অর্ধেক পানি আছে। কার্লসের নির্দেশ মত হোস পাইপ দিয়ে জো-র সাথের লোকজন বয়লারে পানি ভরার ব্যবস্থা করছে।

দশ মিনিট পর ফ্রেডের চিৎকারে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দুটো ছোট বাচ্চাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে ওরা।

'প্রথম ঘরটায় লুকিয়ে ছিল এ দুটো। আমাদের দেখেই দৌড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছিল হারামীগুলো।' রাইফেলের মাথায় লাগানো বেয়োনেট দিয়ে একটা খোঁচা দিল ফ্রেড মেয়েটার পাঁজরে। চিৎকার করে হাত ছাড়িয়ে পালাবার বৃথা চেষ্টা করল কচি মেয়েটা।

বারো তেরো বছর বয়স হবে মেয়েটার। আর একটা খোঁচা দিতে যাচ্ছে দেখে ধমকে উঠল রানা, 'ফ্রেড, যথেষ্ট হয়েছে। ছেড়ে দাও ওদের।' যে দু'জন ওদের ধরে রেখেছিল তারা ওদের ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। ছেলেটার বয়স সাত কি আট হবে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে দু'জনেই। লিকলিকে সরু পা, হাঁটুগুলো

বেখাপ্পা রকমের বড়।

'এদিকে এসো, জো,' ডাকল রানা। হোস পাইপটা আরেকজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল জো। বাচ্চা দুটোকে দিয়ে সত্যি কথা বলাতে হলে জো-র সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় নেই। অদ্ভুত ক্ষমতা আছে জো-র বাচ্চাদের সাথে বন্ধুত্ব করার।

'দেখো তো ওদের কথা বলাতে পারো কিনা,' বলল রানা। 'আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, সঠিক জবাব চাই।'

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন, আমি আসছি।' ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ট্রেনে গিয়ে উঠল জো। একটু পরেই ফিরে এল। বাচ্চার দু'হাতে চকলেট। একটা খুলে ইতিমধ্যেই কামড় বসিয়েছে ছেলেটা। মেয়েটার কাছে এসে ওকেও দুটো চকলেট দিল জো। ছেলেটা জো-র কানে কানে কি যেন বলল, হো হো করে হেসে উঠল জো।

'কি বলছে ও?' ফ্রেড প্রশ্ন করল।

'ওরা ভেবেছিল তুমি ওদের ধরে এনেছ নাস্তা খাবার জন্যে!' আদর করে বাচ্চার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল জো।

'খেলেও কারও পেট ভরত না,' ওদের হাড্ডিসার শরীরের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল ফ্রেড।

কিছুক্ষণ ওদের সাথে কথা বলেই জানা গেল ওরা পশ্চিম দিকের একটা গ্রামে থাকে। ঘণ্টাখানেকের পথ। মাত্র পাঁচ ছয়টা পরিবারের বাস ওই গ্রামে। এদিকে এসেছিল কিছু হাতানো যায় কিনা দেখতে।

একমনে চকলেট খেয়ে চলেছে দু'জনে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এত মজার খাবার এর আগে আর কোনদিন খায়নি ওরা। জো-র প্রশ্নের ছোট ছোট জবাব দিচ্ছে ওরা, চকলেটের দিকেই মনোযোগ বেশি।

এবার রানা হাল ধরল। ভয়টা কেটে গেছে ওদের।

'আশেপাশে কোন সৈন্য দেখেছ তোমরা?' প্রশ্ন করল রানা। অনুবাদ করল জো। দু'জনেই এক সাথে মাথা নেড়ে জানাল কোন সৈনিক তারা দেখেনি।

'পোর্ট রিপ্রিভ পর্যন্ত রেল লাইন ঠিক আছে কি না জানো?' রানার এই প্রশ্নের জবাব ওরা দিতে পারল না। নেহাতই ছোট, ওদের এতসব জানার কথা নয়। পিছনে চেয়ে রানা দেখে নিল কার্লসের পানি ভরা শেষ। আর দেরি করতে চায় না সে। 'ফ্রেড, ওদের জঙ্গলের ধারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসো। জলদি করো, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, রওনা হতে হবে এখনই।' স্টেশন ঘরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে।

এঞ্জিনের দিকে এগোল রানা। 'এদিককার কি খবর, সব রেডি?'

'সব রেডি, ক্যাপ্টেন। কিছু কয়লাও নিয়ে নিয়েছি। আপনি বললেই এখন

রওনা হতে পারি।' রওনা হবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কার্লস।

'জো, সবাইকে ট্রেনে উঠতে বলো। ফ্রেড ফিরে এলেই...' কথা শেষ করতে পারল না রানা, 'টাট্ টাট্ টাট্ টাট্' অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ কানে এল। বনের ধারে ওই ঘরগুলোর দিক থেকেই গুলি হয়েছে। শুরু হয়েই আচমকা থেমে গেল গুলির শব্দ।

'বিল, আমার সাথে এসো, জলদি!' সরাসরি ওদিকে গেল না রানা। বেশ কিছুটা দূরে জঙ্গলে ঢুকল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোচ্ছে ওরা ওই ঘরগুলোর দিকে। জো-ও ওদের পিছু নিয়েছে লক্ষ করল রানা। কোথাও কেউ নেই। আরও সতর্ক হয়ে গেল সে। শত্রুকে দেখা না গেলে সব সময়েই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে ও। প্রথম ঘরটার কাছাকাছি এসে গেছে ওরা। এখনও চারদিক নিস্তব্ধ। দরজায় কান পাতল রানা—ভিতরে কোন শব্দ নেই। ইশারায় জো-কে দৌড়ে এসে কাঁধের ধাক্কায় দরজা ভাঙার নির্দেশ দিল রানা। ছিটকিনি ভেঙে হাঁ হয়ে গেল দরজাটা জো-র সাড়ে তিনমনি ধাক্কায়। এক লাফে ভিতরে চলে এল রানা, দু'হাতে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরেছে, কেউ সামনে পড়লেই...কিন্তু কোথায় কি; কেউ নেই ঘরে। সবটা ভাল করে দেখে নিয়ে বাইরে এল রানা।

'ওখানে ও দুটো কি দেখা যাচ্ছে, লুইস?' রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিল। দূরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে দুটো মৃতদেহ। একটু কাছে গিয়েই চিনতে পারল ওরা। সেই বাচ্চা দুটোই মরে পড়ে আছে। এখনও ক্ষীণভাবে রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে।

আশেপাশেই কোথাও আছে ফ্রেড, বুঝল রানা। চারটে গুলির আওয়াজ শুনেছে সে। চারটে গুলির হিসাবই সে পেয়ে গেছে দুটো বাচ্চার মৃতদেহে। ফ্রেডই যে খুন করেছে ওদের এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, কেন?

ভীষণ আঘাত পেয়েছে জো। 'একটু আগে কোলে বসে চকলেট খেলো—আর এখন সে নেই।' স্বগতোক্তি করল জো। দৃশ্যটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চাইছে না তার। হাঁটু গেড়ে বসল সে ছেলেটার পাশে। রাইফেলটা নামিয়ে রাখল মাটিতে।

গুলি খেয়ে বুকটা চৌচির হয়ে গেছে। উবু হয়ে পড়ে থাকা দেহটা সাবধানে চিৎ করে দেখল জো। আদর করে মুখে হাত বুলিয়ে দিল। মুখটায় কোন চোট পায়নি, আগের মতই আছে। 'এই কাজ যে করেছে তাকে সামনে পেলে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম!' রাগে কাঁপছে জো।

'ফ্রেড গুলি করে মেরেছে ওদের,' বলল রানা। 'কিন্তু কেন?'

ফ্রেডের পিছন পিছন ওর সঙ্গী দু'জন বেরিয়ে এল দ্বিতীয় বাড়িটার ওপাশ থেকে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল ওরা।

'তোমাকে ওদের বনের ধারে এনে ছেড়ে দিতে বলেছিলাম আমি!' কৈফিয়ত

চাইল রানা।

'হ্যাঁ, তোমার কথা মত ওদের ছেড়ে দিই, আর ওরা দৌড়ে ওদের লোকজনকে খবর দিয়ে আমাদের ওপর হামলা করুক। যেমন বুদ্ধি! তার চেয়ে এটাই ভাল হলো না?' যুক্তি দিল ফ্রেড।

'কসম খোদার···তোমাকে আমি ছাড়ব না, ফ্রেড! আদেশ অমান্য করে নিরস্ত্র কচি দুটো বাচ্চাকে খুন করার অপরাধে তোমার যাতে কোর্ট মার্শাল হয়, ফিরে গিয়ে প্রথমেই আমি সেই ব্যবস্থা করব। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাব আমি তোমাকে।' রানার মুখ দেখে ফ্রেড পরিষ্কার বুঝল ফাঁকা হুমকি নয়, ক্যাপ্টেন লুইস যা বলছে অক্ষরে অক্ষরে তাই করবে।

'কী আশ্চর্য! খুন বলছ কেন? মানুষখেকো বালুবা না ওরা? ওদের মারা আর মানুষ খুন করা কি এক কথা হলো? এ তুমি কি বলছ, লুইস?'

'এসব কথা কোর্ট-মার্শাল যারা করবে তাদের শুনিয়ো,' জবাব দিল রানা।

'মেরেই ফেলব তোকে আজ!' ভীষণ বেগে ছুটে গেল জো ফ্রেডের দিকে। রাইফেলের মাথায় লাগানো বেয়োনেটটা পেটের দিকে তাক করে ধরেছে।

'সাবধান, ভাল হচ্ছে না কিন্তু!' দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল ফ্রেড রাইফেলে নতুন ম্যাগাজিন লোড করতে করতে। কিন্তু ততক্ষণে জো এসে পড়েছে। ক্ষিপ্র গতিতে রাইফেলের কুঁদোর বাড়িতে সরিয়ে দিল সে বেয়োনেট, কিন্তু ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল একপাশে। পড়েই স্প্রিং-এর মত উঠে দাঁড়াল ফ্রেড। ভয় পেয়েছে সে, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে খুন চেপে গেছে জো-র মাথায়। গায়ের জোরে পারার তো প্রশ্নই ওঠে না, রাইফেলটাও ছিটকে পড়ে গেছে হাত থেকে, এখন একে ঠেকাতে হলে···একটানে কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করল ফ্রেড। বিদ্যুৎবেগে ডান হাত উঁচু করে জো-র বুক লক্ষ্য করে টিপে দিল ট্রিগার। কিন্তু তার এক মুহূর্ত আগেই গর্জে উঠেছে রানার রাইফেলটা। গুলি লেগেছে ঠিক রিভলভারের নলে। জো-র কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ফ্রেডের গুলিটা। রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। এক সেকেণ্ড থমকে গিয়ে উপলব্ধি করল জো, মৃত্যুর চৌকাঠ থেকে ফেরত এসেছে সে এই মাত্র। পরমুহূর্তে ঝট করে বের করল নিজের পিস্তল। কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে, কুকুরের মত গুলি করে মারবে ফ্রেডকে।

এক লাফে রানা পৌঁছে গেল জো-র কাছে। পিছন থেকে কনুইয়ের কাছে নার্ভ সেন্টার টিপে ধরল রানা। প্রচণ্ড চাপে অবশ হয়ে গেল জো-র হাত। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ফ্রেড। ঢোক গিলল। শুকিয়ে গেছে জিভটা। মরতে মরতে বেঁচে গেছে সে। চোখ তুলে চাইল ক্যাপ্টেনের দিকে। আশ্চর্য একটা লোক। আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাবে যে লোক, সে-ই আবার নিশ্চিত

মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। মতলবটা কি ব্যাটার?

'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, বিল,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'তুমি ফ্রেডের রাইফেল আর রিভলভারটা তুলে নাও। ওগুলো সীজ করা হলো। এখন থেকে ও নজরবন্দী থাকবে। ওকে একটা কোদাল এনে দাও। লাশ দুটো কবর দিয়ে ফিরবে ট্রেনে।' ভুরু কুঁচকে চাইল ফ্রেডের দিকে। বলল, 'ঝটপট্ কাজ সারো, আধঘন্টার মধ্যে আমি রওনা হতে চাই। দেরি করলে এখানেই ফেলে রেখে চলে যাব।' ট্রেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল রানা, পিছনে না ফিরেই ডাকল জো কে, 'মাথা গরম করে লাভ নেই, চলে এসো, জো।'

ছয়

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ট্রেন। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সবগুলো গাছই যেন একই ছাঁচে গড়া। দেখে মনে হয় ছোট থেকে বেড়ে ওঠেনি, কেউ এগুলো এই মাপেই তৈরি করে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে সাজিয়ে রেখেছে।

'একটা বিয়ার চলবে, বস্?' সন্ধি করার ভঙ্গিতে বোতলটা বাড়িয়ে দিল জো রানার দিকে। 'হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল আমার। মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন। আপনি না বাঁচালে ফ্রেড আজ ঠিকই খুন করত আমাকে।' গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বোতল খুলে কাত করে সাবধানে ঢালল জো। কাত করে না ঢাললে বেশি ফেনা হয়। বেশি ফেনা জো-র পছন্দ নয়। 'বিনা কারণে মারা পড়ল ওরা, দুঃখ হয় ওদের জন্যে।' ভুলতে পারছে না জো ওদের কথা। জো-র নিজের কোন সন্তান হয়নি, হবেও না। সেই জন্যেই হয়তো বাচ্চাদের প্রতি ওর এই বিশেষ দুর্বলতা।

বিকেল নাগাদ পৌঁছুল ওরা চেক নদীর ব্রিজটার কাছে। ট্রেন লাইন আর রাস্তা নদীটাকে পাশাপাশি পার হয়েছে একই ব্রিজের উপর দিয়ে। ওয়াকি টকিতে ব্রিজ পার হবার আগেই কার্লসকে ট্রেন থামাবার নির্দেশ দিল রানা। নদীর ওপারে ঘন জঙ্গল। অ্যামবুশ করার জন্যে উপযুক্ত জায়গা। দেখে শুনে এগোতে চায় সে।

ট্রেন থামিয়ে বিলকে নিয়ে নদীর ধারে এল রানা। পঞ্চাশ গজ চওড়া হবে নদীটা। ছোট হলেও অসম্ভব স্রোত নদীতে।

'পোর্ট রিপ্রিভ থেকে আমরা কত দূরে আছি এখন?' প্রশ্ন করল বিল।

পকেট থেকে ম্যাপ বের করল রানা। 'এই যে,' ম্যাপে আঙুল দিয়ে দেখাল সে বিলকে, 'আমরা এখন এইখানে আছি।' স্কেলটা দেখে নিয়ে আন্দাজ করল রানা তিরিশ মাইল দূরে রয়েছে তারা। দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তর্জনী তুলল, 'ওই দেখা যাচ্ছে লুফিরা পর্বত শ্রেণী। ওটার ওপরে উঠলেই দেখা যাবে শহর।'

ব্রিজের দিকে মন দিল রানা। আগের ব্রিজগুলো সবই ভালয় ভালয় পার হয়ে

এসেছে ওরা। কিন্তু এই ব্রিজটা কাঠের তৈরি। জ্বালিয়ে দেয়া বা অন্য উপায়ে নষ্ট করা খুবই সোজা। ব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে গেল ওরা। শক্ত মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি। ঠিকই আছে, কেউ কোন কারিগরি করেনি। নিঃসন্দেহ হলো রানা। দুশো গজ গিয়ে বাঁক নিয়েছে নদীটা। নদীর পাড়েই একটা বিশাল বুগাম গাছ। চোখে পড়ার মত গাছ। আশেপাশের গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে ওটা।

'কি গাছ ওটা? এত লম্বা গাছ সচরাচর চোখে···আরে, ওটা কি? ওই যে, গাছের ডালে বসে রয়েছে!' আঙুল তুলে গাছের দ্বিতীয় ডালটার দিকে নির্দেশ করল বিল উত্তেজিত ভাবে। প্রথম দৃষ্টিতে চিতা বলে মনে হলো রানার। কিন্তু চিতা তো এত কালো আর এত বড় হয় না! বালুবারা ওদের ওপর নজর রাখছে! পিঠে ঝুলানো বিরাট ধনুকটাও স্পষ্ট নজরে পড়ল এবার।

একসাথে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। ট্রেন থেকে ওরাও দেখে ফেলেছে ওকে। একলাফে মাটিতে পড়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

'গুলি খেয়ে পড়েছে মাটিতে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বিল।

'উঁহুঁ, অসম্ভব!' দ্বিমত প্রকাশ করল রানা। 'একটা ·৩০০ এফ এন রাইফেলের বুলেটের ধাক্কা প্রায় এক টন। লাগলে ও ব্যাটা সামনের দিকে না পড়ে চিৎ হয়ে পড়ত পিছন দিকে।' ট্রেনের দিকে হাঁটছে রানা। দ্রুত চিন্তা করছে। এই তরফের আক্রমণের পরে চুপ করে বসে থাকবে না বালুবারা। ব্রিজ রক্ষার জন্যে গার্ডের ব্যবস্থা না করলে বিপদ হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। ট্রেনের কাছে পৌঁছেই হাঁক ছাড়ল, 'জো, সার্জেন্ট ব্রায়ান স্মিথকে এখানে আসতে বলো।' নির্ভর করা যায় ব্রায়ানের ওপর। যেমন কর্মঠ, তেমনি বিচক্ষণ। ওর মত নির্ভরযোগ্য সৈনিক কাতাঙ্গা ফোর্সে আর একজনও মিলবে কিনা সন্দেহ। স্যালিউট করে দাঁড়াল সার্জেন্ট ব্রায়ান। 'ব্রায়ান, তোমাকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ দিচ্ছি। তুমি বিশজন লোক নিয়ে এই ব্রিজটা রক্ষা করবে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত। একটা ব্রেনগান, দুটো সার্চ লাইট আর দুই কেস হ্যাণ্ড গ্রেনেড বুঝে নাও তুমি জো-র কাছ থেকে। দু'দিনের খাবারও নামিয়ে নিয়ো। ব্রিজের এই পাড়ে বালির বস্তা দিয়ে ঘাঁটি তৈরি করে নাও। যে কোন মূল্যে ব্রিজটা রক্ষা করতেই হবে। বুঝেছ?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।' কাজে লেগে গেল ব্রায়ান তার বিশজন লোক নিয়ে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সুন্দর বাঙ্কার তৈরি করে ফেলল ওরা বালির বস্তা দিয়ে। বস্তার ফাঁকে ফিট করেছে ব্রেনগান ব্রিজটার দিকে মুখ করে। নিশ্চিন্ত হলো রানা।

ধীরে ধীরে ব্রিজটা পার হলো ট্রেন। আর মাত্র তিরিশ মাইল। দেড় ঘণ্টার ব্যাপার। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে ওরা। পাশের জঙ্গল থেকে একটা তীর উঠে গেল আকাশে, তারপরেই নাক নিচু করে সোজা নেমে এল খোলা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে। সেই গাছের উপর বসে থাকা বালুবাটা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে জঙ্গলে

লুকিয়ে ছিল। এখন সুযোগ বুঝে তীর ছুঁড়েছে। কারও লাগল কিনা দেখা দরকার।

ওখানে পৌঁছেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'তীরটা কারও গায়ে লাগেনি তো?' রানা জানে কি রকম ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয় ওই বিষাক্ত তীরের সামান্য আঁচড়ে।

'এই যে!' কাঁপা গলায় বলল বব, 'একটুর জন্যে বেঁচে গেছি। আমার চার ইঞ্চি দূরে এসে পড়েছিল এটা।' তীরটা রানার হাতে তুলে দিল বব।

'ভাগ্য ভাল তোমার।' তীরটা হাতে নিল রানা। সাধারণ তীরের মতই দেখতে। গাঢ় রঙের বিষ লাগানো হয়েছে তীরের ফলায়। দু'টুকরো করে ভেঙে ওটাকে সে বাইরে ফেলে দিল।

সাত

আবার রাস্তাটার দেখা পাওয়া গেল পোর্ট রিপ্রিভের ছয় মাইল আগে। ব্রিজ পার হবার একটু পরেই এঁকেবেঁকে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল ওটা। রেল লাইন সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের উপর। ছ'শো ফুট নিচে শহরটা দেখা গেল উপর থেকে। সুন্দর দেখাচ্ছে শহরটাকে। উত্তরে লুফিরা জলাশয় দেখা যাচ্ছে, সীমাহীন সবুজ, বিষাক্ত ঘাস আর পানি। দক্ষিণে লুফিরা নদী। আধমাইল চওড়া হবে—আন্দাজ করল রানা। নদীর মুখেই পোর্টটা। রাস্তাটা ডান দিক দিয়ে পাহাড় ঘুরে নেমে গেছে শহরের দিকে।

স্টেশনের পাশেই তিনটে বড় দালান। আশেপাশে ছড়ানো-ছিটানো গোটা পঞ্চাশেক খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর।

পোর্টের পাশেই একটা বিরাট শেড দেখা যাচ্ছে। কোন ওঅর্কশপ হবে। তিনটে ড্রেজারই জেটিতে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে, লক্ষ করল রানা।

গির্জার মাথায় চকচকে তামার ক্রস দেখা যাচ্ছে। পাশেই কয়েকটা পাকা শেড, মাঝে খেলার মাঠ। মিশন স্কুল।

'সেইন্ট-অগাস্টিন,' বলল জো, 'ওই মিশন স্কুলেই আমার ছোট ভাইটা পড়াশোনা করেছে। খুব ভাল স্কুল। ভাল শিক্ষা পেয়েছে বলেই ও আজ ভাল চাকরি করছে এলিজাবেথভিলের সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রিতে।' ভাইয়ের কৃতিত্বে একটু গর্বই বোধ করছে জো।

'যাক, ভালয় ভালয় পৌঁছে গেলাম আমরা,' মন্তব্য করল বিল।

'হ্যাঁ, এখন ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে হয়!' জবাব দিল ফ্রেড।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়গড়িয়ে নেমে এল ট্রেনটা। তিনটে লম্বা হুইসেল দিয়ে ধীরগতিতে ঢুকল স্টেশনে। এখনই সারা শহর ভেঙে পড়বে। জনা চল্লিশেক নরনারী ইতিমধ্যেই জড় হয়েছে প্ল্যাটফর্মে। ওদের চোখে-মুখে উত্তেজনা। এতদিন আটকা

পড়ে থাকার পর বাঁচার একটা রাস্তা পেয়েছে ওরা। মেয়েরা অনেকেই আনন্দে ফোঁপাচ্ছে।

জটলা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। বেশভূষা, শুভ্র কেশ, আর দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সহজেই অনুমান করে নেয়া যায় সম্ভ্রান্ত এই ভদ্রলোক নেতা গোছের কেউ হবেন। তাঁর পাশে মোটা-সোটা এক মহিলা দাঁড়িয়ে—সম্ভবত স্ত্রী।

ট্রেন থামতেই লাফিয়ে নিচে নামল রানা। ভিড় ঠেলে দূরে দাঁড়ানো দম্পতির দিকে এগোল সে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকগুলো জড়িয়ে ধরে রানার দুই গালে সমানে চুমো দিচ্ছে। দাড়ি গালে বিঁধছে, বিরক্তিকর হলেও করার কিছুই নেই—এটাই এখানকার রীতি।

'খোদা আপনার সহায় হোন—এই দোয়াই করি আমি, ক্যাপ্টেন।' পরিষ্কার উচ্চারণে ইংরেজিতে কথাটা বলে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন বেলজিয়ান ভদ্রলোক। হেলমেটের উপর দুটো বার দেখে রানার র‍্যাঙ্ক বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি ওঁর।

'সময় মত আসতে যে পেরেছি, এটাই আনন্দের কথা,' বিনীত ভাবে জবাব দিল রানা।

'পরিচয়ের পালাটা সেরে নিই। আমি হচ্ছি এখানকার ইউনিয়ন মিনিয়ের করপোরেশনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ব্রুস লেভী। ইনি আমার স্ত্রী আইভি লেভী।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা মহিলার দিকে, 'আমি ক্যাপ্টেন লুইস পেগান।'

'এদের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিই, ভাই-বোন এরা—মিস সুফিয়া আশরাফ আর জামিল আশরাফ।'

'ক্যাপ্টেন লুইস পেগান—স্পেশাল স্ট্রাইকার ফোর্স, কাতাঙ্গা আর্মি।' সাদা টি শার্ট আর নীল জীন্‌স পরা মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল রানা। অদ্ভুত সুন্দর নিষ্পাপ একটা মুখ। আশ্চর্য একটা লাবণ্য আছে মেয়েটার চেহারায়। জোর করে চোখ ফিরিয়ে এবার ছেলেটির সঙ্গে হাত মেলাল রানা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে সে রানার দিকে। দশ কি এগারো বছর হবে বয়েস। প্রথম পরিচয়েই রানাকে হিরো বলে মেনে নিয়েছে ও। হিরো তো বটেই—দুর্গম বালুবা এলাকা পেরিয়ে এই সময়ে ট্রেন নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়, জানে জামিল। সেইন্ট অগাস্টিনে গত একটা বছর ধরে লেখা পড়া করছে, এখানকার হালচাল ভাল করেই জানা আছে তার।

'আসার পথে বালুবারা আক্রমণ করেনি আপনাদের?' কিশোর মন অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছে। চকচকে চোখে চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে।

'আক্রমণ করেছিল, তীরও মেরেছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি,' মৃদু হাসল রানা। মাত্র একজন আক্রমণকারী ছিল একথা ফাঁস করল না সে। 'ফেরার পথে

ঝামেলা করতে পারে ওরা। আমাদের সাবধান থাকতে হবে।' এবার কাজের কথায় আসা দরকার; ফিরল মিস্টার লেভীর দিকে। 'আপনারা এখানে কতজন আছেন?'

'মোট বাহাত্তর জন, গোটা শহরে,' জবাব দিলেন লেভী।

'সবাইকে মাল পত্র নিয়ে কাল ভোরের মধ্যেই ট্রেনে উঠতে হবে। আগামীকাল ভোরেই আমি রওনা হতে চাই।' যে দলটা লুটপাট করতে করতে পোর্ট রিপ্রিভের দিকে এগোচ্ছে, ওদের মুখোমুখি হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই তার।

'এখনই সবাইকে খবর দিচ্ছি আমি। সুফিয়া তুমি আর জামিল তাহলে ক্যাপ্টেনের দেখাশোনার ভার নাও—আমি চললাম খবর পৌঁছাতে।' স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হলেন লেভী।

সুফিয়ার সাথে আবার চোখাচোখি হলো রানার। একটু মিষ্টি হেসে চোখ নামিয়ে নিল সুফিয়া। বাঙালী মেয়ের এমন নীল চোখ···হয় না। কিন্তু রানা জানে, ওর মা ছিলেন নীল নয়না আইরিশ সুন্দরী।

'এক মিনিট দাঁড়াও, আমি আসছি এখনই,' ইংরেজিতে বলল রানা। ফিরে গেল ট্রেনে। জো-কে ট্রেন পাহারার ভার বুঝিয়ে, কাজ ভাগ করে দিয়ে ফিরে এল। জো-র সাথে বারোজন থাকবে, আর বাকি সবাই হোটেলে রাত কাটাবে। ম্'সাপা জংশনের আগে আর এঞ্জিন সোজা করার উপায় নেই। এখানে এঞ্জিন ঘুরানোর কোন ব্যবস্থা নেই। কার্লসকে নির্দেশ দিল রানা শান্টিং করে উল্টোভাবে এঞ্জিনটা ট্রেনের অন্য পাশে লাগাতে। ম্'সাপা জংশন পর্যন্ত ব্যাক করেই যেতে হবে ওদের।

'এবার আমি ফ্রী। চলো, এলাকাটা ঘুরে দেখতে হবে, তোমাদের প্রতিরক্ষার কি ব্যবস্থা জানতে চাই।'

'বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে হয় না,' বলল সুফিয়া। 'আপনাকে সোজা হোটেলে নিয়ে যাই। ওখানে খালাস হয়ে ঘুরে দেখা যাবে।' মেয়েটা কেবল সুন্দরী নয়, বুদ্ধিও আছে, ভাবল রানা।

হোটেলে মাল-পত্র রেখে সুফিয়া আর জামিলের সঙ্গে বেরুল রানা শহর দেখতে। ঘুরে ফিরে দেখল ওদের হাস্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তারপর একটা কাফেতে বসে কফির অর্ডার দিল।

'আমাদের কাছে খোদার প্রেরিত পুরুষ আপনি। আমরা তো বাঁচার আশা ছেড়েই দেয়েছিলাম।' কথাটা হাসি মুখেই বলল সুফিয়া, কিন্তু রানা বুঝল কোথায় যেন বিরাট একটা ক্ষোভ রয়েছে মেয়েটার মনে।

'হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা রয়েছে তাতে ফ্রস্টের তস্কর দলের বিরুদ্ধে এ শহর দু'মিনিটও টিকবে না। কয়েকজনের হাতে তো এয়ার গানও দেখলাম মনে হলো!'

'কি ভয়ঙ্কর মানসিক চাপের মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ, ভয় আর আতঙ্ক, চরম হতাশা···তিনজন তো আত্মহত্যাই করেছে সহ্য করতে না পেরে।'

'অনেক কাজ পড়ে আছে, এবারে ওঠা যাক।' উঠে দাঁড়াল রানা।

হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা হলো। মোড়ে মোড়ে দু'জন করে ডিউটি দিচ্ছে। খুব ভাল না হলেও এক রাতের জন্যে চলবে। হোটেলে মিস্টার লেভী অপেক্ষা করছেন ওদের জন্যে।

'খবর দিয়ে দিয়েছি। কাল ভোরের আগেই সবাইকে আপনি রেডি পাবেন। একটা খারাপ খবর এসেছে। জেনারেল উইলিয়াম ফ্রস্ট-এর নেতৃত্বে একটা বিদ্রোহী দল লুটপাট করতে করতে এই দিকে আসছে। গতকাল ওরা সেনওয়াটি মিশন লুট করেছে।' গম্ভীর ভাবে বললেন মিস্টার লেভী।

'জানি, ব্রাজভিল রেডিওর খবরে ওরা একথা জানিয়েছে আজ। সেই জন্যে আমি কাল খুব ভোরেই রওনা হতে চাই।'

'জেনারেল ফ্রস্ট যে রকম নৃশংস অত্যাচার করেছে সেনওয়াটি মিশনে, শুনলে যে কোন মানুষের মাথার চুল দাঁড়িয়ে যাবে।' ভয় পেয়েছেন, এটা লুকানোর কোন চেষ্টা করলেন না লেভী।

'ভয়ের কোন কারণ নেই। ওরা এখানে পৌঁছতে আগামীকাল বিকেল হয়ে যাবে। ততক্ষণে আমরা ওদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছি।' আশ্বাস দিল রানা।

'ভালয় ভালয় রাতটা কাটলেই হয়!' বললেন বৃদ্ধ লেভী।

'আচ্ছা, দূরের আউট পোস্টে যারা ডিউটিতে আছে ওরাও খবর পেয়েছে তো?'

ওদের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন লেভী। ভয়ানক লজ্জা পেলেন তিনি।

'ঠিক আছে, আমি নিজেই ওদের খবর দেব। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।'

পকেট থেকে চাবি বের করে এগিয়ে দিলেন লেভী রানার দিকে।

'অফিসের গাড়ি। ফোর্ড ক্রাইসলার। হোটেলের সামনেই পার্ক করা আছে।'

'আমরাও আসছি, আপনার একা পথ চিনে পৌঁছতে অসুবিধে হবে।' সুফিয়া আর জামিল রওনা হলো রানার সাথে।

গাড়ির কাছে এসে দরজাটা খুলে ধরল রানা সুফিয়ার জন্যে। সুফিয়া আরও ভিতরের দিকে সরে জামিলের জন্যে জায়গা করে দিল তার পাশে। ঘুরে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল রানা।

সুফিয়ার কথা মত ম'সাপা জংশন রোড ধরে এগোল রানা। প্রথম পোস্টে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। দু'জন ভীত সন্ত্রস্ত কম বয়েসী গার্ডের দেখা পাওয়া

গেল। 'আশেপাশে কোন বালুবার দেখা পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। দু'জনেই একযোগে মাথা নেড়ে জানাল উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই তাদের চোখে পড়েনি।

'আমি ক্যাপ্টেন লুইস পেগান। তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে ট্রেনে করে এসেছি।' ব্যাখ্যা করল রানা, 'কাল ভোরেই রওনা হব আমরা। বালুবারা আমাদের ট্রেন নিয়ে ঢুকতে দেখেছে বটে কিন্তু আজ রাতে ওরা আক্রমণ করবে না। তোমাদের আজ রাতে ডিউটি দিতে হবে না। তোমরা হোটেলে গিয়ে রাত কাটাতে পারো।'

রানার কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা। ঝটপট নিজেদের জিনিস পত্র গুছিয়ে নিয়ে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

'এবার কোন্‌দিকে?' ড্রাইভিং সীটে বসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দ্বিতীয় পোস্টটা নদীর ধারে পেট্রোল পাম্পে, সামনেই ডান দিকের রাস্তা ধরতে হবে আমাদের,' সুফিয়া কিছু বলার আগেই জামিল বলে উঠল।

সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিল রানা সুফিয়ার দিকে, 'সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

'মাঝে মধ্যে দু'একটা খাই : অভ্যাস নেই।' দুটো সিগারেট বের করে দুটোই ধরাল, তারপর একটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, আপনি কোন্ দেশের মানুষ?'

'দেখে বোঝা যায় না? আমি তো বলে দিতে পারব তোমার দেশ কোথায়।' হাসল রানা।

পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সুফিয়া রানার দিকে। 'হাসলে আপনাকে নিষ্ঠুর ভাড়াটে সৈনিক বলে মনে হয় না।' বলেই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। 'আমি কোন্ দেশের আপনি বলতে পারবেন?'

'আমার ধারণা তুমি বাংলাদেশী। মা আইরিশ। অমন সুন্দর নীল চোখ দেখেই বোঝা যায়। কি, ঠিক বলিনি?' বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে ওদের দু'জনেরই। লোকটা কি জাদু জানে? কি করে সব ঠিক ঠিক বলে দিল?

জেটির দিকে মোড় নিল রানা। পেট্রোল স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে নামল ওরা। তিন জন গার্ড রয়েছে এখানে। ওদেরও একই কথা বলে পাঠিয়ে দিল রানা হোটেলে রাত কাটাবার জন্যে।

'অন্ধকার হয়ে গেছে, এবার ফেরা দরকার। কিন্তু ফেরার আগে স্লোন হাইন্‌স নামে একজন লোকের সাথে দেখা করতে চাই আমি।' জেটিতে নোঙর করা ড্রেজার তিনটের দিকে সুফিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'ওই কোম্পানীর অ্যাকাউন্টস-চীফ স্লোন হাইন্‌স—চেনো তাকে?'

'হোটেলে ফেরার পথেই পড়বে হাইন্‌স-এর অফিস।' গাড়িতে রানার কাছ

ঘেঁষে বসে জামিলকে আরামে বসার জায়গা করে দিল সুফিয়া। ছোট ভাইয়ের আরামের প্রতি লক্ষ্য, নাকি ওর প্রতি ভক্তি, ঠিক বুঝল না রানা।

একবার নিঃসঙ্গ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল রানা। একটু জোরেই চালাচ্ছে, হোটেলে ফিরে রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো নিজে চেক না করে শান্তি নেই ওর।

হঠাৎ করেই পাশের রাস্তা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল গাড়িটা। প্রাণপণে ব্রেক করেও শেষ রক্ষা হলো না। ক্রাইসলারটা দুমড়ে দিল অস্টিনের দরজা।

দরজা খুলে নামল রানা। 'শিগগির গাড়িতে উঠে আসুন, ক্যাপ্টেন! ধরতে পারলে হাড় গুঁড়ো করে দেবে ডেভিড ব্রাউন। ভয়ানক পাজি লোক! গুণ্ডা!' দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল সুফিয়ার গলায়। 'জলদি, লুইস, জলদি...!'

'শালা, মাতাল হয়ে গাড়ি চালাও!' নেমে এল লোকটা তার গাড়ি থেকে। চওড়ায় রানার ডবল হবে। 'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। উচিত শিক্ষাই দেব আমি আজ তোমাকে।' এগিয়ে এল ডেভিড রানার দিকে। মুখ থেকে ভক ভক করে বেরোচ্ছে অ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ। ঠোঁট কামড়ে ড্যাশবোর্ড খামচে ধরেছে সুফিয়া। শুকনো মুখে দম বন্ধ করে বসে আছে জামিল। তার হিরো মার খেতে চলেছে। আগেও অনেককে পিটিয়ে তক্তা করেছে ডেভিড। হোমস্কে যেদিন মেরেছিল সেদিন দূর থেকে নিজের চোখে দেখেছে জামিল সব।

'মাতাল আমি, না তুমি? সাইড লেন থেকে কেউ এভাবে মেইন রোডে বের হয়?' কথাটা বলেই বুঝল রানা ভস্মে ঘি ঢালছে। এর সাথে তর্ক করা বৃথা। স্কুল-জীবন থেকে আজ পর্যন্ত এই লোক দৈহিক শক্তির দর্পে যুক্তি-তর্ক-সুবুদ্ধিকে জুতোর তলায় মাড়িয়ে এসেছে। অপরকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া টাইপ। হয় এর অত্যাচার মেনে নিতে হবে মুখ বুজে, নয় তো যেতে হবে বিরোধিতায়। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। আপোষ করতে চাইল সে, 'যা হবার হয়েছে, দোষ যদিও তোমার, মানুষ তো আর খুন-জখম হয়নি, লেট আস ফরগেট ইট। যাও, বাড়ি ফিরে ঘুমাও গিয়ে।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল লোকটা ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড, তারপর রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাল বার কয়েক, 'নতুন আমদানী মনে হচ্ছে?' বলেই ধপাস করে পা ঠুকল মাটিতে, 'ব্যাটা, কার সাথে কথা বলছিস তা জানিস?' রানার গলার স্বর নকল করে ভেঙাল, 'দোষ যদিও তোমার, মানুষ তো আর খুন-জখম হয়নি! হারামজাদা, আমার গাড়িটা যে তুবড়ে দিয়েছিস সেই ক্ষতিপূরণ দেবে কে?'

'দেখো, গালমন্দ কোরো না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'মাতাল পেটাতে আমার ভাল লাগে না। নিজের দোষে অ্যাক্সিডেন্ট করেছ, এই গাড়িরও ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু কিছুই এসে যায় না তাতে; আর কয়েক ঘণ্টা পর গোটা শহর খালি

হয়ে যাচ্ছে, গাড়িগুলো পড়ে থাকবে এখানে ওখানে, রাস্তায়। তোমাকে বলেছি, মাফ করে দেয়া হয়েছে তোমাকে···বদ্ধ মাতাল হয়ে রয়েছ, যাও, বাড়ি গিয়ে ঘুম দাও, কাল সকালে···'

'চোপ রাও!' প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। 'এত বড় স্পর্ধা! শুয়োরের বাচ্চা···তুই আমাকে, এই ডেভিড ব্রাউনকে, মাফ করে দিচ্ছিস! তোর মাফের আমি ইয়ে করি! আজ তোর একদিন—'

চড়াৎ করে প্রচণ্ড এক চড় পড়ল লোকটার গালে।

এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রস্তুত ছিল রানা, ঝট্ করে এক পাশে সরেই গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি চালাল লোকটার সোলার প্লেক্সাসে। ব্যথায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল ওর শরীর, পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। রানার ডান হাঁটু প্রায় থেঁতলে দিয়েছে ওর নাক।

চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড ব্রাউন। বুঝতে পেরেছে, মদের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওর রিফ্লেক্স, বিদ্যুৎগতি অকুতোভয় এই লোকটাকে খালি হাতে সামলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়—চট্ করে দুই পা পিছিয়ে গিয়েই বাম বাহুতে বাঁধা খাপ থেকে একটানে বের করল একখানা চার ইঞ্চি ব্লেডের ছোরা।

হেড লাইটের আলোয় ছোরাটা ঝিক করে উঠতেই দুই হাতে চোখ ঢাকল সুফিয়া। ও জানে, এই ছুরি ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না ডেভিড ব্রাউন। ভয়ে রসগোল্লা হয়ে গেছে জামিলের চোখ, হাঁ হয়ে আছে মুখ, ঢোক গিলছে ঘন ঘন।

ছোরা বের করতে দেখেই পা চালাল রানা। হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর খটাং করে বুটের আঘাত খেয়েই এক পায়ে বাউল নৃত্য শুরু করল ডেভিড। লাফাচ্ছে যন্ত্রণায়। কড়াৎ করে জুডো চপ পড়ল ওর ডান কাঁধে, অবশ হয়ে গেল গোটা হাত। সাঁৎ করে সরে এল রানা লোকটার পেছনে, কলার বোনের ঠিক ওপরে চেপে ধরল ওকে পেইন গ্রিপে। চকচকে চোখে চেয়ে রয়েছে জামিল। হঠাৎ হেসে উঠল, 'দেখো, দেখো আপা!'

তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল বিশাল চেহারার লোকটা রাস্তার ওপর, প্রার্থনার ভঙ্গিতে। চিৎকার করে উঠল, 'ছাড়ো, ছাড়ো! মাফ চাই! বাবা রে···!'

ছেড়ে দিল রানা ওকে। 'হয়েছে উচিত শিক্ষা? নাকি আরও দু'চার ঘা···'

'না, না! হয়েছে!'

'বেশ। সোজা বাড়ি ফিরে যাও। কাল খুব ভোরে তোমাকে হাজির চাই আমি ট্রেনে।'

'ও, আপনিই বুঝি নিতে এসেছেন আমাদের?' বোকার মত প্রশ্ন করল সে।

ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল রানা, 'আর, তোমার আঙুলের নখগুলোও

কাটা দেখতে চাই আমি সকালে।' পেইন গ্রিপ থেকে ছুটবার চেষ্টায় খামচি দিয়ে জায়গায় জায়গায় ছাল তুলে নিয়েছে সে রানার হাতের। 'নাউ, গেট গোয়িং···কুইক!'

গাড়িতে ফিরে গিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, ব্যাক গিয়ার দিয়ে ক্রাইসলারটাকে একটু পিছিয়ে নিতেই ভোঁ করে কেটে পড়ল ডেভিড ব্রাউন অস্টিন নিয়ে। একগাল হাসি নিয়ে হিরোর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে জামিল, প্রত্যুত্তরে রানা একটু হাসতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'উফ্! যা দেখালেন না! তবে আরও মার খাওয়া উচিত ছিল ওর। হোমসকে মেরে ওর চোখ-মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল ও।'

'কেউ হেরে গিয়ে মাফ চাইলে তাকে ছেড়ে দেয়াই তো উচিত। তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে ওই কাঁধের কাছে যে ওকে ধরেছিলেন···ওই প্যাঁচটা কিন্তু আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।'

হো হো করে হাসল রানা। বলল, 'ঠিক আছে, দেব শিখিয়ে।'

স্লোন হাইন্‌সকে পাওয়া গেল তার অফিসে। কি সব কাগজ পত্র নিয়ে তখনও কাজ করছে বুড়ো।

'এখনও কাজ করছেন?' হেসে জিজ্ঞেস করল সুফিয়া।

'না, এগুলো গুছাতে গুছাতে ক্যাপ্টেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।' বুড়ো ঠিকই বুঝেছে ক্যাপ্টেন তার খোঁজ করবে। এত বড় ট্রেনটা শুধু লোকজন নিয়ে যাবার জন্যে পাঠানো হয়নি। 'বসুন, ক্যাপ্টেন। এক মিনিট। এগুলো আমি গুছিয়ে ফেলেছি।' কাগজ পত্র নিয়ে ড্রয়ারে ভরল স্লোন, চাবি লাগাল, তারপর ফিরল রানার দিকে।

'শুনলাম উইলিয়াম ফ্রস্ট নাকি তার লোকজন নিয়ে এদিকেই আসছে। সবাই বলাবলি করছে, আগামীকাল দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবে ওরা। আপনি না এলে যে কি ঘটত···' কথাটা আর শেষ করল না বৃদ্ধ, টেবিলের উপরে রাখা চুরুটের বাক্সটা এগিয়ে দিল রানার দিকে।

'বলাবলিটা কারা করছে?' একটা চুরুট তুলে নিল রানা।

'ঘণ্টা খানেক আগে এখানকার স্থানীয় কয়েকজন লোকের কাছে খবরটা পেলাম। এদের এখানে এতদিন আছি, কিন্তু কেমন করে যে বহু দূরের খবরও এরা জেনে যায় সে-রহস্য আজও উদ্ধার করতে পারিনি। যতবারই এদের কাছে কোন আগাম খবর পেয়েছি, প্রত্যেকবারই দেখেছি সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।'

'শুনেছি ড্রাম বাজিয়ে খবর পাঠায় আদিবাসীরা সাঙ্কেতিক ভাষায়,' বলল রানা। 'ওরা সংখ্যায় কয়জন কিছু জানেন?' চুরুটটা ঠোঁটে লাগাল সে। ম্যাচ জ্বেলে স্লোন আগুনটা এগিয়ে দিতেই একটু ঝুঁকে এগিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল উপরের দিকে।

'জেনারেলের সাথে আছে শ'খানেক লোক, সবার কাছেই আধুনিক অস্ত্র।

সেনওয়াটিতে ট্রাক আর গাড়ি লুট করে সেগুলোতে চেপেই রওনা হয়েছে ওরা। কমার্শিয়াল অয়েল কোম্পানী থেকে ছিনতাই করা একটা তেলের ট্যাঙ্কারও সাথে রয়েছে ওদের।'

ভুরু কুঁচকে খবরটার তাৎপর্য নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'এবার আসল কথায় আসা যাক। হীরাগুলো সম্বন্ধে কাতাঙ্গা সরকারের বিশেষ নির্দেশ আছে।'

পাশেই দেওয়ালে বসানো স্টীল কেসটা দেখিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'তিন মাসে তোলা সমস্ত হীরা ওইখানে আছে। সাড়ে নয় হাজার ক্যারেট আছে জুয়েলারী বানাবার উপযুক্ত, আর ছাব্বিশ হাজার ক্যারেট শিল্পে ব্যবহার করার যোগ্য।'

'কিভাবে প্যাক করা আছে ওগুলো?' প্রশ্ন করল রানা।

'দেখাচ্ছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে সেফটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল স্লোন। তালার কমবিনেশন ঘুরানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুফিয়ার দিকে তাকাল রানা। প্রত্যুত্তরে একটু হাসল সে। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি ওরা কেউ। মেয়েরা যারা কখন মুখ বন্ধ রাখতে হবে জানে না, তাদের সহ্য করতে পারে না রানা। সেফের ডালা খুলে কাঠের একটা বাক্স এনে টেবিলের উপর রাখল স্লোন, 'এই যে, এতেই রয়েছে সব।'

বাক্সটা উঁচু করে দেখল রানা। প্রায় দশ সেরের মত হবে ওটার ওজন। বাক্সটা লম্বায় আঠারো ইঞ্চি, পাশে বারো ইঞ্চি, আর নয় ইঞ্চি উঁচু। 'ঢাকনাটা সীল করা রয়েছে দেখছি। সেটাই ভাল—কারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।' মন্তব্য করল রানা। তারপর আবার যোগ করল, 'কত দাম হবে এই পাথরগুলোর?'

একটু চিন্তা করে জবাব দিল স্লোন, 'তা, পাঁচশো মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক-এর কম হবে না।'

অর্থাৎ, পনেরো লক্ষ পাউণ্ড। অনেক টাকা। অসৎ লোকের জন্যে যথেষ্ট প্রলোভন।

'বাক্সটা আপনার কাছে থাক। কম্বল মুড়ি দিয়ে আপনার মালপত্রের সাথেই ট্রেনে উঠতে পারে ওটা। আলাদা গার্ডের ব্যবস্থা করে ওর প্রতি কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না। ম'সাপা জংশনে পৌঁছে ওটার দায়িত্ব নেব আমি। ওখানে পৌঁছানোর আগে চুরি যাবার ভয় নেই, কি বলেন?'

'ঠিকই বলেছেন। চুরি করে পালাবার পথ নেই। বেশ, আপনার কথা মতই কাজ হবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। হোটেলে ফিরতে হবে এবার আমাদের। খুব ভোরেই কিন্তু সব কিছু নিয়ে স্টেশনে হাজির থাকবেন।'

'অবশ্যই,' বলল স্লোন। 'বুড়ো হলেও আরও যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে আমার।' নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হেসে উঠল সে।

হোটেলে ফিরতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল ওদের। হোটেলে ফিরেই রানা ছয় কেস বিয়ার পাঠিয়ে দিল ট্রেনে পাহারারত জো-র জন্যে। আগের স্টক প্রায় শেষ, জানে রানা। হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালই করেছে বিল। দোতলার জানালায় একটা ব্রেনগান বসানো হয়েছে সামনের রাস্তাটা কাভার করে। রান্নাঘরে বসেছে আর একটা মেশিনগান পিছন দিকটা সামাল দেয়ার জন্যে। সার্জেন্ট রক মবুতুর নেতৃত্বে দশজনের একটা দল পাঠিয়ে দিল রানা বাইরে। ওরা সেনওয়াটি থেকে পোর্ট রিপ্রিভে পৌঁছানোর একমাত্র রাস্তাটার ওপর নজর রাখবে। জেনারেল ফ্রস্ট যদি কোন ভাবে সকালের আগেই এসে পৌঁছায় তবে ওখানেই ওদের ঠেকাবে মিনিট পনেরো, তারপর পিছু হটে এসে ট্রেনে উঠবে ওরা। গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই এখানকার লোকজন সহ ট্রেনে উঠে পড়বে রানা।

হোটেলের ভেতর ছোট ছোট দল বেঁধে এখানে-ওখানে জটলা পাকিয়ে গল্প-গুজব করছে সিভিলিয়ানরা। ওদের মালপত্র ট্রেনে তুলে দেয়া হয়েছে। এখন শুধু সকালের অপেক্ষা। রানার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি হানছে অনেকে, দেখে কেন জানি মন খারাপ হয়ে গেল ওর।

দোতলার ব্যালকনিতে একটা ইজিচেয়ার দেখে খানিক বিশ্রামের জন্যে বসল রানা। সিগারেট ধরাল একটা। চোখ বুজে সুফিয়া নামের মিষ্টি মেয়েটার কথা ভাবতে যাবে এমন সময় ডেটলের গন্ধে চোখ মেলে ঘাড় ফেরাল। একটুকরো ভেজা তুলো হাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। বিনা বাক্য ব্যয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। নখের আঁচড়ে কাটা জায়গাগুলো জ্বালা করে উঠল ওষুধ দিতেই।

'কফি?' জানতে চাইল সুফিয়া।

'চলতে পারে,' জবাব দিল রানা।

উড়ে চলে গেল সুফিয়া। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ইজিচেয়ারের পাশে এসে হাজির হলো জামিল। ওকে টেনে ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর তুলে বসাল রানা।

'কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি, জামিল?'

'ক্লাস ফোর। কিন্তু এখন পড়ি না। তিন মাস ধরে পড়াশোনা বন্ধ।'

'এখানে থাকতে কেমন লাগে তোমার?'

'খুব ভাল লাগে। প্রথম প্রথম কাঁদতাম, আপাকে ছেড়ে এখানে থাকতে খুব খারাপ লাগত; আপা দেখতে এলে বায়না ধরতাম, তার সাথে চলে যাব। কিন্তু ফাদার নেভিলের সাথে যখন বন্ধুত্ব হয়ে গেল...'

'ফাদার নেভিল...ওহ্-হো, তুমি সেইন্ট অগাস্টিন স্কুলে পড়ো বুঝি?' রানার মনে পড়ল ট্রেনে আসার পথে দূর থেকে চোখে পড়েছিল মিশনটা। ওখান থেকেই পাস করে ভাল চাকরি করছে জো-র ভাই। বলল, 'মাইল চারেক হবে। তাই না?'

'সোয়া চার মাইল,' সংশোধন করল জামিল। তারপর বলল, 'আজকে যা দেখিয়েছেন না! উহ্! ওই প্যাঁচটা আমাকে সত্যি শেখাবেন তো?'

'খালি ওটা কেন, আরও অনেকগুলো প্যাঁচ শিখিয়ে দেব। রোজ একটা করে। তোমার চেয়ে বড় বড় ছেলেরাও আর তোমার সঙ্গে পারবে না। লাগতে এলো…আর ধুড়ুম…এমন আছাড় মারবে তুমি…তারপর থেকে তোমাকে দেখলেই চোঁ-চাঁ দৌড় দেবে ওরা যে যেদিকে পারে।' মৃদু হাসল রানা। জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে জামিল, অকপটে বিশ্বাস করেছে সব কথা, কল্পনার চোখে মস্ত বীর হিসেবে দেখতে পাচ্ছে নিজেকে। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা, 'সবচেয়ে পাজিটার নাম কি?'

'জর্জ ম'লাগু। ক্লাস সিক্সে পড়ে। ওর গায়ে না, সাঙ্ঘাতিক জোর।'

'জোর থাকলে কি হবে? কায়দাই আসল কথা। আজকে দেখলে না? ওর সাথে গায়ের জোরে পারব আমি? উঁহুঁ। কিন্তু কি ঘটল?'

'বাবারে…বলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রাস্তায়।'

'হুঁ! ডান হাতটা মুঠি পাকাও দেখি? না-না, পুরো মুঠি না, অর্ধেক…মাঝের আঙুলের গিঁঠটা যেন সামনের দিকে বেড়ে থাকে। হ্যাঁ, এই রকম।' চেয়ারের হাতল থেকে নামিয়ে দিল রানা জামিলকে। 'মনে করো আমি ম'লাগু, তোমার সাথে লাগতে গেছি…তুমি শুধু মাঝের গিঁঠটা আমার বুকের এই জায়গায় চেপে ধরবে। ব্যস; আর এগোতে পারব না আমি। এগোতে গেলেই সাঙ্ঘাতিক ব্যথা লাগবে।'

রানার বুকে হাড়ের ওপর মাঝের আঙুলের গিঁঠ ঠেকিয়ে রেখেছে জামিল, রানা এগোবার চেষ্টা করছে, পারছে না, কিন্তু এতে মোটেই মুগ্ধ হলো না সে। বলল, 'কই, ব্যথা তো লাগছে না!'

'আরে! তোমার লাগবে কেন, ব্যথা লাগছে আমার,' বলল রানা, 'ঠিক আছে, এবার আমি জামিল, তুমি ম'লাগু। এসো দেখি?'

ঠেলে সামনে এগোতে গিয়েই ব্যাপারটা টের পেল জামিল। উহ্ করে চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায়, কিন্তু খুশিতে চিকচিক করছে চোখ দুটো। 'আশ্চর্য তো। এত ব্যথা লাগে কেন?'

'কই, আমার তো লাগছে না!' হাসিমুখে বলল রানা।

রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল জামিল।

এমনি সময়ে দু'হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে হাজির হলো সুফিয়া। 'কি রে, এত হাসির কি হলো?'

'কিছু না,' গম্ভীর হয়ে গেল জামিল। গোপন সলা-পরামর্শের ভঙ্গিতে রানাকে বলল, 'কাল আরেকটা, হ্যাঁ?'

'বেশ।'

'এবার যাও তো, ভাইয়া, ঘুমিয়ে পড়ো গে যাও।' পরিষ্কার বাংলায় বলল সুফিয়া জামিলের উদ্দেশে। চলে গেল জামিল খুশি মনে, ডান হাতটা মুঠি পাকানো

নিজের বুকের ওপর ট্রাই করছে আঙুলের গিঁঠ।

কিছু বোধহয় বলতে চেয়েছিল সুফিয়া রানাকে, কিন্তু সে সুযোগ হলো না। হঠাৎ রানার সন্দেহ হলো; ফাদার নেভিলকে কি খবর দেয়া হয়েছে? তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সে ব্রুস লেভীকে খুঁজে বের করতে।

কাঁচুমাচু মুখে জানালেন লেভী, 'মিশনের কথা একদম ভুলে গেছিলাম, ক্যাপ্টেন, ক্ষমা করবেন। এখুনি খবর পাঠাবার…'

'গাড়িটা নিচ্ছি, আমি নিজেই যাব খবর পৌঁছাতে,' বলেই ফিরে এল ব্যালকনিতে। দুই ঢোকে শেষ করল কফির কাপ। সুফিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মিশনের রাস্তা চেনো? এখনই যেতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, আমি জামিলকে বলেই চলে আসছি।' নিজের কামরার দিকে চলে গেল সুফিয়া।

গাড়িতে উঠেই অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল সুফিয়া, 'আশ্চর্য! ভুলেই গিয়েছিলাম মানুষটার কথা! অবশ্য আমাদের কি দোষ, অনেক বলে কয়েও এখানে চলে আসতে রাজি করানো যায়নি ওঁকে।'

জবাব দিল না রানা।

'রেগেছেন?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জানতে চাইল সুফিয়া।

জবাব দিল না রানা।

'মেজাজটা কি সব সময়েই খারাপ থাকে আপনার?'

'না। শুধু যখন কারও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে খাওয়া বিশ্রাম ত্যাগ করে ছুটতে হয় সোয়া চার মাইল দূরের কোন মিশনের দিকে, তখন।' একটু হাসল রানা, তারপর বলল, 'ভাষা থেকে "সব সময়" শব্দটা উড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হত। ও রকম কিছু নেই আসলে কোথাও।'

'নিজেকে ত্রুটিশূন্য বোনাপার্ট ভাবতে ভালবাসেন বুঝি? শান্ত, ঠাণ্ডা, নীরব, দক্ষ…ইত্যাদি?'

'না, তা ঠিক ভাবি না…' স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলল রানা। আড়চোখে দেখল মুচকি হাসি ঝুলছে সুফিয়ার ঠোঁটে। বলল, 'ঠিক আছে। স্বীকার করি, ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করে ফেলেছি।'

'বুঝলাম, নিজের ছাড়া আর কারও ভুল পছন্দ করেন না আপনি…'

'নিজেরগুলোও পছন্দ করি না।'

'এমন কিছু নেই, যা আপনি পছন্দ করেন?'

'আছে, অনেক কিছুই।'

'যেমন?'

খুব বেশি ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়িটা। রাস্তার এক কিনার ধরে চালাচ্ছে রানা।

অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তায় এসে মুখ খুলল।

'পাহাড়ের মাথায় উঠে দাঁড়াতে পছন্দ করি—যখন জোর হাওয়ায় পতাকার মত উড়তে চায় জামা-কাপড়। ভাল লাগে সাগরের নীল ঢেউয়ের মাথায় সফেদ ফেনা, শুকনো মাটিতে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ, আমার দেশের কোন গায়কের স্মৃতি দোলা দেয়া জ্যোৎস্না মাখা গান, কচি ছেলেমেয়ের খোলা গলার নির্মল হাসি। পছন্দ করি শিউলী, ছাতিম, হাস্নাহেনার নিবিড় গন্ধ, কমলা-খোসার ঝাঁঝ, মখমলের স্পর্শ। ভাল লাগে ঘোড়ার চাল দিয়ে প্রতিপক্ষের রাজা-রানীকে একসাথে ধরতে পারলে, অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাতে পারলে। জঙ্গলের ভেতর ঝিলিমিলি ছায়া পছন্দ করি। মনের মত কাজ পছন্দ করি। আর, হ্যাঁ, মেয়েদের ভাল লাগে—বিশেষ করে ভাল লাগে তাদের যারা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে না।'

'ব্যস? এই?'

'না, আরও আছে—আরও অনেক কিছু।'

'আর অপছন্দ করেন কি কি?'

'যে-সব মেয়ে অনেক বেশি প্রশ্ন করে, তাদের,' চোখের কোণে দেখল রানা হাসছে সুফিয়া। বলল, 'স্বার্থপরতা (নিজেরটা বাদে), রাজনীতি, আর্ট ফিল্ম, হাঁসের ডিম, কারও জন্যে অপেক্ষা করা ইত্যাদি।'

'নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছুই আছে?'

'বিস্তর।'

'আপনি মানুষটা ইন্দ্রিয়পরায়ণ। আপনার ভাল লাগা না লাগা বেশির ভাগই ইন্দ্রিয়-নির্ভর।'

'ঠিক।'

'স্ত্রী, বান্ধবী, আত্মীয়স্বজন বা অন্য মানুষ সম্পর্কে উল্লেখ নেই কেন?'

'যেহেতু বিয়ে করিনি, যেহেতু আত্মীয় স্বজন নেই, যেহেতু বান্ধবীদের নাম বলতে শুরু করলে রাত শেষ হয়ে যাবে। এবার কি ডান দিকে?'

'হ্যাঁ। আস্তে যাবেন। রাস্তা খারাপ। আপনার কি…?'

'অ্যাই, মেয়ে! থামবে? নাকি চাঁটি লাগাব একটা?'

তিন সেকেণ্ড চুপ করে থাকল সুফিয়া, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আর শুধু একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'জাস্ট একটা।'

'সিগারেট খাবেন?'

হাসল রানা। বলল, 'এতক্ষণে একটা মনের মত প্রশ্ন করেছ। শহরে ফিরেই কিনতে হবে। ফুরিয়ে গেছে…একটাও নেই।'

ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে এক শলা ধরিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সুফিয়া।

'তুমি সিগারেট খাও না বলেছিলে না?' ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পুরো প্যাকেট বেরুল দেখে কটাক্ষ করল রানা।

প্যাকেটটা সন্ধ্যার পরে ক্যাপ্টেন লুইসের জন্যেই কিনেছে সুফিয়া। কিন্তু সে কথা বলতে পারল না সে। চট করে চলে গেল অন্য কথায়। 'সামনেই বামের রাস্তাটা ধরে যেতে হবে আমাদের। প্রায় এসে গেছি।'

বাঁয়ের রাস্তাটা ধরে কিছুদূর এগুতেই লাইট চোখে পড়ল রানার। মিশন দেখা যাচ্ছে। চার্চটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা লম্বা নিচু দালান। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কে যেন হেঁটে গেল। 'ওটাই কি হাসপাতাল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' ছোট করে জবাব দিল সুফিয়া।

বারান্দার সামনেই গাড়ি পার্ক করল রানা। সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠেই ডান পাশে অফিস ঘরটা। অফিস ঘরে পাওয়া গেল না কাউকে। ছোট্ট অপারেটিং থিয়েটারটা পেরিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকল ওরা। ঝুঁকে উবু হয়ে একদল রোগীকে দেখছিলেন ফাদার নেভিল। ওদের দেখেই এগিয়ে এলেন। হাসি মুখে বললেন, 'আরে, সুফিয়া যে! কি খবর? জামিল আসেনি?'

'না, ওকে হোটেলেই রেখে এসেছি। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন লুইস পেগান, আপনাকে নিতে এসেছেন।'

হেসে হ্যাণ্ডশেক করলেন ফাদার রানার সাথে, 'হাউ ডু ইউ ডু।'

জবাবে রানাও বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু।'

ছয়ফুট তিন কি চার ইঞ্চি লম্বা হবেন ফাদার। ছিমছাম গড়ন। একটু হাড্ডিসারই বলা যায়। গরম এড়াবার জন্যে পোশাকের হাতা কেটে ছোট করা হয়েছে। হাতের নীল শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে। হাতে পশম নেই বললেই চলে। হাতের পাঞ্জা আর পা বেঢপ রকমের বড়।

'বিকেলের দিকে ট্রেনের হুইসেলের আওয়াজ পেয়েছি। আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছ তোমরা সবাই।' স্টীল রিমের চশমার ভিতর দিয়ে শান্ত চোখে রানার দিকে চেয়ে বললেন ফাদার নেভিল।

'কাল সকালে রওনা হচ্ছি আমরা,' বলল রানা। 'সবাইকে উদ্ধার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। তাই আপনাকে নিতে এসেছি, হোটেলে গিয়ে রাতটা কাটালে...'

'খুব খুশি হয়েছি আমি, বাছা—আমার কথা মনে করে নিজেই কষ্ট করে এতদূর এসেছ নিতে, এজন্যে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে, তোমাদের সাথে আমি যেতে পারব না। এই এদের এই অবস্থায় ফেলে,' ফাদার নেভিল রোগীদের দেখিয়ে বললেন, 'আমি কিছুতেই যেতে পারব না।'

'ফাদার, আমরা খবর পেয়েছি জেনারেল ফ্রস্টের অধীনে শ'খানেক লোকের

একটা তস্কর দল সেনওয়াটিতে লুটতরাজ চালিয়ে এদিকে রওনা হয়েছে। ওরা এসে পৌঁছানোর আগেই আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ওদের হাতে পড়লে কারও আর রক্ষা থাকবে না। ওরা যে কতখানি নিষ্ঠুর তার কিছু প্রমাণ ওরা রেখে এসেছে সেনওয়াটিতে।' ঘটনার গুরুত্বটা বোঝাবার চেষ্টা করছে রানা।

'হ্যাঁ, খবর আমিও পেয়েছি। ওরা এসে পৌঁছলে আমাদের করণীয় কি হবে তা-ও আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।'

'কি বলছেন আপনি, ফাদার, এতগুলো উচ্ছৃঙ্খল লোককে আপনি কি করে ঠেকাবেন?' জানতে চাইল রানা।

'ঠেকাব না। আমার লোকজন আর রোগীদের নিয়ে পালিয়ে যাব জঙ্গলে,' বললেন ফাদার নেভিল।

'ওরা আপনাদের পিছু নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আপনাদের খুন করবে!' উৎকণ্ঠিত সুফিয়া।

'আমার তা মনে হয় না।' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে মাথা নাড়লেন ফাদার নেভিল। 'ওরা আসছে লুটতরাজ করতে, জঙ্গলে ঢুকে কয়েকটা রোগীকে মারতে গিয়ে মিছে সময় আর বুলেট নষ্ট করবে না ওরা।'

'ওরা আপনার মিশনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট করে তছনছ করবে।'

'তা যদি করে তবে ওরা চলে যাবার পর আবার আমাদের নতুন করে সব কিছু গড়ে নিতে হবে।'

'জঙ্গলে গিজ গিজ করছে বালুবা। জঙ্গলে ঢুকলে নির্ঘাত বালুবাদের পেটে যাবেন আপনারা।' অন্য ভাবে চেষ্টা করল রানা।

'না, সেদিক দিয়ে কোন ভয় নেই। বালুবাদের প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে আমার এখানে চিকিৎসা পেয়েছে। ওরা আমাকে বন্ধু বলেই জানে। ওরা কোন ক্ষতি করবে না আমার।'

'কিন্তু আমার ওপর নির্দেশ রয়েছে সবাইকে নিয়েই ফিরতে হবে আমাকে,' বলল রানা।

'আর আমার ওপর নির্দেশ আছে এখানেই থাকতে হবে আমাকে,' প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে যে তুমি যার নির্দেশে কাজ করছ তার চেয়ে অনেক অনেক উঁচু লেভেল থেকে আসে আমার নির্দেশ।'

'নাহ্, আপনাকে টলানো যাবে না।' ফাদার নেভিলের অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানল রানা। 'কিছু দরকার থাকলে বলুন, আমাদের স্টকে থাকলে আমি পৌঁছে দেব।'

'ওষুধ কিছু আছে?'

'এক্রিফ্লেভিন, মরফিয়া আর ফিল্ড ড্রেসিং ছাড়া বিশেষ কিছু নেই,' জবাব দিল রানা।

'ওতে অনেক কাজ হবে। আর খাবার জিনিস?'

'আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা আছে সব আমি পৌঁছে দিতে পারি।'

হঠাৎ চমকে উঠল রানা বিকট মেয়েলী চিৎকারে। ওয়ার্ডের শেষ মাথার মেয়েটা চিৎকার করে উঠেছে।

'আজ রাতেই মারা যাবে বেচারী,' অসহায় ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বললেন ফাদার নেভিল, 'কিছুই করার উপায় নেই।'

'কেন, কি হয়েছে ওর?'

'গত দু'দিন থেকে লেবার চলছে, সেই সাথে কিছু খারাপ উপসর্গও দেখা দিয়েছে,' ধরা গলায় বললেন ফাদার। 'চোখের সামনে দেখছি, মরছে, কিন্তু করার কিছু নেই, এর চেয়ে অসহায় অবস্থা বোধ হয় মানুষের জীবনে আর আসে না।'

'অপারেশন করলেই তো হয়।' অবাক হলো রানা।

'জানি। কিন্তু কে করবে? আমি তো ডাক্তার নই। যিনি ছিলেন, গোলমালের সময়ে এলিজাবেথভিলে ফিরে গেছেন। এ বেচারীর আর কোন আশা নেই।'

চট করে মনে পড়ে গেল রানার বিলের কথা।

'আপনার অপারেশন থিয়েটার তো আছে দেখলাম, যন্ত্রপাতি সব আছে?'

'মোটামুটি সবই আছে। কেন?'

'এনেসথেটিক?'

'ক্লোরোফরম আর পেন্টোথাল আছে আমাদের।'

'ঠিক আছে, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি। চলো, সুফিয়া, শিগগির হোটেলে ফিরতে হবে আমাদের।'

আট

প্রচণ্ড গরমে ঘামছে ফ্রেড। রুমাল বের করে ঘাম মুছে সবুজ চামড়ার বাক্সে চিৎ হয়ে শুলো সে। অসহ্য গরম লাগছে ওর। সবটাই আবহাওয়ার গরম না। ওর মনটাও জ্বলছে। রাগে, দুঃখে, হিংসায় জ্বলছে সে। রাগ—তার থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন লুইসকে দেয়া হয়েছে বলে। দুঃখ—তার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে নজর বন্দী করা হয়েছে বলে। আর হিংসা—তাকে ট্রেনে ফেলে রেখে অমন সুন্দরী মেয়েটার সাথে ক্যাপ্টেন লুইসকে হোটেলে যেতে দেখে। হোটেলে গিয়েই মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে লুইস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে কল্পনার চোখে, আর ছটফট করছে হিংসায়।

'আমাদের জন্যে বিয়ার পাঠিয়েছে বটে কিন্তু আসল মজা ওই শালাই লুটছে,' জো-র উদ্দেশে বলল ফ্রেড।

'কাউকে না কাউকে তো থাকতেই হত ট্রেনটা পাহারা দেয়ার জন্যে। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেই এটা দরকার, এটা তো অস্বীকার করতে পারবে না। এত খেপেছ কেন?' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল জো।

'তোমরা পচে মরো এই গরমে, আমি চললাম হোটেলে।' ক্যাপ্টেন লুইস যে কি মজা লুটছে সেটা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই ওর। আর যদি ছুঁড়িটাকে মওকা মত পাওয়া যায়, তাহলে···জিভে পানি এসে গেল ফ্রেডের।

'কিন্তু ক্যাপ্টেন তোমার হোটেলে যাওয়াটা পছন্দ নাও করতে পারেন।' আমতা আমতা করছে জো, এই পরিস্থিতিতে তার কি করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। সাদা চামড়ার লোক, বাধা দেয়া কি উচিত হবে?

'গুলি মারো শালার ক্যাপ্টেনকে!' খেপে গেছে ফ্রেড, 'নিজের মৌজটা তো সে ষোলো আনা ঠিকই পুরো করে নিচ্ছে, আমরা কি দোষ করলাম? কোন দিক থেকে ছোট আমি ওর চেয়ে?'

'নাও, একটা বিয়ার ধরো,' একটা বোতল বাড়িয়ে দিল জো। কিন্তু ফ্রেড শান্ত হবার নয়। ঢকঢক করে একটানে বোতলটা শেষ করে বলল, 'আমি চললাম হোটেলে। সকালে আবার দেখা হবে।'

একবার ভাবল জো—দিই আটকে। কিন্তু যার অধীনে গত একটা বছর কাজ করেছে, রাগের মাথায় তাকে মারতে গিয়েছিল বটে, ঠাণ্ডা মাথায় তাকে বাধা দিতে পারল না। ক্যাপ্টেনও এর ব্যাপারে কোন বিশেষ নির্দেশ দিয়ে যাননি। কি করা উচিত বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত পায়ে হোটেলের দিকে রওনা হয়ে গেল ফ্রেড। নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার পর বুঝতে পারল সে, কাজটা ভাল হলো না। কিন্তু তখন আর করার কিছুই নেই তার।

হোটেলের বারান্দায় দেখা পেল ফ্রেড ব্রুস লেভীর। লোকজনকে এটা ওটা নির্দেশ দিয়ে শেষ মুহূর্তের কাজ সব গুছিয়ে নিচ্ছেন তিনি।

'ক্যাপ্টেন লুইস কোথায়?' কর্কশ দুর্বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ফ্রেড।

ভ্রূ কুঁচকে গেল বৃদ্ধের উদ্ধত কণ্ঠস্বর শুনে। কিন্তু পিছন ফিরে আর্মির পোশাক পরা লোক দেখে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বললেন, 'মিশনে গেছেন উনি, লেফটেন্যান্ট।'

'কখন গেছে?' ধমকে উঠল ফ্রেড।

'মিনিট দশেক হবে।' হাসি মুছে গেছে লেভীর ঠোঁট থেকে।

'বেশ ভাল কথা; তা বারের চাবিটা কার কাছে?'

লোকটা যে ভাল নয়, বুঝে গেছেন বৃদ্ধ। পরিষ্কার কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'ক্যাপ্টেনের নির্দেশে বার তালা-বন্ধ রাখা হয়েছে।'

'বেহুদা প্যাচাল পেড়ো না, বুড়া মিয়া, মেজাজটা খারাপ আছে আজ। দেখি,

চাবিটা বের করো।'

এই ধরনের ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত নন ব্রুস লেভী। অনেক কষ্টে রাগ সামলে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'ক্যাপ্টেনের নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারব না, লেফটেন্যান্ট। চাবিটা আপনি তার কাছ থেকেই নেবেন।'

কঠিন দৃষ্টিতে বুড়োকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করে বিফল হলো ফ্রেড। বুঝে নিল, নির্দেশের নড়চড় করবে না বুড়ো।

'ঠিক আছে, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিচ্ছি।' বীরদর্পে বার রুমের দিকে এগুলো ফ্রেড। বুটের লাথিতে খুলে গেল দরজা। সোজা কাউন্টারে গিয়ে দুটো সিম্বা বিয়ারের বোতল তুলে নিল। বোতল খুলে প্রথমটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে তৃপ্তির সাথে একটা ঢেকুর তুলল। তারপর খুলল দ্বিতীয় বোতলটা। উপচে পড়া ফেনা দেখছে মন দিয়ে।

'ফ্রেড!' নিজের নাম শুনে চমকে ফিরে তাকাল ফ্রেড। দরজায় দাঁড়িয়ে বিল।

'আরে বিল নাকি, এসো, ভেতরে এসো, দোস্ত!' সাদরে আমন্ত্রণ জানাল ওকে ফ্রেড।

'এসব কি হচ্ছে?' ভর্ৎসনার সুরে বলল বিল।

'দেখতেই তো পাচ্ছ, বাপ—মদ খাচ্ছি,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিয়ে বোতলটা তুলে একটা চুমুক দিল ফ্রেড।

'ক্যাপ্টেনের লাগানো তালা ভেঙে ঢুকেছ তুমি বারে!'

'ওর বাপের লাগানো তালা হলেও ভেঙেই ঢুকতে হত,' বলল ফ্রেড। 'এক বুড়ো বজ্জাত কিছুতেই দিল না চাবিটা। যাই হোক, দরজায় দাঁড়িয়ে কেন, দোস্ত! চলে এসো; দেখা যাক কে কয় পেগে আউট হয়।'

দরজার বাইরে বেশ কয়েকজন জড় হয়েছে ঘটনা দেখার জন্যে। পিছন ফিরে জটলা দেখে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে ফ্রেডের সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল বিল।

'ঘাপলা চাই না আমি, ফ্রেড,' বলল সে। 'দয়া করে গুলি করতে বাধ্য কোরো না আমাকে। সিধে কথায় যাবে এখান থেকে?'

'বিল, তুমি'তো জানো,' অর্থপূর্ণ হাসি হাসল ফ্রেড, 'তুমি কি চাও যে আমি কোথাও মদ না পেয়ে পেট ফুলে মরে যাই?' কাউন্টারের ওপর বাম কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতে বোতলটা তুলে নিল সে। 'প্লীজ, এক্ষুণি বের করে দিয়ো না আমাকে, দুটো মিনিট সময় দাও, বোতলটা শেষ করতে দাও শান্তিতে।'

'ঠিক আছে। দুই মিনিট। এর মধ্যেই বোতল শেষ করে দূর হতে হবে তোমাকে,' কঠিন সুরে বলল বিল।

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, বিল। আমি তোমাকে আগে বুঝতে পারিনি। আসলেই তোমার একটা কোমল মন আছে। সেদিনের দুর্ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত।'

'নাও, শেষ করো তোমার বোতল,' তাড়া দিল বিল।

পিছনের শেলফ থেকে রেমি মার্টিন কনিয়াকের বোতলটা তুলে নিল ফ্রেড পিছনে না তাকিয়েই। 'ব্যাণ্ডি বেলুন' গ্লাস তুলে নিল অন্য হাতে। দাঁত দিয়ে কর্ক খুলে একটু ব্র্যাণ্ডি ঢালল গ্লাসটায়।

'তুমি তো জানো, একা খেয়ে মজা নেই, একটু সঙ্গ দাও না আমাকে?' গ্লাসটা কাউন্টারে রেখে ঠেলে দিল ফ্রেড বিলের দিকে।

গ্লাসটার দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে রয়েছে বিল। জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল একবার। 'জাহান্নামে যাও তুমি!' সজোরে হাত চালিয়ে গ্লাসটা ঠেলে ফেলে দিল সে। কিছুটা ব্র্যাণ্ডি কাউন্টারে ছলকে পড়ল, গ্লাসটা দূরের দেয়ালে লেগে ঝনঝন শব্দে ভেঙে নিচে পড়ল। ছলকে পড়া কনিয়াকের গন্ধ নাকে গেল বিলের। অত্যন্ত পরিচিত, লোভনীয় গন্ধ।

'রেগে যাচ্ছ কেন?' তোমার সঙ্গ কামনা করে কি এমন অন্যায় করেছি আমি? এমন না যে তুমি কোনদিন খাওনি এসব। দুর্ব্যবহারের জন্যে মাফ চেয়েছি, তোমাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছি, বন্ধুর সাথে আজ না হয় খেলেই একটু।' আর একটা গ্লাসে নিয়ে আবার কিছুটা ঢেলে বাড়িয়ে দিল ফ্রেড।

কনিয়াকের তীব্র গন্ধ ভাসছে বাতাসে। প্রতিটা ঢোকে সারা শরীরে কেমন অপূর্ব গরম ছড়িয়ে পড়ে, মনটাকে কেমন হালকা করে দেয়…আর পারল না বিল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, হঠাৎ তীব্র তৃষ্ণা বোধ করল সে। এক ঢোক না খেলে বাঁচবে না।

গ্লাসটা তুলে নিয়ে একটু চেখে দেখল প্রথম, তারপরেই এক ঢোকে খালি করে নামিয়ে রাখল।

'আর একটু দিই তোমাকে,' গ্লাসটা আবার ভরে দিল ফ্রেড। 'এতদিন উপোস করেছ, আজ আশ মিটিয়ে খেয়ে নাও। কি দরকার অযথা নিজেকে কষ্ট দেয়ার?' এতদিন পরে বিলকে বাগে পেয়েছে ফ্রেড। আজ তাকে বেহেড মাতাল করে মেঝেতে হামাগুড়ি খাওয়াবে বলে মনে মনে ঠিক করল।

'তুমি আজ আমার অবস্থা কাহিল করে ছাড়বে বুঝতে পারছি,' খালি গ্লাসটা ফ্রেডের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল বিল।

'আরে দূর, কিসের কাহিল…রোজ তো আর নয়, একটা দিন না হয় একটু খেলেই।'

পর পর আরও দু'গ্লাস শেষ করে কর্তব্য বোধটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল বিলের মধ্যে।

'কিন্তু ক্যাপ্টেন লুইসকে আমি কি জবাব দেব? আমার ওপর হোটেলের চার্জ…'

'আরে ছাড়ো ওর কথা! নিজে তো সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে মৌজ করতে

বেরিয়েছে। আমাদেরও কি একটু আমোদ ফুর্তি করার অধিকার নেই?' প্রবোধ দিল ফ্রেড। 'চুরি ডাকাতি তো আর করছি না, ব্যাটাছেলে মানুষ, একটু না হয় নেশা করছি। এতে কার বাপের কি?'

'কিন্তু হোটেল...'

'মত ঘাবড়াও, দোস্ত! তুমি ছাড়াও বহুত লোক আছে— ওরা দেখবে।'

আগের মতই দাঁত দিয়ে কামড়ে খুলল সে দ্বিতীয় বোতলের ছিপিটা।

এইভাবে চলল বোতলের পর বোতল।

এখন আর বিলকে সাধতে হচ্ছে না, সে-ই বরং হাতে-পায়ে ধরছে ফ্রেডের।

'খাও, ডোস্ট। একডিনই টো...'

নয়

টায়ারের আর্তনাদ তুলে থামল গাড়িটা হোটেলের সামনে। একটু জোরেই চালিয়েছে রানা সারাটা পথ। উপায় থাকতে দু'দুটো জীবন নষ্ট হতে দিতে পারে না সে। নেমেই ছুটল বিলের খোঁজে। পিছন পিছন সুফিয়া।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চোখে পড়ল লবিতে দশ বারো জনের একটা জটলা। একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে ওদের মাঝে। ব্রুস লেভী এগিয়ে এলেন, 'ক্যাপ্টেন, আপনার নির্দেশ অমান্য করে বারে ঢুকে মদ খাচ্ছে আপনার এক লোক।'

'বাধা দিতে পারেননি? চাবি কোথায় পেল ও?'

'চাবির পরোয়া না করে লাথি মেরে দরজা ভেঙেছে।'

'লেফটেন্যান্ট বিলকে জানাননি কেন? কোথায় ও?'

'বিল গেছিল ওকে বাধা দিতে, কিন্তু এখন দেখছি সে-ও মাতাল হয়ে বসে আছে।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। বলল, 'আপনারা এতজন লোক কিছুই করতে পারলেন না?'

'কি করব, বলুন? লাল-চুলো লোকটার যা রুক্ষ মেজাজ! লেফটেন্যান্ট বিলের রাইফেলটা এখন ওর হাতে। ওদের না ঘাঁটিয়ে অপেক্ষা করছি আমরা আপনার জন্যে।'

ভিতর থেকে এই সময় ফ্রেডের অট্টহাসি শোনা গেল। দরজাটা ভিড়ানো। লবি পার হয়ে বার রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ধাক্কা দিতেই খুলে হাঁ হয়ে গেল কপাট দুটো, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেড। বাম হাতে মদের গ্লাস, ডান হাতে রাইফেলটাকে পিস্তল গ্রিপে ধরে শূন্যে বৃত্ত আঁকছে রাইফেলের নল দিয়ে।

কাউন্টারে রানার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে বিল। গ্লাস দিয়ে পিরামিড বানাচ্ছে সে। পিরামিডের মাথায় শেষ গ্লাসটা বসাতে গিয়ে চোখ পড়ল তার রানার দিকে। 'হ্যালো, লুইস, ঠিক সময়েই এসেছ। এসো, টোমাকেও চান্স ডেয়া হবে। কিন্তু ফ্রেডের পালা আগে, গণটানট্রিক নিয়ম টো ভাঙটে পারি না! মডের আসরে সবাই সমান, র‍্যাঙ্কের কোন টারটম্য নেই এখানে, কি বলো, ফ্রেড?' জড়িয়ে জড়িয়ে কথাগুলো বলে ফ্রেডের সমর্থন চাইল সে।

'সরে যাও, বিল, ওখান থেকে!' রাইফেল তাক করল ফ্রেড গ্লাস পিরামিডের দিকে। 'তিনটে ফেলতে পারলেই একটা নারকেল।' বিড়বিড় করে বলল ফ্রেড। মেলায় এয়ার রাইফেলের এই খেলা চালু আছে ইংল্যাণ্ডে। টিনের তিনটে মূর্তি দাঁড় করানো থাকে, তিনটেকেই এয়ার রাইফেল দিয়ে ফেলতে পারলে পুরস্কার—একটা নারকেল।

চারদিক কাঁপিয়ে গর্জে উঠল ফ্রেডের রাইফেল। গ্লাস পিরামিডের সবচেয়ে উপরের গ্লাসটা গুলির আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কি হচ্ছে এসব?' ধমকে উঠল রানা।

'আনন্দ!' জবাব দিল ফ্রেড। সুফিয়াকে দেখাল। 'তোমার ওই মাগীবাজিতে বাদ সাধতে গেছি আমরা? তুমিও আমাদের ফুর্তিতে বাদ সাধতে এসো না; ফলটা খুব খারাপ হবে।'

বিল সমর্থন করল ফ্রেডকে, 'হ্যাঁ, আমাদের ফুট-ফুট-ফুর্তি নষ্ট কোরো না, লুইস।' দরজার ওপাশে দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'ওর জন্যে শিগগির একটা নারকেল নিয়ে এসো।'

'আজ সকাল থেকেই তুমি আমার পেছনে লেগেছ!' রানাকে সামনে বাড়তে দেখে শাসাল ফ্রেড। 'দুটো রাক্ষসের বাচ্চা মেরেছি, খুশির কথা, আর তুমি শালা আমার বিচার করাতে চাও? কাম অন, আজ তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিই। আমার সাথে লাগতে চাও তুমি? এসো ঠিক জায়গা মত লাগিয়ে দিচ্ছি।' খেপে গেছে ফ্রেড। 'কই এসো?'

'মাতলামি কোরো না, ফ্রেড!' বলল রানা।

'আমাকে মাতাল ঘোষণা করেও পার পাবে না, বাছাধন। লাগতে চাও না তুমি আমার সাথে? তাহলে আমারই শুরু করতে হয়।' এগিয়ে এল সে রানার দিকে।

কাঁধ ঝাঁকি দিল রানা। কাঁধে ঝুলানো রাইফেলটা পড়ছে মাটিতে। কিন্তু পড়ার আগেই ওটাকে দু'হাতে ধরে উপর দিকে চালাল রানা। রাইফেলের বাঁটটা গিয়ে লাগল ফ্রেডের থুতনিতে। প্রচণ্ড আঘাতে মাথাটা বিরাট একটা ঝাঁকি খেল। দু'হাত থেকে রাইফেল আর মদের গ্লাস খসে পড়ল। কয়েক পা পিছিয়ে দেয়ালের উপর গিয়ে পড়ল সে, মাথা ঠুকে গেল জোরে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ওর চোখ

দেখে বুঝল রানা ফাইটিং-এর স্পৃহা উবে গেছে এক বাড়িতেই। কলার ধরে ওকে টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসাল রানা। নিজের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তলটা বের করে সুফিয়ার হাতে দিল সে। 'ওই চেয়ার ছেড়ে উঠলেই ওকে গুলি করবে। বুঝেছ? পারবে?'

দুই হাতে পিস্তল তাক করে ধরল সুফিয়া। বলল, 'মনে হচ্ছে পারব।'

'সাবধান! জানোয়ারেরও অধম এই লোক। আজ সকালেই ও দুটো নিরপরাধ বাচ্চাকে বিনা কারণে খুন করেছে। সুযোগ পেলে তোমাকেও খুন করবে। আর একটু পিছনে সরে দাঁড়াও, ওর নাগালের মধ্যে থেকো না।' আর একটু পিছনে সরে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াল সুফিয়া। আর কোন সংশয় নেই এখন ওর মনে।

'আমরা একটু আনন্দ করতে চাইলেই দোষ। আর তুই যে মাগীটাকে নিয়ে কোথায় কোন ঝোপ-ঝাড়ে কি করেছিস, সেটা দোষের কিছুই না!' অনুযোগ করল ফ্রেড, হাতের অশ্লীল ইঙ্গিত করে দেখাল কি করেছে সুফিয়া আর ক্যাপ্টেন।

খপ্ করে ওর চুলের মুঠি ধরল রানা। 'চুপ, হারামজাদা! আজকে মেরেই ফেলব তোকে!'

পড়পড় করে ছিঁড়ে উঠে আসছে ফ্রেডের চুল রানার মুঠির চাপে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল ফ্রেড। 'উহ্! চুল ছাড়! সব যে ছিঁড়ে গেল! তওবা করছি আর বলব না অমন কথা।'

ছেড়ে দিল ওকে রানা। 'চুপ করে বসে থাকো, চেয়ার ছেড়ে নড়লেই গুলি খাবে' সাবধান করে দিল।

আর এক গ্লাস মদ ঢেলেছে বিল নিজের গ্লাসে। গোলমালের ফাঁকে শেষ একগ্লাস গিলে নেয়ার ইচ্ছে ছিল ওর। রানাকে ওর দিকে এগোতে দেখে ঘাবড়ে গেল। 'আরে! আমি কি করেছি? আমার ডিকে আসছ কেন?' বলেই চুমুক দেয়ার চেষ্টা করল গ্লাসে। মাঝপথেই ধরে ফেলল রানা ওর হাতটা। মোচড় খেয়ে পিঠে চলে এল বিলের হাত। খালি গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিয়ে কাউন্টারে নামিয়ে রাখল রানা। মদটুকু আগেই পড়ে গেছে মেঝেতে।

বয়স বেশি হলেও প্রচুর শক্তি রাখে বিল। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল সে। মোচড়ানো হাতটায় রানার চাপ বেড়ে গেল। হাতটা আর একটু উপরে ঠেলে ধরতেই পায়ের পাতার ওপর দাঁড়াতে হলো ওকে চাপ কমানোর জন্যে। বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'কি চাও তুমি? আমাকে মারবে? নাও, মেরে ফেলো, আমি কিচ্ছু বলব না।' আত্মসমর্পণ করল বিল সম্পূর্ণভাবে।

'না, মারব না তোমাকে। তোমার কাজ আছে। চলো।' ঠেলতে ঠেলতে বার রুমের পিছনের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে হাজির করল ওকে রানা। সিকি গ্লাস লবণ পানিতে গুলে পুরো এক গ্লাস লবণ-পানি বাধ্য করল গিলতে। প্রথম গ্লাসে কাজ হলো না। কিন্তু দ্বিতীয় গ্লাস খাওয়ার পর পরই গল্গল্ করে বমি শুরু হলো ওর।

বমি শেষ হতেই বিলের মাথাটা ঠেসে ধরল রানা কলের তলায়। মাথায় পানি লাগতেই আপত্তি জানাল বিল, 'কি করছ, ছেড়ে দাও আমাকে।'

কলের তলা থেকে টেনে এনে ওকে দেয়ালে সেঁটে ধরল রানা। 'মিশনে একটা মেয়ের বাচ্চা হবে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে মেয়েটা আজ দু'দিন হলো। তুমি সাহায্য না করলে নির্ঘাত মারা পড়বে ও। এখানে আর কোন ডাক্তার নেই।'

'অসম্ভব! পারব না আমি, ক্যাপ্টেন! মাফ চাই, এ কাজ আর আমি করব না।'

ওর গালে ঠাস করে পড়ল রানার চড়টা। ভেজা চুল থেকে পানির ছিটে পড়ল মেঝেতে।

'আমাকে দয়া করো, লুইস! এই অবস্থায় আমি পারব না।' রানাও জানে যে এই মাতাল অবস্থায় কারও পক্ষেই অপারেশন করা সম্ভব না। আরও দুটো চড় পড়ল বিলের গালে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে রানা বিলের হাবভাব।

'তুই শালা একটা হারামজাদা!' রুখে দাঁড়াল বিল। রেগে গেছে।

এটাই চাইছিল রানা। মনের জোর একত্র না করতে পারলে এই অবস্থায় কিছুই করতে পারবে না বিল।

'পারবে। হ্যাঁ, একমাত্র তুমিই পারবে মেয়েটার জীবন রক্ষা করতে। নিজের স্ত্রীকে সাহায্য করতে না পারার গ্লানি কিছুটা ঘুচবে আজ তোমার। নিজেকে শক্ত করো, বিল।' আবার বার রুমে ফিরে এল ওরা, ওখান থেকে বেরিয়ে চলল লবির দিকে।

'আমিও যাচ্ছি,' এগিয়ে এসে যোগ দিল সুফিয়া রানা আর বিলের সাথে।

হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল বিল। ধরে ফেলল ওকে রানা।

'তুমি গাড়ি চালাতে পারো?' সুফিয়াকে প্রশ্ন করল রানা।

'পারি।'

'ভাল।' গাড়ির চাবি বাড়িয়ে দিল সে সুফিয়ার দিকে। 'সোজা মিশনের দিকে নিয়ে চলো আমাদের। আমি ওর সাথে পেছনে বসছি।' ধাক্কা দিয়ে ওঠাল বিলকে পিছনের সীটে।

সুন্দর ভাবে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে মিশনের দিকে চলল সুফিয়া।

'আমাকে দিয়ে জোর করে এটা করিয়ো না, লুইস! সত্যিই আমি পারব না,' অনুনয় করে বলল বিল।

'সেটা দেখা যাবে।'

'তুমি জানো না আমার অবস্থা। মেয়েটা অপারেশন থিয়েটারেই মারা যাবে।' নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে ধরল বিল রানার সামনে। থরথর করে কাঁপছে হাত। 'তুমিই বলো, এটা সম্ভব?'

'তোমার বৌ যেমন করে মরেছিল। এও ঠিক তেমনি ভাবে মরবে। অপারেশন

থিয়েটারে তোমার হাতে যদি মারা পড়েও তবু যন্ত্রণা লাঘব হবে বেচারীর। ব্যথায় ও কেমন চিৎকার করছে তুমি জানো না।'

'জানি।' দুঃখের হাসি হাসল বিল। 'ফ্রিডাও চিৎকার করেছিল, নিজের কানে শুনেছি আমি; কিন্তু বুঝিনি, বোধ শক্তি ছিল না আমার।' হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলেছে বিল। ওর আর ভাল লাগছে না। একা থাকতে চায় ও। বেরিয়ে যেতে চায়। জামার পিছন দিক ধরে টেনে ওকে আবার সীটে বসিয়ে দিল রানা। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বিল। পুরানো স্মৃতি ভীষণভাবে পীড়িত করছে ওকে।

খুব জোরে ছুটে চলেছে ফোর্ড-ক্রাইসলারটা। গাড়ির হেডলাইট গাঢ় অন্ধকার চিরে সামনের রাস্তা আলোকিত করছে। বাতাসের আঘাতে গাড়ির জানালায় একটানা একটা শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে। ভালই চালায় সুফিয়া, ভাবল রানা। বিল এখনও দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। দূরে মিশনের লাইট দেখা গেল। গাড়ির গতি একটু কমাল সুফিয়া।

গাড়িটা থামল একেবারে সিঁড়ি ঘেঁসে। একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এলেন ফাদার নেভিল।

বিলকে টেনে নামাল রানা। 'এই আপনার ডাক্তার,' পরিচয় দিল রানা।

লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরে বিলের মুখটা ভাল করে দেখলেন ফাদার। 'ডাক্তার কি অসুস্থ?' বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'না, মাতাল,' জবাব দিল রানা।

'তাহলে অপারেশন করবেন কিভাবে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ফাদার।

'উপায় নেই, ফাদার, একে দিয়েই কাজ করাতে হবে আমাদের।' অপারেশন থিয়েটারে পৌঁছল ওরা।

'সুফিয়া, তুমি আর ফাদার নেভিল মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসো।' জবাব না দিয়ে চলে গেল দু'জনেই।

'ক্যাপ্টেন, কসম খোদার, পারব না আমি!' বলল বিল।

'তাহলে মেয়েটা মারা যাবে। তুমি তো সবই জানো। শেষ একটা চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে।'

'একটু মদ খেতে হবে আমাকে,' জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল বিল, 'মনে হচ্ছে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে শুকিয়ে গেছে। একটু মদ আমাকে খেতেই হবে।'

'পরে।' জবাব দিল রানা। 'কাজ শেষ করে নাও, পুরো এক কেস দেব আমি তোমাকে।'

'কিন্তু আমার যে এখন দরকার!' অনুনয় করে বলল বিল।

'না, এক ফোঁটা মদও পাবে না তুমি এই মুহূর্তে!' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা, 'অপারেশনের জন্যে তোমার যা যা দরকার সব ঠিক আছে কিনা দেখে নাও।'

যা যা দরকার আগেই সব একসাথে জড় করে ট্রেতে সাজিয়ে রেখেছিলেন

ফাদার। এক নজর দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এতেই কাজ চলবে; কিন্তু আমার একটা ড্রিঙ্ক চাই।'

'চুপ করো, ওই যে বেসিন। কাজের জন্যে তৈরি হও। মেয়েটাকে ওরা এখনই নিয়ে আসবে।'

বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল বিল। ওর পা এখন আর টলছে না দেখে একটু আশান্বিত হলো রানা। হয়তো বা বেঁচেও যেতে পারে মেয়েটা। 'ক্যাপ্টেন,' বেসিনে হাত ধুতে ধুতে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'সবই ঠিক আছে, কিন্তু যথেষ্ট আলো নেই এখানে।'

'ঠিক আছে, আলোর ব্যবস্থা আমি করছি। যা করার তাড়াতাড়ি করো, সারা রাত এখানে বসে থাকলে চলবে না আমাদের।' বেরিয়ে গেল রানা। প্যাসেজটা পার হয়ে ওয়ার্ডে এল সে। সুফিয়া আর ফাদার নেভিল মেয়েটাকে ট্রলিতে উঠিয়েছে।

'ফাদার, আরও আলোর দরকার থিয়েটারে,' বলল রানা।

'আর একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন হয়তো সারাই করে দেয়া যেতে পারে, এর বেশি আর সম্ভব না,' চিন্তিত ভাবে বললেন ফাদার।

'মনে হয় তাতেই চলবে। না চললেও ওতেই চালাতে হবে। একটু জলদি ব্যবস্থা করুন।'

ফাদার চলে গেলেন লণ্ঠন আনতে। সুফিয়া আর রানা ট্রলিটা ঠেলে নিয়ে চলল অপারেশন থিয়েটারের দিকে। ট্রলির উপর মেয়েটা ছটফট করছে ব্যথায়। শরীরটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখের চামড়া কেমন যেন মোমের মত হয়ে গেছে। খুব বেশি ভয় পেলে কিংবা মরার আগে মানুষের মুখ অমন বিবর্ণ হয়ে যায়।

অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে দেখা গেল বিল এখনও ওয়াশ বেসিনের ওখানেই দাঁড়িয়ে। জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছে সে। গেঞ্জি পরা অবস্থায় দু'হাতে চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে নেশা কাটানোর চেষ্টা করছে। ক্যাপ্টেনের সম্মান রাখবে সে, স্থির করেছে।

'ফাদার আর একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন আনতে গেছেন। চলবে?' রানার প্রশ্নে ফিরে তাকাল বিল। ওরা কখন ঘরে ঢুকেছে মেয়েটাকে নিয়ে টেরও পায়নি ও।

'চলবে। অপারেশন টেবিলে শোয়াও। আমি তৈরি হয়ে আসছি।' হাতের কনুই পর্যন্ত সাবান দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছে বিল।

ট্রলিটা ঠিক অপারেটিং টেবিলের সমান উঁচু। দু'জনে মিলে নিচের চাদরের চারকোনা ধরে সহজেই মেয়েটাকে অপারেটিং টেবিলে স্থানান্তরিত করল।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে হাত দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে মেয়েটাকে পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এসে অপারেটিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল বিল। বড় করে একটা শ্বাস নিল সে। কেমন যেন দম আটকে আসছে তার। অনেক দিন পর আজ আবার দাঁড়িয়েছে সে অপারেটিং টেবিলের কাছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মেয়েটা তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না কাউকে।

চাদরটা সরাল বিল। ছোট সাদা একটা জামা মেয়েটার গায়ে। উন্মুক্ত উঁচু পেটটার উপর নাভির গর্ত দেখা যাচ্ছে। লেবারের ব্যথায় আবার কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বের হলো। ষোলো কি সতেরো হবে বয়স।

'জলদি, বিল! আমি ডাক্তার নই, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, হাতে আমাদের বেশি সময় নেই।'

উবু হয়ে ঝুঁকে পরীক্ষা করল বিল। পেটের উপর নানা ভাবে হাতড়ে বাচ্চার অবস্থানটা ভাল করে বুঝে নিয়ে সোজা হলো। চোখ বুজে কিছু ভাবছে বিল? নাকি নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করছে? কিছু বলল না রানা। ওকে মনে মনে প্রস্তুতি নেয়ার সময় দিল।

বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ফাদার নেভিল। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঘরে উত্তেজনাময় একটা থমথমে ভাব টের পেয়ে চুপ করে গেলেন।

চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে বিল। ধীরে ধীরে চোখ খুলল। 'সিজেরিয়ান,' কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে চুপ করে রইল সে, তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'এ ছাড়া উপায় নেই। তোমাদের সাহায্যের দরকার পড়বে আমার। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।' হাত দুটো একটু উঁচু করে চোখের সামনে ধরল বিল। নাহ্, একটুও কাঁপছে না। একদম স্থির। খুশি হলো বিল। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে তার। চোখে মুখে পানির ঝাপটায় কাজ হয়েছে।

দেয়াল আলমারি থেকে হালকা নীল রঙের অ্যাপ্রন আর রবারের গ্লাভস বের করে আনলেন ফাদার। হাত ধুয়ে মুখে থিয়েটার মাস্ক লাগিয়ে অ্যাপ্রন আর গ্লাভস পরে নিল সবাই।

'ওই ট্রেটা নিয়ে এসো।' ফাদারের পিছনে দাঁড়ানো আর্দালীকে নির্দেশ দিল বিল। লম্বা চিমটের মত ফোরসেপ দিয়ে একটা একটা করে যন্ত্র স্টেরিলাইজারের ধূমায়িত বাক্স থেকে বের করে ট্রেতে সাজাল সে। ততক্ষণে আর্দালী স্পিরিটে তুলো ভিজিয়ে মেয়েটার পেট জীবাণুমুক্ত করতে লেগে গেছে।

সিরিঞ্জে পেন্টোথাল ভরে নিয়ে লাইটের দিকে উঁচিয়ে ধরল বিল। অদ্ভুত লাগছে দেখতে, সিরিঞ্জ হাতে অ্যাপ্রন আর মাস্ক পরা বিলকে লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম ফিঞ্চ বলে চেনাই যায় না। কয়েক ফোঁটা হালকা রঙের পেন্টোথাল সুচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। এগিয়ে এসে মেয়েটার নিকষ কালো বাম হাতে স্পিরিট দিয়ে মুছে নিয়ে সুঁই ফোটাল বিল। ভেইনটা খুঁজে পেতেই রক্তের লাল আভাস দেখা গেল সিরিঞ্জের মাথায়। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল সবটা ওষুধ।

মেয়েটার মুখ থেকে যন্ত্রণার চিহ্নগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। ধীরভাবে লম্বা শ্বাস নিচ্ছে সে এখন।

'রেডি?' রানার দিকে চাইল বিল। চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না ওর।

'রেডি,' জবাব দিল রানা।

'এখানে এসো,' সুফিয়াকে কাছে ডাকল বিল। ড্রেসিং গজে কিছুটা ক্লোরোফর্ম ঢেলে সুফিয়ার হাতে দিল সে। 'আমি যখন বলব তখন এটা ওর নাকে চেপে ধরবে তুমি। ঠিক আছে?' মাথা কাত করে সুফিয়া জানাল সে বুঝেছে কি করতে হবে।

বিলের নির্দেশ অনুযায়ী একে একে যন্ত্রগুলো এগিয়ে দিতে থাকল রানা। ক্লোরোফর্ম ধরল সুফিয়া মেয়েটার নাকে।

স্ক্যালপেলের টানে ফাঁক হয়ে গেল পেট। প্রথমে পরিষ্কার সাদা দেখা গেল। পরমুহূর্তেই লাল হয়ে গেল রক্তে। ছোট ছোট শিরা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। গোলাপী রঙের মাংস আর মাখনের মত চর্বি দেখা যাচ্ছে।

বিলের হলুদ রবারের গ্লাভস পরা হাত দুটো দ্রুত কাজ করে চলেছে। অবাক চোখে দেখছে রানা। কখনও কাটছে, কখনও ক্ল্যাম্প লাগাচ্ছে, আবার কখনও বাঁধছে। রঙের জন্যেই ব্যস্ত হাত দুটোকে মানুষের হাত বলে মনে হচ্ছে না। ছুরির টানে ফাঁক হয়ে গেল জরায়ুর থলিটা। কুঁকড়ে রয়েছে বাচ্চটা একটা বলের মত। ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা, মাথাটা সেই তুলনায় অনেক বড়। পা ধরে উঠিয়ে আনল বিল বাচ্চাটাকে। কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটতেই কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। নাড়ি বেঁধে সুফিয়ার হাতে বাচ্চা ধরিয়ে দিয়ে আবার মেয়েটার দিকে মনোযোগ দিল বিল। একটা একটা করে পরতের পর পরত যত্নের সাথে নিপুণ হাতে সেলাই করছে সে। সাদা টেপ দিয়ে পেটের ক্ষতটা আটকে দিয়ে চাদর টেনে মেয়েটার বুক পর্যন্ত ঢেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ফাদার নেভিল এগিয়ে এসে বিলের হাত চেপে ধরলেন। আবেগে কাঁপছেন তিনি। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'দু'দুটো জীবন রক্ষা করার জন্যে আমি তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর্শীবাদ করছি, বাছা, তোমার মঙ্গল হোক, সব দুঃখ দূর হোক।' সুফিয়া ওদিকে বাচ্চাটাকে একটা নরম সাদা শালে জড়িয়ে নিয়ে আদর করতে ব্যস্ত।

'ক্যাপ্টেন লুইসকে ধন্যবাদ জানান, ফাদার। ও সাহস না যোগালে আমি কিছুতেই এতদিন পরে এই অপারেশন করতে পারতাম না।'

'কি সুন্দর বাচ্চা!' সুফিয়া সমর্থন চাইল রানার।

'হ্যাঁ। ছেলে না মেয়ে?' প্রশ্ন করল রানা।

'ছেলে।' অকারণেই হেসে চলে গেল সুফিয়া ওয়ার্ডে বাচ্চার বিছানায় ওকে শোয়াতে।

অপূর্ব সুন্দর ওর চোখ দুটো, ভাবল রানা। ওদিকে ফাদার আর বিল লেগে গেছে ধোয়ামোছায়। ক্লান্তি, অনেক ক্লান্তি! করিডরে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল

রানা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ির কাছে চলে এল সে। কাছেই কোন ডোবা থেকে একটানা ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। কেন কে জানে, বাংলাদেশের কথা বারবার মনে পড়ছে রানার। গিল্‌টি মিয়া এখন কি করছে? ভাবার চেষ্টা করল রানা। গিল্‌টি মিয়ার নিষ্পাপ দুটো চোখ, বেঁটে খাটো হালকা শরীর পরিষ্কার ভেসে উঠল চোখের সামনে। একটু হাসল রানা—একটা লোক বটে! লোক না, একটা চরিত্র।

রানাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে গাড়ির কাছে এসে হাজির হলো সুফিয়া। 'একা একা হাসছ যে? কি ব্যাপার? আমি ওদিকে তোমাকে খুঁজে হয়রান!' রানার পাশে এসে দাঁড়াল সুফিয়া।

'হঠাৎ একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল, তাই হাসছিলাম।' চাঁদের আলোয় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে সুফিয়াকে। ওর গাল টিপে চিবুকটা একটু নেড়ে দেবার অদম্য ইচ্ছা অনেক কষ্টে দমন করল রানা।

'চলো, সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।' হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সুফিয়া রানাকে। বিল আর ফাদার নেভিল কি যেন গোপন আলাপে মগ্ন ছিল, ওদের আসতে দেখে চুপ করে গেল।

'এই যে, ধরে নিয়ে এসেছি,' চপল কণ্ঠে বলল সুফিয়া। সব কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছে সুফিয়া। আজ সকালেও জানত, বাঁচার কোন উপায় নেই। তারপর এল রিলিফ ট্রেন, পরিচয় হলো ক্যাপ্টেন লুইসের সাথে। এরপর নানান ঘটনা ঘটেছে, এখনও ঘটছে। প্রত্যেকটি ঘটনা নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করছে; পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করছে সুফিয়া।

'জানো, পুরো আট পাউণ্ড ওজন বাচ্চাটার!' একটু গর্বের সাথেই ঘোষণা করল বিল, যেন ওজনের ব্যাপারেও কৃতিত্বটা ওরই।

'চলো, এবার ফেরা যাক,' ঘড়ি দেখল রানা। এগারোটা বাজে। 'তোমার তো এক কেস হুইস্কি পাওনা রয়েছে। হোটেলে ফিরে প্রাণ ভরে যত খুশি খাও, কেউ আপত্তি করবে না আর।'

হো হো করে হেসে উঠল বিল। 'পরে এক সময়ে খাওয়া যাবে। আজ রাতে আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নিও। এখন এক ফোঁটা মদ স্পর্শ করতে পারব না আমি। ওর জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। তোমরা ফিরে যাও হোটেলে। ফাদারের সাথে মিশনেই কাটাতে হবে আমাকে আজকের রাতটা। তোমরা বরং সকালে এসে আমাকে তুলে নিয়ো।' একটু অবাক হলো রানা। মিশনে আসার পরই কেমন যেন বদলে গেছে বিল। সেই রুক্ষ ভাবটা আর নেই ওর মধ্যে। হাসছে প্রাণখোলা হাসি।

'ঠিক আছে। কাল ভোরে রেডি থেকো, খুব সকালে রওনা হতে চাই আমি,' বলল রানা।

'সারারাত জেগে কাটবে আমার, সকালে রেডিই পাবে তুমি আমাকে।'

'চলো, এবার ফেরা যাক,' সুফিয়াকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগুল রানা। পাশের ডোবাটা থেকে নানান স্কেলে ডাকছে ব্যাঙের দল। আকাশটা পরিষ্কার। চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার এখনও কয়েকদিন বাকি, তাই চাঁদটা এখনও অনেক নিচে।

পাশাপাশি চলছে ওরা। হঠাৎ সুফিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল রানাকে। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সাড়া দিল রানা। মেয়েদের ঠোঁট এত নরমও হয়!

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সুফিয়া রানাকে। এতক্ষণ চোখ বুজে চুমো খাচ্ছিল সে। হঠাৎ চোখ খুলে ফাদার নেভিলকে বারান্দায় দেখেই তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে। ওদের বিদায় নিয়ে আসার পর এতক্ষণও গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আওয়াজ না পেয়ে কি হলো দেখতে এসেছিলেন ফাদার। মুচকি হেসে ঝট করে ঘুরে আবার ওয়ার্ডে ফিরে গেলেন।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল রানা।

'কিছু না।' নিজের মনকেই ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না সুফিয়া। কেমন যেন একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে লোকটার। প্রথম দেখা থেকেই বারবার ওকে একান্ত নিজের করে পেতে ইচ্ছে করছে ওর।

'হঠাৎ চুমো খেলে যে?' জানতে চাইল রানা।

'পুরস্কার।'

'কিসের জন্যে?'

'মস্ত বড় মনের জন্যে। মানবতার জন্যে।'

'ধন্যবাদ।' হাসল রানা।

গাড়ি ছুটে চলেছে হোটেলের দিকে। দু'জনেই চুপ। সুফিয়াই প্রথম নীরবতা ভাঙল।

'তোমাকে বোধহয় ভালবেসে ফেলছি আমি।'

'খবরদার!' আঁৎকে উঠল রানা, 'ভুলেও এ ভুল কোরো না?'

'কেন?'

'চোট পাবে। অস্থির, উড়ো মন আমার, বাঁধন আমার জন্যে নয়,' রাস্তার ওপর চোখ রেখে বলল রানা।

'জড়িয়ে পড়ার ভয়েই বুঝি আমার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করোনি?'

'কি প্রশ্ন?'

'যেমন কে আমি, এখানে কেন, ইত্যাদি সম্পর্কে কোন কৌতূহলই জাগেনি তোমার মনে?'

'জেগেছে। কিন্তু সময় বা সুযোগ পেয়েছি কিছু জিজ্ঞেস করবার? একে তো ব্যস্ততা, তার ওপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই তো জান শেষ।'

'বড় বেশি কথা বলি আমি, তাই না?'

'মানুষকে দিয়ে বলাতেও পারো।'

হাসল সুফিয়া।

'খামোকা ভয় পাচ্ছ তুমি, লুইস। চোট পাব না আমি। কাকে বাঁধা যায়, আর কাকে যায় না; এটুকু বোঝার মত বয়স হয়েছে আমার।'

'কত...পঁয়ষট্টি, না পঁচাত্তর?'

'পঁচিশ। যথেষ্ট বয়েস।'

'দেখলে আরও ছোট মনে হয় তোমাকে।'

আবার হাসল সুফিয়া। 'বুঝলাম, মুড নেই তোমার। অন্যদিকে সরিয়ে দিতে চাইছ আলাপ, বাজে কথায় ভুলিয়ে রাখতে চাইছ আমাকে। বেশ, এই চুপ করলাম আমি।'

হোটেলের লাইট দেখা যাচ্ছে। এসে পড়েছে ওরা। গাড়ি থেকে নেমেই এক ছুটে দোতলায় চলে গেল সুফিয়া।

ব্রুস লেভীর কাছে জানা গেল সবার ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়েছে। কোথাও কোন অসুবিধে নেই।

ফ্রেডের কথা জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'আরও গোলমাল করার চেষ্টা করেছিল লোকটা। তেতালায় মেয়েদের ওখানে যাবার চেষ্টা করেছিল আপনারা চলে যাওয়ার পর।'

'তারপর?'

'আপনার সার্জেন্ট মেজর, ওই যে বিরাট লোকটা, সে এসে ধরে নিয়ে গেছে ওকে টেনে।'

'যাক, বাঁচা গেছে।'

'আপনার শোবার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে রেখেছি, ক্যাপ্টেন,' হাত বাড়িয়ে একটা চামড়া মোড়া আর্ম চেয়ার দেখালেন বৃদ্ধ। 'নিশ্চয়ই খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আপনি। শুয়ে পড়ুন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা বৃদ্ধের সহানুভূতিতে। 'আসছি আমি, একপাক ঘুরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা চেক করে নিই আগে।'

দশ

সুফিয়ার ডাকে ঘুম ভাঙল রানার। সোফার হাতলে বসে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেছে সে এত ভোরে ঘুমন্ত মানুষটাকে জাগানো ঠিক হবে কিনা। লক্ষ করেছে, ঘুমালে ঠিক শিশুর মত নিষ্পাপ দেখায় ক্যাপ্টেনকে। সাত-পাঁচ ভেবে কফি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে দেখে শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙিয়েছে সে ওর। 'বাপরে বাপ, এমন ঘুমও

মানুষে ঘুমায়!' হাসতে হাসতে কফির কাপটা এগিয়ে দিয়েছে রানার দিকে।

কালকের ওই দৌড় ঝাঁপের পর ঘুমটা একটু গভীরই হয়েছিল রানার। জামা-কাপড়ও ছাড়েনি। হেলমেট আর রাইফেলটা পাশে মেঝের ওপর রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বেঘোরে।

ঘড়ি দেখল রানা। ছয়টা বাজে। 'সর্বনাশ! আরও আগে জাগাওনি কেন আমাকে?' কফিতে চুমুক দিল সে। ঘুমের রেশটা কেটে গেল মুহূর্তে।

'খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল...তাই,' বলল সুফিয়া।

'লেভী বুড়ো কোথায়? উঠে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, ওঁকেই আগে জাগিয়েছি। লোকজন সবাইকে নিয়ে স্টেশনে চলে গেছেন।'

গালে হাত দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলোর ধার পরীক্ষা করল রানা।

'জলদি মুখ-হাত ধুয়ে বাথরুম সেরে নাও। নাস্তা প্রায় রেডি।' তাড়া দিল সুফিয়া।

উঠে পড়ল রানা। গোসল করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সময় নেই। হাত-মুখ ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে মোটামুটি ঝরঝরে হয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। বেরিয়েই শুনল তর্ক হচ্ছে ভাই-বোনে—পরিষ্কার বাংলা ভাষায়।

'তুই খেয়ে নে-না, ছোঁড়া!'

'না, ক্যাপ্টেন আসুক। একসাথে খাব।'

'ওর সাথে তোর কি? তুই ছেলেমানুষ, খেয়ে নিবি চটপট...'

'উঁহুঁ!'

'কে হয় লোকটা তোর? কয়দিনের পরিচয়? চিনিস ওকে?'

'চিনি না, কিন্তু জানি,' সাফ জবাব দিল জামিল। 'খুব ভাল মানুষ।'

এরকম অকপট সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি হয়ে গেল রানার মনটা। নাস্তা খেতে খেতেই কণ্ঠনালীর পাশের নার্ভ সেন্টারটা চিনিয়ে দিল সে জামিলকে, ওখানে কিভাবে টিপে ধরতে হয় শিখিয়ে দিল।

'কেনা গোলাম বানিয়ে ফেলছ তুমি ওকে,' অনুযোগ করল সুফিয়া। 'এতদিন শুনেছি বড় হলে ফাদার নেভিলের মত পাদ্রী হবে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বলছে—না, মিলিটারি ক্যাপ্টেন হবে।'

হাসল রানা।

দরজায় এসে দাঁড়াল বিগ জো। 'গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন।'

'গুড মর্নিং। ওদিকের খবর কি? সব ঠিকঠাক?'

'ইয়েস, বস্। সিভিলিয়ানরা উঠে পড়েছে ট্রেনে।'

'মিশনের জন্যে আমাদের সারপ্লাস সাপ্লাই...'

'তুলে দিয়েছি ক্রাইসলারের পেছনে।'

'ভেরি গুড। তোমার লোকজন সব জড়ো করে খেদিয়ে নিয়ে যাও স্টেশনের দিকে। এঞ্জিন ড্রাইভারকে বলবে, স্টীম তুলে যেন পুরোপুরি রেডি হয়ে থাকে। আমি আধঘণ্টার মধ্যে মিশন থেকে বিলকে নিয়ে ফিরে আসছি। ফেরার সাথে সাথেই রওনা হতে চাই আমি।'

'ওকে, বস্।'

নিজের হ্যাভারস্যাক দেখাল রানা জো-কে। 'এটা সাথে নিতে অসুবিধে হবে তোমার?'

'কোন অসুবিধে নেই, ক্যাপ্টেন।' রানার হ্যাভারস্যাকটা পিঠে তুলে নিল সে।

'থ্যাঙ্কিউ।...একটু দাঁড়াও, জো, তোমার সাথে এরা দু'জনও যাবে।'

'আমরা তোমার সাথে যাচ্ছি, লুইস,' বলল সুফিয়া।

'কেন?'

'নতুন বাচ্চাকে দেখব একটু। আর ও যেতে চাইছে ফাদার নেভিলের কাছ থেকে বিদায় নিতে। আর তো কোনদিন দেখা হবে না, তাই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। তুমি রওনা হয়ে যাও, জো। ফিরে এসে সব যেন রেডি পাই। হাতে আমাদের সময় বেশি নেই।' উঠে দাঁড়াল, 'চলো বেরিয়ে পড়ি।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। সুফিয়া আর জামিল পাশাপাশি বসেছে সামনের সীটেই। রওনা হয়ে গেল ওরা।

'তুমি এখানে ফাঁসলে কি করে?' কথা তুলল রানা।

'সে অনেক কথা। একটা চাকরি করতাম। খুব ঘোরাঘুরির চাকরি। প্রায়ই আসতে হত আফ্রিকায়, বিশেষ করে এলিজাবেথভিল আর আশেপাশের এলাকায়। বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছেন প্লেন ক্র্যাশে। সুবিধে হবে মনে করে জামিলকে ভর্তি করে দিয়েছিলাম ফাদার নেভিলের মিশন স্কুলে। ওখানেই থাকত বোর্ডিঙে। যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল স্কুল। আমি তখন এলিজাবেথভিলে কাজ করছি। অবস্থা বেগতিক দেখে ভাবলাম ওকে ফেরত নিয়ে যাব লণ্ডনে। কিন্তু এখানে এসেই আটকে গেলাম।'

'যেখানে চাকরি করতে, তাদেরকে জানাওনি তোমার অবস্থার কথা?'

'জানিয়েছিলাম।' মুখটা কালো হয়ে গেল সুফিয়ার, 'দে ডিড নট কেয়ার।'

'নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে এই তিনটে মাস?'

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কতটা! অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা এক কথা, করবার কিছু রয়েছে তোমার। আমাদের এখানে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করা ছাড়া কাজ ছিল না।'

মিশনে পৌঁছে একবার হর্ন বাজাল রানা। বারান্দার সামনে গাড়িটা পার্ক

করতেই জামিল নেমে ছুটল ফাদার নেভিলের খোঁজে। এখানকার সব কিছুই ওর অতি পরিচিত।

ওয়ার্ডে পৌঁছে ওরা দেখল, বাচ্চার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে জামিল, পাশেই ফাদার নেভিল আর বিল দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

'গুড মর্নিং, ফাদার,' বলল রানা।

'গুড মর্নিং, মাই সান!'

'ফাদার, সামান্য যা কিছু আনতে পেরেছি গাড়ির বুটে রয়েছে; কাউকে পাঠিয়ে নামাবার ব্যবস্থা করুন। হাতে সময় নেই।'

আর্দালীকে পাঠালেন ফাদার ওগুলো নামাতে।

সামরিক পোশাক ছেড়ে ফাদারের কাছ থেকে অন্য পোশাক চেয়ে নিয়ে পরেছে বিল।

'বেশ মানিয়েছে, ডক্টর,' মন্তব্য করল সুফিয়া।

'ধন্যবাদ।' বিনীত হাসি হাসল বিল। ওই সম্বোধনে অনেকদিন কেউ ডাকেনি ওকে। ডাকটা ওর কানে সুধা বর্ষণ করল।

'ওরা কেমন আছে?' প্রশ্ন করল সুফিয়া।

'দুজনেই সুস্থ। ঈশ্বরের কৃপায় দুর্যোগ কেটে গেছে।' ভায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সুফিয়া। 'কি সুন্দর না বাচ্চাটা?' জামিলের উদ্দেশে বলল সে।

'সত্যি!' জবাব দিল জামিল।

'একটু কোলে নিয়ে আদর করি ওকে?' বিলের অনুমতি চাইল সুফিয়া।

'কিন্তু, ও যে ঘুমাচ্ছে!' আপত্তি জানাল বিল।

'আমরা তো চলেই যাচ্ছি, জীবনে আর কোনদিন হয়তো দেখা হবে না, ওকে একটু আদর না করে যেতে পারব না আমি।' অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই তুলে নিল সুফিয়া বাচ্চাটাকে খাট থেকে। বাচ্চার গালে চুমো খেতেই নিজের অজান্তে আড়মোড়া ভেঙে সুফিয়ার নাক খামচে দিল সদ্যজাত শিশু।

'ঠিক হয়েছে, যেমন ওর ঘুম ভাঙিয়েছ, খামচি দিয়ে দিয়েছে ও!' বলে উঠল জামিল। সবাই হেসে উঠল ওর কথায়।

'বিল, জলদি পোশাক পরে নাও, রওনা হতে হবে আমাদের,' বলল রানা।

রানার চোখের দিকে চাইতে পারল না বিল। গলায় ঝুলানো স্টেথোসকোপটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'আমি যাব না, লুইস।'

অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'কি বললে?'

'কাল রাতে অনেক ভেবেছি আমি, লুইস। স্থির করেছি, এখানেই থেকে যাব ফাদার নেভিলের সাথে!'

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আর্মি থেকে পালালে কি শাস্তি হয় আপনি

জানেন না?' বোঝাবার চেষ্টা করল সুফিয়া।

'জানি। এতদিন যুদ্ধ করেছি। কিন্তু কিসের সাথে আমার যুদ্ধ, সেটা নিজেই ভাল করে বুঝিনি।' সুফিয়ার কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিল বিল। 'এখানে প্রচুর কাজ রয়েছে।' হাত তুলে রোগীদের দেখিয়ে বলল সে, 'একজন ডাক্তারের খুবই প্রয়োজন। গত রাতে জীবনে প্রথমবারের মত উপলব্ধি করেছি, আমার প্রয়োজন আছে, আমাকে ছাড়া এদের চলবে না। এদের ফেলে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।'

রানার দিকে ফিরল সুফিয়া। 'ওকে বোঝাও, লুইস। মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। এই জঙ্গলে ও নিজেকে…'

'না,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। 'আমার মনে হয় ও ঠিকই করছে; কেন মিছে ভুল বোঝাতে যাব?' ফিরল বিলের দিকে, 'ঠিক আছে, যখন মনস্থির করতে পেরেছ, থেকে যাও।' গাড়ি বারান্দার দিকে রওনা হলো রানা।

'চলো, তোমাদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই।' রানার পাশে পাশে এল বিল গাড়ি পর্যন্ত। ড্রাইভিং সীটে বসে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। দু'হাতে রানার হাতটা চেপে ধরে হ্যাণ্ডশেক করল বিল, 'আমাকে ভুল না বোঝার জন্যে ধন্যবাদ।'

'ভেবো না তুমি, নিশ্চিন্ত মনে কাটা-ছেঁড়া চালিয়ে যাও। ইউনিফর্মটা নদীতে ফেলে দিয়ো। তোমার সম্পর্কে "মিসিং, বিলিভ্‌ড্ কিল্‌ড্" রিপোর্ট করব আমি।'

'বলা কি যায়, হয়তো আবার দেখা হবে।' রানার হাতটা ছেড়ে দিল বিল। ফাদার নেভিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। ওরাও বিদায় জানাল। মিশনটাকে পেছনে ফেলে ছুটে চলল ফোর্ড ক্রাইসলার স্টেশনের দিকে। আয়নায় দেখল রানা, এখনও চেয়ে আছে বিল গাড়িটার দিকে। আর একবার হাত নেড়ে শেষ বারের মত বিদায় জানিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকল।

'আমি ভাবতেই পারিনি, মানুষ এত গুরুতর ব্যাপারে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে!' মন্তব্য করল সুফিয়া।

'সত্যিই,' বলল রানা।

'ভাবছি, শোনা মাত্র আরেকজন সেটাকে অনুমোদনই বা করে কি করে!'

'তোমার ধারণা, ভুল হলো ওর থেকে যাওয়া?'

'না। ভুল হয়নি ওর। তোমারও না। তোমাদের দু'জনের তুলনায় নিতান্তই অপরিণত মনে হচ্ছে নিজেকে।'

'ও কিছু না,' মৃদু হেসে বলল রানা, 'ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা থাকলে তুমিও চট করে অনুমোদন করতে পারতে। বড়ই কষ্টে ছিল বেচারা, এতদিনে খুঁজে পেয়েছে শান্তি।'

দুটো সিগারেট ধরিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সুফিয়া। সামনেই বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে অসমতল পথ। গাড়ির গতি কমাল রানা। বড় রাস্তায় ওঠার আগে

স্বভাবতই চেক করে নিল রানা। ডান দিক ক্লিয়ার, কিন্তু বামদিকে চেয়েই ধক্ করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। মাত্র একশো গজ দূরে ছয়টা লরির একটা কনভয় দাঁড়িয়ে রয়েছে জঙ্গলটার ধারে।

'কি হলো?' রানাকে চমকে উঠতে দেখে প্রশ্ন করল সুফিয়া।

'ওই দেখো!' একসেলারেটার পুরো টিপে দিয়েছে রানা। বনের দিকে চেয়েই বিস্ফারিত হয়ে গেল সুফিয়ার চোখ। প্রথম পাঁচটা লরি ভারী ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। বাকিটা একটা পেট্রল ট্যাঙ্কার। উজ্জ্বল হলুদ আর লাল রং করা গাড়িটার ট্যাঙ্কে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে শেল কোম্পানীর নাম। প্রথম লরির পিছনে বাঁধা রয়েছে একটা রবারের চাকা লাগানো পঁচিশ পাউণ্ডার অ্যানটি-ট্যাঙ্ক কামান। আকাশের দিকে মুখ—যেন দোষারোপের তর্জনী।

ষাট-সত্তর জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার উপর। বেশির ভাগই প্রস্রাব করছে জঙ্গলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। সবার কাঁধেই স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। বিভিন্ন ধরনের ইউনিফরম আর হেলমেট পরা জগাখিচুড়ি আর্মি।

'জেনারেল ফ্রস্ট!' নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল সুফিয়ার। 'এসে গেছে ওরা!'

'শিগগির নিচু হয়ে ফ্লোরে বসো।' চাকার আওয়াজ তুলে স্কিড্ করছে গাড়িটা বাঁকের মুখে। সামলে নিয়ে একরকম ঠেলেই বসিয়ে দিল রানা ওদের দু'জনকে। আয়নায় লক্ষ করল, এঞ্জিনের শব্দে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ওদের মাঝে। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে লোকগুলো। ওদের চিৎকারের কিছু কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে দ্রুত ধাবমান ক্রাইসলারের এঞ্জিনের গুঞ্জন ছাপিয়ে। আরও একশো গজ দূরে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে আবার। ওই পর্যন্ত পৌঁছে বাঁক নিতে পারলেই আড়াল পেয়ে যাবে ওরা। দ্রুত এগিয়ে আসছে বাঁকটা ওদের দিকে। জামিল মাথা তুলে কি হচ্ছে দেখতে যাচ্ছিল, সুফিয়ার হেঁচকা টানে আবার ঘাড় গুঁজে বসল।

একসাথে গর্জে উঠল কয়েকটা মেশিনগান। গুলি বৃষ্টি হচ্ছে। গুলির আঘাতে ধুলো উড়ছে গাড়ির আশেপাশে, রাস্তায়। বাঁকের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। হঠাৎ কেঁপে উঠল গাড়িটা। এক ঝাঁক গুলি এসে লেগেছে পিছন থেকে। মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল সব। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। গুলির আঘাতে ফেটে চৌচির হয়ে সাদা তাল মিছরির রূপ নিয়েছে উইণ্ডস্ক্রীনটা। ঘুসি মেরে ফুটো করে ফেলল ওটা রানা। সামনেটা দেখতে পাচ্ছে আবার। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িটা অদৃশ্য হয়েছে। কাঁচের মিহি গুঁড়ো পড়েছে সুফিয়ার চুলের উপর। সীট দু'জায়গায় ছিন্নভিন্ন হয়েছে, আঁতুড়ির মত ছোবাগুলো বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বাঁকের উপর চলে এসেছে গাড়িটা। ব্রেক কষে পাগলের মত স্টিয়ারিং ঘুরাল রানা। চাকার আর্তনাদ তুলে স্কিড করছে ওরা। আবার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাগে আনল সে গাড়িটাকে। অনেকগুলো গাছের আড়ালে চলে এসেছে ওরা। এখনকার মত বিপদ

কেটেছে।

'লেগেছে কারও?' এতক্ষণে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নেবার অবসর পেল রানা।

'না। তোমার লাগেনি তো?' পাল্টা প্রশ্ন করল সুফিয়া। উঠে বসল সীটে।

'হাতটা একটু কেটেছে। এমন কিছু না।'

'ও-ও-ওরা কি আমাদের ধাওয়া করে মারতে আসবে?' উত্তেজনায় তোতলাচ্ছে জামিল।

প্রবোধ দিতে গিয়েও হঠাৎ মত পাল্টে সত্যি কথাই বলল রানা, 'হ্যাঁ, ওরা আমাদের মারার চেষ্টা অবশ্যই করবে। আমাদের হাতে মিনিট পাঁচেক সময় আছে। ওই কামান টেনে আনতে গিয়ে ওরা খুব জোরে ট্রাক চালাতে পারবে না। ওদের পাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছব আমরা স্টেশনে। এইটুকু সময়ের মধ্যে যদি ট্রেন ছেড়ে সরে পড়তে পারি, তাহলে বেঁচে যাব।'

বড় বড় চোখ করে কথাগুলো গিলল জামিল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে। নিজের চোখেই দেখেছে খুন করার জন্যেই গুলি চালিয়েছিল ওরা। গুলিতে সে-ও মরতে পারত। এটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না—তাকে মেরে ওদের কি লাভ।

শহরের রাজপথে এসে উঠল কাইসলার। হর্ন টিপে ধরে বিপদসঙ্কেত দেয়ার চেষ্টা করছে রানা ট্রেনের ড্রাইভার কার্লসকে। গার্ড পোস্ট পার হবার সময়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল। না, কেউ নেই। ওর নির্দেশ মত সবাই ট্রেনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। অর্থাৎ জেনারেল ফ্রস্টকে ঠেকাবার। কেউ নেই। বিনা বাধায় গড়গড় করে সোজা চলে আসবে পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই।

আশি মাইল বেগে ছুটছে ক্রাইসলার। হর্ন বাজছে একটানা। প্রায় পৌঁছে গেছে। কেউ নেই রাস্তায়। হোটেলের সামনে দিয়ে চলছে এখন। এক পলক দেখে নিল রানা। সব মনে হচ্ছে জনশূন্য। সোজা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে ঘ্যাচ করে থামাল রানা গাড়িটাকে।

ট্রেনের পাশেই প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশির ভাগ লোক, জটলা পাকিয়ে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। শেষ বগির কাছে ব্রুস লেভী আর স্লোন হাইনসকে দেখতে পেল রানা, কয়েকজন মহিলার সাথে গল্প করছে। চিৎকার করে উঠল সে, 'জলদি উঠে পড়ুন সবাই! আসছে ওরা! এক্ষুণি ছেড়ে দেয়া হবে ট্রেন!'

অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে এক সেকেণ্ডও দেরি করলেন না ব্রুস নেভী। দুই হাত নেড়ে ঠেলে-ধাক্কিয়ে সবাইকে ট্রেনের কামরায় তুলছেন। আরও কিছুদূর এগিয়ে আবার গাড়ি থামিয়ে চিৎকার করে সবাইকে ট্রেনে ওঠার নির্দেশ দিল রানা, 'জলদি! জলদি! এসে পড়েছে ওরা!'

হুলুস্থুল পড়ে গেল সবার মধ্যে, ধাক্কাধাক্কি করছে কার আগে কে উঠবে তাই

নিয়ে।

গাড়ি নিয়ে একেবারে এঞ্জিনের পাশে গিয়ে থামল রানা। কার্লসের টাকটা দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি, কার্লস! এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট কোরো না! ট্রেন ছাড়ো! এসে পড়েছে জেনারেল ফ্রস্ট!'

ক্যাবের জানালা থেকে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল কার্লসের চকচকে টাক, অভ্যাস মত 'উই, মশিয়ে' বলতেও ভুলে গেছে সে।

ঝটাং করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল রানা। ওপাশ দিয়ে জামিলকে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছে সুফিয়া। তিনজন দৌড়াচ্ছে মাথা ঢাকা কামরার দিকে, এমনি সময়ে বিগ জো-র বিশাল চেহারা দেখা গেল খোলা বগিতে।

'কারা এসে পড়ল, বস্? বালুবা...?'

'না, সুফতা বাহিনী নিয়ে হারামজাদা ফ্রস্ট!' বলতে বলতে জামিলকে শূন্যে তুলে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। খপ করে ধরে ফেলল ওকে জো। 'গোলাগুলি হবে, সবাইকে তৈরি রাখো।' বলেই আবার ছুট দিল রানা সুফিয়ার হাত ধরে।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে তিনটে ধাপ উঠে গেল সুফিয়া রানার ধাক্কাতেই, কিন্তু ঠিক সেই সময় ট্রেনটা এমন জোরে ঝাঁকি খেল যে টাল সামলাতে না পেরে হাতল ছেড়ে হুড়মুড় করে পড়ল সে রানার ওপর। তৈরি ছিল না রানা, ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে জড়াজড়ি করে পড়ল দু'জন ধূলিময় প্ল্যাটফর্মে। চলতে শুরু করেছে ট্রেনটা। স্পীড বাড়ছে। পাশ দিয়ে খট-খটা-খট আওয়াজ তুলে চলে যাচ্ছে।

আছড়ে-পাছড়ে উঠে বসল রানা। শৈশবের দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ল: ওকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে ট্রেন; চিৎকার করছে, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না কেউ; দৌড়াচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। মাথা ঝাঁকিয়ে আতঙ্কটা দূর করার চেষ্টা করল রানা, টেনে তুলে দাঁড় করাল সুফিয়াকে।

'দৌড়াও!'

আশ্চর্য হারে বেড়ে যাচ্ছে ট্রেনের গতি। কোনমতে দ্বিতীয় কোচের হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল রানা একহাতে, টলমল পদক্ষেপে দৌড়াচ্ছে ট্রেনের পাশে পাশে, অপর হাতে জড়িয়ে ধরেছে সুফিয়ার কোমর। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই কোনমতে একটা পা তুলতে পারল রানা পাদানীতে।

ওপর থেকে নেমে এল একটা শক্ত সমর্থ হাত, খামচে ধরল সুফিয়ার কলারের পিছন দিকটা, টেনে তুলে নিল ওপরে। লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখতে পেল রানা দুই চোখ বুজে বিড়াল ছানার মত ঝুলছে সুফিয়া বিগ জো-র হাত থেকে। কোদাল সাইজের দাঁত বের করে হাসছে জো ওকে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে।

'এইখানে চুপচাপ বসে থাকো,' একটা বাক্সের দিকে আঙুল তুলে বলল রানা সুফিয়াকে, তারপর ফিরল জো-র দিকে। 'সবাই রেডি? ব্রেনগুলো তৈরি আছে তো? চলো, ছাদে চলো, একটা ফিল্ডগান রয়েছে ওদের। ট্রেনটা পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলেই পরিষ্কার দেখা যাবে শহর থেকে, কামান দাগতে পারে ব্যাটারা।'

পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠতেই দেখা গেল ওদের। ওরাও পরিষ্কার দেখতে পেল, শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একপাশে ঘুরে গেল প্রথম লরীটা, ঘুরেই থেমে দাঁড়াল। দশ-পনেরো জন লাফিয়ে নামল রাস্তায়, কামানটা ফেরাচ্ছে এই দিকে।

'ওরা যদি সত্যিই অ্যানটি-ট্যাঙ্ক কামান দাগতে জানে, খারাবী আছে বস্ আমাদের কপালে।' ব্রেনগানটার গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসল জো।

'ঠাস্!' রাইফেলের আওয়াজ পাওয়া গেল ট্রেনের শেষ কম্পার্টমেন্ট থেকে। ববই প্রথম গুলি করেছে। আরও কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠল আশপাশ থেকে, তারপরই শুরু হলো ব্রেনগানের গুলি বৃষ্টি। কামানের কাছে ভীড় দ্রুত কমে গেল। একজন চিৎ হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। কেবল স্টীল আর্মার্ড প্লেটের পিছনে যারা ছিল তারা রয়ে গেল। ওদের হেলমেটের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। ধুঁকতে ধুঁকতে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ট্রেন। কোনমতে পাহাড়টা পার হতে পারলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। রানা জানে, কার্লসের চেষ্টার ত্রুটি বা আন্তরিকতার অভাব নেই, তবু তাগাদা দিল সে ওয়াকিটকিতে। 'আরও জোরে, কার্লস, আরও জোরে!'

কামানের মাথায় একটু সাদা ধোঁয়া দেখা দিল। প্রথম গোলাটা ওদের মাথার উপর দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে গেল। ট্রেন থেকে সমানে গুলি চালাচ্ছে সবাই। আবার ধোঁয়া। দ্বিতীয় গোলাটা একটু বেশি নিচু দিয়ে এসে একটা গাছ ফুঁড়ে মাটিতে ঢুকল। অনেকটা দূরে চলে এসেছে ওরা। 'আর পাঁচটা মিনিট! আর পাঁচটা মিনিট!' বিড় বিড় করছে রানা। বিরাট একটা সরীসৃপের মত উঠে যাচ্ছে ট্রেন পাহাড়ের গা বেয়ে। দুই মিনিটের মাথায় তৃতীয় গোলাটা এল। সোজা এসে লাগল শেষের কম্পার্টমেন্টে। বিকট আওয়াজ হলো। থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা ট্রেন। চমকে উঠল সবাই। কিন্তু কেউ আঘাত পায়নি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল রানা—কিন্তু ওকি!

'ট্রেনটা থেমে যাচ্ছে কেন?' চিৎকার করে উঠল বব। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গলা শুকিয়ে গেল রানার।

অ্যানটি ট্যাঙ্ক শেল ব্যবহার করছে ওরা। সেজন্যে বিস্ফোরণের আওয়াজ পাওয়া যায়নি। তৃতীয় গোলার আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেছে দুই কম্পার্টমেন্টের মাঝখানের কাপলিং। ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে শেষ বগিটা ট্রেন থেকে।

'লাফিয়ে নেমে পড়ো সবাই, শিগগির!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল রানা। কিন্তু

কারও কানে গেল না কথাটা। বুঝতে পারছে ওরা কি ঘটেছে। ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। নড়ার ক্ষমতা নেই।

'কি করব আমরা এখন?' পিছিয়ে যাওয়া বগিটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জো।

'কিছুই করার নেই। ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে!' কি যে হবে তা ভাল করেই জানে সবাই।

ঢাল বেয়ে সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে ওটা। এদিক থেকে এখন আর গুলি ছুঁড়ছে না কেউ। গুলি ছোঁড়ার কথা ভুলে দেখছে শেষ বগিটার স্টেশনের দিকে ফিরে যাওয়া।

ব্রুসের মাথা দেখা গেল জানালা দিয়ে। মাথা বের করে হাত নেড়ে বিদায় জানালেন বৃদ্ধ। ববকে দেখা যাচ্ছে। মাথা বের করে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে ও। কিন্তু হাত নাড়ছে না। ভয়ে পাথর হয়ে গেছে ওর ভিতরটা। কামানের মুখে সাদা ধোঁয়া দেখা গেল আবার। পাশ থেকে দ্বিতীয় কম্পার্টমেন্টের ভিতরে ঢুকে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল গোলাটা। ছাদের অনেকটা জায়গা হাঁ হয়ে আছে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে পাল্টা জবাব দিল ওরা। একসাথে গর্জে উঠল অনেকগুলো রাইফেল। সেই সাথে ব্রেনের ট্রেসার ছুটছে ঝাঁকে ঝাঁকে। আবার ধোঁয়া দেখা গেল কামানের মুখে। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে ট্রেন, সবে নামতে শুরু করছে নিচের দিকে, এমনি সময়ে এঞ্জিন ফুটো করে বেরিয়ে গেল শেষ গোলাটা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। স্ স্ স্ স্ শব্দ তুলে স্টীম বেরিয়ে আসছে বয়লার থেকে।

'কি খবর, কার্লস?' ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ করল রানা ড্রাইভারের সাথে।

'বুঝতে পারছি না। এত স্টীম চারদিকে যে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। গজের প্রেশার দ্রুত নেমে যাচ্ছে দেখছি। থেমে যাচ্ছে ট্রেন।'

'যেমন করেই হোক নিচের ওই লেভেল ক্রসিংটা আমাদের পার হতেই হবে। বুঝতে পেরেছ? লেভেল ক্রসিং-এর এই পারে থামলে ওরা লরি নিয়ে ঠিকই পৌঁছে যাবে।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি, ক্যাপ্টেন। থামলে যতদূর সম্ভব সরে গিয়ে তারপর।'

স্টেশনের দিকে তাকাল রানা। ইতিমধ্যেই বিশ তিরিশ জন সুফতা পৌঁছে গেছে প্ল্যাটফর্মে। সকালের রোদে ঝিক ঝিক করছে ওদের রাইফেলের মাথায় লাগানো বেয়োনেটগুলো। স্টেশনের শেষ মাথায় বাফারের সাথে ধাক্কা খেয়ে কয়েক গজ পিছিয়ে এসে থেমে গেল বগিটা। রাইফেলের মৃদু পট্ পট্ পট্ শব্দ আসছে কানে। মুখ ঘুরিয়ে নিল রানা। ঢাল বেয়ে দ্রুত নামছে ওরা এখন। পাহাড় থেকে নেমে সমান জায়গায় চলতে চলতে গতি কিছুটা হ্রাস পেল। সহজেই লেভেল ক্রসিং পার হয়ে এল ওরা। এখনও প্রায় তিরিশ মাইল বেগে ছুটছে ট্রেনটা, কিন্তু

গতি কমে আসছে দ্রুত। লেভেল ক্রসিং থেকে প্রায় তিন চার মাইল দূরে এসে শেষ পর্যন্ত থেমে দাঁড়াল ট্রেন। চারপাশে ঘন জঙ্গল। রাস্তা থেকে দেখা যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ ইতিমধ্যে তিন-চারটে বাঁক নিয়েছে ট্রেন।

'এখানে ওরা সহজে আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না,' বলল রানা। 'এখানে পৌঁছতে হলে ওদের রেল লাইন ধরেই আসতে হবে। এক মাইল আগে অ্যামবুশের ব্যবস্থা করব আমরা।'

'ওরা আজ আর আসবে না আমাদের খুঁজতে,' বলল জো। 'এতগুলো মেয়ে আর বার ভর্তি মদ ছেড়ে ওরা আর কোথাও নড়বে না আজ। দুই তিন দিন পর নেশাটা কেটে গেলে হয়তো জেনারেল আমাদের খুঁজতে পাঠাবার সুযোগ পাবে।'

'সম্ভবত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে। প্রথমে অ্যামবুশের ব্যবস্থা করো, তারপর ভেবে চিন্তে ফেরার একটা উপায় বের করতে হবে আমাদের। এঞ্জিনটা খতম। ওটা এখন আর মেরামত করা সম্ভব নয়।'

হঠাৎ মনে পড়ল রানার, হীরাগুলো স্লোন হাইনসের সাথেই ছিল শেষ বগিতে। ব্রুসকে বলে দিয়েছিল রানা ম'সাপা জংশন পর্যন্ত স্লোনের মালামালের উপর নজর রাখতে। হীরা ছাড়া ফিরে কাতাঙ্গা সরকারকে কি জবাব দেবে সে? ওরা কোন অজুহাতই মানতে রাজি হবে না, জানে রানা।

এগারো

ফিউনারেলে যেভাবে টুপি ধরে, ঠিক সেইভাবে হেলমেটটা বুকের ওপর চেপে ধরেছে বব। এখন বেশ জোরে নিচের দিকে নামছে বগিটা। গোলাগুলির শব্দে কানটা এখনও ভোঁ-ভোঁ করছে ওর। বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছে। মা শান্ত করার চেষ্টা করছে ছেলেকে। সবই শুনছে, কিন্তু কিছু মাথায় ঢুকছে না ওর। শেষবারের মত ট্রেনটার দিকে তাকাল বব। অনেক দূরে চলে গেছে ওটা। কিন্তু এত দূর থেকেও চিনতে পারছে সে। প্রকাণ্ড দেহী জো-র পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপ্টেন লুইস।

এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ লেভী। বললেন, 'ওরা আর আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না লেফটেন্যান্ট। প্রস্তুত হয়ে যাও। কার কি করার আছে, নিয়তিই আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর মুখে।' অনেকটা স্বগতোক্তির মতই শোনাল লেভীর কথাগুলো। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আগে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন যেন। 'আইভি!' দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন স্ত্রীকে। একটা চুমো খেয়ে বললেন, 'তোমাকে ভালবাসি আমি। মনে প্রাণে ভালবাসি।'

কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা। স্বামীর প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। 'আমিও তোমায় ভালবাসি, ব্রুস।' স্বামীর বুকে গাল ঘষে চোখের পানি মুছলেন।

স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলেন লেভী। 'ভেঙে পোড়ো না, আইভি। মানুষকে একদিন না একদিন তো মরতে হয়ই।'

বড় বড় চোখ করে বাপ-মা'র কথা শুনছিল তাঁদের শেষ বয়সের সন্তান হেনরী। সাত বছর বয়স। এগিয়ে এল। 'ড্যাডি, আমিও তোমাকে আর মামীকে খুব ভালবাসি···আর দেখো তুমি, আমি একটুও ভয় পাব না মরতে।'

ছেলের দিকে চাইলেন লেভী। হু-হু করে কান্না ঠেলে আসছে ভিতর থেকে। কি দোষ করেছে বাচ্চা ছেলেটা? কেন ওকে মরতে হবে অকালে? দুই হাতে ছেলেকে বুকে চেপে ধরলেন বৃদ্ধ। গাল বেয়ে দুই ফোঁটা পানি নেমে এল।

পিছনে কি যেন পড়ার শব্দে ঘুরে তাকালেন ব্রুস লেভী। ববের হাতে ধরা হেলমেটটা নিচে পড়েছে। ওর খেয়াল নেই সেদিকে, গভীর মনোযোগের সাথে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো সুফতাদের লক্ষ করছে। 'মরতে চাই না আমি!' বিড় বিড় করে বলল সে, 'এইভাবে মরতে পারব না আমি! তোমরা কেউ কিছু করো! বাঁচাও, প্লীজ!' সবার কাছে আকুতি জানাল সে। চার জন সৈনিকের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কজন হেসে উঠল ওর কথায়। শুষ্ক হাসি। উঠে এগিয়ে গেল সে ব্রেনগানের দিকে।

'গুলি কোরো না!' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল বব। 'ওদের চটালে আমাদের সবাইকে ওরা মেরে ফেলবে।'

'একবার বাগে পেয়েছে, ওরা কাউকে ছেড়ে দেবে মনে করেছ? আমাদের মরতেই হবে। তার আগে যে কয়টাকে খতম করতে পারি!' ব্রেনগানের পুরো ম্যাগাজিনটা সে একবারে খালি করল প্ল্যাটফর্মে, ব্যস্ত মিশমিশে কালো মানুষগুলোর দিকে লক্ষ্য করে।

'না, না!' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বব। 'খোদা, তুমি বাঁচাও আমাকে! দয়া করো আমায়!' আকাশের দিকে দু'হাত তুলে আবেদন জানাল এবার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে কোন ঐশী ঘটনা ছাড়া এখন আর বাঁচার উপায় নেই।

গতি কমে এসেছে কিছুটা। প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি এসে গেছে বগি। প্ল্যাটফর্মের ওপর ওরা প্রস্তুত হয়ে আছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বব। রক্ষা নেই কারও।

দরজা খুলে ঝাঁপ দিল সে। উবু হয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে। হাঁটু ছিলে গেছে। সেদিকে খেয়াল না করে দুই হাঁটুর মাঝে মুখ লুকাল বব। আমি কাউকে দেখি না—আমাকেও কেউ দেখে না, এমন একটা মনোভাব ওর। রাইফেলের কুঁদোর প্রচণ্ড আঘাতটা পিঠের ওপর পড়তেই ভুল ধারণা ভেঙে গেল। ব্যথায় চিৎ হয়ে কাতরাচ্ছে বব। কিন্তু চোখ বুজে আছে এখনও। বেয়োনেটটা

কখন বুকের মধ্যে ঢুকবে তার অপেক্ষাতেই আছে ও। কে একজন ধমকে উঠল, 'এখনি মেরে ফেলো না ওকে। এই সাদা চামড়াটাকে স্বয়ং জেনারেলের জন্যে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে, জেনারেলের জন্যেই থাক তুই, হারামজাদা।' একটা মাঝারি রকম বাড়ি কষাল লোকটা বাঁট দিয়ে ববের মুখে। ঠোঁটটা থেঁতলে গেল। মুখে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে ও। মাটিতে শুয়ে শুয়েই লক্ষ করল সে সুফতাদের আদিম উল্লাস। ওর চোখের সামনেই সৈনিকদের সবাইকে একে একে গুলি করে মারল হাসতে হাসতে। এতেও শান্তি হলো না ওদের। বেয়োনেট দিয়ে মৃতদেহগুলোর বুক ছিন্নবিচ্ছিন্ন করল ওরা। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে হেনরী। থর থর করে কাঁপছে বাপের পাশে দাঁড়িয়ে। মেয়েদের দাঁড় করানো হয়েছে অন্য পাশে। আইভির ব্লাউজটা ছিঁড়ে দিল একজন হেঁচকা টানে। চিৎকার করে উঠল আইভি। আইভিকে জড়িয়ে ধরে ব্রার হুক খোলার চেষ্টা করছে লোকটা উল্লসিত ভাবে হাসতে হাসতে। এগোতে চেষ্টা করলেন ব্রুস লেভী আইভির সাহায্যে। ঘ্যাঁচ করে বিঁধল বেয়োনেটটা তাঁর পিঠে। বেয়োনেট গেঁথেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে লোকটা। মুখ থুবড়ে পড়ল বৃদ্ধের লাশ। মরেছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে বুটের লাথিতে চিৎ করা হলো দেহটাকে।

'ড্যাডি!' চিৎকার করে লাশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল হেনরী। দুই পা ধরে শূন্যে তুলে নিল লোকটা হেনরীকে। মাথার ওপর এক পাক ঘুরিয়েই আছাড় মারল বগির গায়ে। মাথাটা ছাতু হয়ে ঘিলু বেরিয়ে গেল। হলুদ আর লালের সংমিশ্রণে একটা ছোপ লেগে রইল বগির গায়ে। দুহাতে চোখ ঢাকল বব। এই দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছে না সে। ভিতরটা উল্টে এল। গল্‌গল্‌ করে বমি করে ফেলল ও।

কয়েকজনে মিলে টানাটানি করে ইতিমধ্যেই উলঙ্গ করে ফেলেছে দুটো মেয়েকে। বাকি দু'জনেরও উলঙ্গ হতে বেশি বাকি নেই।

দু'জন অফিসার পৌঁছেচে। চেঁচিয়ে কি যেন আদেশ দিল একজন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। একটা মেয়েকে চারজনে চিৎ করে শুইয়ে চার হাত পা মাটির সাথে ঠেসে ধরেছে, আর দু'জন বেল্ট খুলতে খুলতে ঝগড়া করছে কে আগে।

পরপর দুটো গুলির আওয়াজে চকিত হলো সবাই। আদেশ কানে গেছে এবার, নির্দেশ মত টানতে টানতে হোটেলের দিকে নিয়ে গেল ওরা মেয়েদেরকে।

ববের দিকে এগিয়ে এল একজন অফিসার। 'সুপ্রভাত! তোমার উপস্থিতিতে জেনারেল ফ্রস্ট খুবই প্রীত হবেন। দুঃখের বিষয়, তোমার অন্যান্য সাদা বন্ধুরা পালিয়ে চলে গেছে। সবাইকে একসাথে পেলে খুবই মজা হত। তবু, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' বুকের জামা ধরে ওকে উঠিয়ে বসাল অফিসারটা। এক সেকেণ্ড চোখে চোখে চেয়ে থেকে হঠাৎ থুথু দিয়ে মুখ ভরিয়ে দিয়ে আবার ঠেলে

ফেলে দিল। 'ওকে নিয়ে এসো।' উঠে দাঁড়াল অফিসার, 'জেনারেল খুব খুশি হবেন ওকে পেয়ে।' হোটেলের দিকে রওনা হলো অফিসার লোকটা।

হোটেলে ফিরে ববকে সামনের বারান্দায় একটা পিলারের সাথে বাঁধলো ওরা। ঘাড় গুঁজে বসে রইল বব। ইচ্ছা করলেই সে মাথা তুলে দেখতে পারে মেয়েগুলোর কি অবস্থা করছে ওরা। লাউঞ্জের ওই বড় বড় জানালার ভিতর দিয়ে তাকালেই সব দেখা যায়। কিন্তু একদিনের জন্যে যথেষ্ট দেখেছে বব। হেনরীর বীভৎস মৃত্যুটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ও। তাকাচ্ছে না বব, কিন্তু শব্দ যা কানে আসছে তাতে সহজেই অনুমান করতে পারছে সে মেয়েগুলোর কি দুর্ভোগ ঘটছে। প্রথম দিকে চিৎকার করছিল ওরা। দুপুরের দিকে আর চিৎকার নয়, শুধু বোবা গোঙানী শোনা গেল। বিকেলের দিকে আর কোন শব্দই কানে এল না ববের। অজ্ঞান না হলেও ওই রকমই অবস্থা, বুঝে নিল সে। কিন্তু লাউঞ্জের সামনের দরজায় লাইন এখনও কমেনি। ইতিমধ্যেই কারও কারও তিন চার রাউণ্ড হয়ে গেছে। ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়েই আবার লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সবারই মোটামুটি মাতাল অবস্থা এখন। বিরাটকায় লোকটা যতবারই লাইন ধরার জন্যে গেছে প্রত্যেকবারই ববের সামনে থেমে দাঁড়িয়েছে ক্ষণিকের জন্যে। ওর এক হাতে পারফেইট আমুরের বোতল অন্য হাতে হার্পারের হুইস্কির বোতল।

'এই, আমার সাথে একটু মদ খাবি, খোকা?' ববের জবাবের অপেক্ষা না রেখে সেই জবাব দিয়েছে, 'অবশ্যই খাবি।' বলেই বোতল থেকে কিছুটা মদ নিজের মুখে ঢেলে নিয়ে সেটা পিচকারীর মত ববের চোখে মুখে ছিটিয়েছে। যতবারই এমন করেছে লোকটা প্রত্যেকবারই হাসির রোল উঠেছে লাইনে অপেক্ষমাণ সুফতাদের মধ্যে।

মজা করছে ওরা ববকে নিয়ে। একজন ওর সামনে থেমে কয়েক হাত পিছিয়ে বেয়োনেট চার্জ করে ছুটে এল ওর দিকে। শেষ মুহূর্তে বেয়োনেটের মাথাটা সরিয়ে নিল। গাল ঘেঁসে চলে গেল বেয়োনেট। ভয়ে চিৎকার করে উঠল সে। হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

সন্ধ্যায় বেশির ভাগ বাড়ি তচ্‌নচ্‌ করে জ্বালিয়ে দিল ওরা। একটা দল আকণ্ঠ মদ্যপান এবং মনের সুখে ধর্ষণের পর বারান্দার এককোণে পা ছড়িয়ে বসে গান জুড়ে দিল। গুরুগম্ভীর স্বরে ওরা গেয়ে চলল আফ্রিকার বর্বর হত্যাকাণ্ড আর অত্যাচারের গান। হোটেলের সামনেই কি নিয়ে তর্কাতর্কির পর লেগে গেছে দু'জনে। দু'জনের হাতেই খোলা ছুরি। দু'জনেই সুযোগ খুঁজছে। দ্রুত পা চলছে ওদের। বৃত্তাকারে ঘুরছে ওরা। ধুলো উড়ছে দ্রুত পদ চালনায়। হঠাৎ এগিয়ে গেল ওরা পরস্পরের দিকে। আঘাত হেনেছে দু'জনই। ছুরির আঘাতে বাম হাতের তালু

ফুটো হয়ে গেছে লম্বা লোকটার, আর তার ছুরিটা আমূল গেঁথে গেছে অন্যজনের পাঁজরে। আঘাত খেয়ে প্রথমে বরফের মত জমে গেল ওর শরীরটা, তারপর মাতালের মত কয়েক পা সামনে এগিয়ে ঢলে পড়ল সে। লম্বা লোকটা নির্বিকার ভাবে হাতের তালুতে গাঁথা ছুরিটা বের করে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ওর বুক থেকে খুলে নিল, রক্ত মুছে কোমরে গুঁজল। রাস্তাতেই পড়ে রইল দেহটা।

রাতে ববকে নিতে এল চারজন লোক। মদ ওরাও খেয়েছে, কিন্তু এখনও ঠিক মাতাল হয়নি। রাস্তায় পড়ে থাকা লোকটা এখনও স্থির বিস্ফারিত চোখে আকাশের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে রয়েছে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল অফিস ব্লকে।

একা একটা ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসা জেনারেল ফ্রস্ট। কুচকুচে কালো নাদুস-নুদুস মিষ্টিওয়ালার মত চেহারা। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুল। মনে হয় একটা ছোট উলের টুপি দিয়ে মাথাটা ঢাকা। কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে। বুকের ওপর চকচক করছে তিন সারি মেডাল। দুই হাতের প্রত্যেকটা আঙুলেই দ্বিতীয় কড়া পর্যন্ত আংটিতে ভরা। প্রতিটা দামী আংটি। হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না, নীলা, পোখরাজ কোনটাই বাদ নেই। মুখ দেখে ঠাণ্ডা মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু চোখ দেখলেই শুকিয়ে আসে কলজে। উন্মাদের শূন্য দৃষ্টি ভরা ঠাণ্ডা সাপের চোখ। টেবিলের ওপর একটা বাক্স রাখা। ঢাকনি খোলা। ঘরে আর কেউ নেই।

ঘরে ঢোকার সময় বব দেখল বাক্স থেকে সাদা একটা ক্যানভাসের ব্যাগ বের করছে জেনারেল। থলেটার মুখের বাঁধন খুলে সামনের ব্লটিং পেপারের ওপর ঢালল সে। একগাদা কালচে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড গড়িয়ে পড়ল। বিরক্ত মুখে তার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে ভাল করে দেখল পাথরগুলো।

'এই একটা বাক্সই পাওয়া গেছে?' চোখ না তুলেই প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, এই একটা বাক্সই ছিল বগিতে।' চারজনের মধ্যে একজন বলে উঠল।

'তুমি ঠিক জানো?'

'আমি নিজেই নামিয়েছি, স্যার। এই একটা বাক্সই ছিল।'

আর একটা ক্যানভাস ব্যাগ বের করে ঢালল জেনারেল। এবারেও তাই। আগের মতই কালচে পাথরগুলো। আরও কয়েকটা ব্যাগ খালি করল সে টেবিলের ওপর। অসন্তোষ বাড়ছে তার। ছোটখাট একটা পাথরের স্তূপ জমে গেছে টেবিলের ওপর।

'তুমি কি বাক্সটা খুলেছিলে?' সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে জেনারেল।

'কসম খেয়ে বলছি, জেনারেল, আমি খুলিনি। আপনি তো নিজেই পরীক্ষা করে

দেখেছেন সীলটা ভাঙা ছিল না।'

'হুম।' জেনারেলের কালো মুখটা একটু শক্ত হলো। ভিতরে ভিতরে খেপে উঠছে সে। বাক্সে হাত ঢুকাল আবার। মুচকি হাসি ফুটেছে তার মুখে। একটা সিগারের বাক্স বের করে আনল বাক্সের ভিতর থেকে।

'পেয়েছি,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ, 'এতেই আছে মনে হচ্ছে।' বুড়ো আঙুলের চাপে খুলে গেল বাক্সটা। পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোয় ঝকমকিয়ে উঠল তুলোর ওপর রাখা হীরেগুলো। একটা তুলে নিয়ে দু'আঙুলে চোখের সামনে ধরে খুঁটিয়ে দেখল সে। 'সুন্দর, অপূর্ব!' কাল্‌চে হীরাগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ঝকমকে হীরাগুলো একটা একটা করে যত্ন করে সাজাল পাশাপাশি টেবিলের উপর। তারপর সবগুলো একত্র করে আবার অন্যভাবে সাজাল সে। 'সাত রাজার ধন!' বিড়বিড় করে আপন মনেই বলল সে। হঠাৎ খাবলে তুলে নিল সব। তারপর একটা ক্যানভাস ব্যাগে ভরে মুখটা শক্ত করে বেঁধে বুক পকেটে রেখে বোতাম এঁটে দিল। আরাম করে হেলান দিয়ে বসে এতক্ষণে চোখ তুলে তাকাল ববের দিকে। হলদে ধোঁয়াটে চোখ—মণিটা কালো।

'ওর কাপড়গুলো খুলে নাও,' আদেশ করল জেনারেল নির্লিপ্ত গলায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই টেনে হিঁচড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলল ওরা ববকে।

আবার চোখ তুলে তাকাল জেনারেল। 'সাদা!' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলছে সে, 'এত সাদা কেন?' চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। 'কতবার তোমরা জেলে ভরেছ আমাকে, কষ্ট দিয়েছ, অপমান করেছ। এক এক করে সব শোধ নেব আমি।' চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আলতো করে হাত বুলাল ববের মসৃণ চামড়ার উপর। 'কিন্তু এই মসৃণতা থাকবে না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি নিজেই দেখো, এরকম আর থাকবে না।'

হঠাৎ জেনারেলের হাঁটুটা সজোরে উঠে এসে লাগল ববের দুই উরুর মাঝে। বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। অসহ্য যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে ববের নিম্নাঙ্গে। গরম লোহার ছোঁয়ার মতই তীক্ষ্ণ। পেটের ভিতরটা আঁকড়ে গেছে। ভারি মনে হচ্ছে। চোখের সামনে সব কিছু উজ্জ্বল সাদা। কয়েকটা তারা নেচে বেড়াচ্ছে তার মাঝে।

'ধরো ওকে!' উত্তেজনায় জেনারেলের গলা কয়েক স্কেল চড়ে গেছে। দু'জন ববের কনুই ধরে ওকে জোর করে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল। তলপেট আর দুই উরুর মাঝের অংশ এখন জেনারেলের বুটের সহজ আওতায় এসে গেছে। আজ নতুন না। ওরা জানে কেমন করে ধরতে হবে।

লাথিটা পড়ল ওর তলপেটে। 'আমাকে জেলে ভরার জন্যে…এক নম্বর।'

'হুঁক' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল ববের মুখ থেকে। আগের ব্যথার সাথে এই ব্যথা মিশে একাকার হয়ে গেল। আর একটা লাথি পড়ল ওর অণ্ডকোষের

ওপর। স্পষ্ট টের পেল ফেটে গেছে, কিন্তু তীব্র ব্যথায় গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না কোন। চেহারাটা ছোটখাট হলে কি হবে, লাথি চালাচ্ছে সে সেন্টার ফরওয়ার্ড পেলের মত। ববের পেটটাকে ফুটবল ধরে নিয়ে যেন প্র্যাকটিস করছে পেনালটি কিক্।

ছোটছোট বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে জেনারেলের কপালে। একেবারে অন্য লোক হয়ে গেছে সে। খ্যাপার মত লাথি চালাচ্ছে এখন। লাথির চোটে পেটের মধ্যে কি যেন একটা ছিঁড়ে গেল। একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল বব। কিন্তু ঠেসে ধরে রেখেছে ওরা, ওঠার উপায় নেই। নিচের দিকটা কেমন অবশ হয়ে এসেছে। দাঁড়াতে গিয়ে টের পেল বব যে পা দুটো তার কথা শুনছে না। ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পেটের ভিতরে কেমন গরম একটা অনুভূতি। পেটের নিচে কোন অনুভূতিই আর নেই।

একের পর এক লাথি মেরে চলেছে ফ্রস্ট। কিন্তু এখন আর ব্যথা নেই, কেবল ঝাঁকিটা টের পাচ্ছে ও। মারা যাচ্ছে বব। যে লোকটা তাকে এভাবে মেরে ফেলছে তার মুখটা একবার দেখল সে মাথা তুলে। ব্যথার চরম শিখর অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে ও। এখন কেবল মৃত্যুর অপেক্ষা।

ওকে চোখ তুলে চাইতে দেখে লাথি না মেরে উল্টো হাতে একটা চড় কষাল ফ্রস্ট। মাথাটা ঝুলে গেল ওর। জ্ঞান হারিয়েছে। গার্ড দু'জন ছেড়ে দিল ওকে। মুখ থুবড়ে সামনের দিকে পড়ল সে।

'ব্যাটা মরে গেছে,' বলল একজন গার্ড।

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল জেনারেল ফ্রস্ট। বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে তার। হাঁপাচ্ছে। শার্টের অনেকটা অংশ ঘামে ভিজে গেছে। চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল সে। তার চোখ সেই উজ্জ্বলতা হারিয়েছে এখন। ঘোলাটে চোখ দুটো স্বপ্নিল ভাব নিয়েছে, মনে হচ্ছে তাকিয়ে রয়েছে কিন্তু কিছুই দেখছে না।

দু'জন গার্ড ববকে তুলে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল। ঝপ করে পড়ল মেঝেতে ববের অসাড় দেহ। মাথাটা ঠুকে গেল মাটিতে। জেনারেল ফ্রস্টের এই মারের পরে আজ পর্যন্ত কেউ বাঁচেনি। জানে ওরা। নিশ্চিন্তে চলে গেল তারা আরও মদ খেতে।

আসলে ঘোরের মধ্যে রয়েছে বব। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্যে। মাতালদের হৈ-হল্লা, হাসির শব্দ কানে পৌঁচাচ্ছে ওর। পেটের কাছে অনেকখানি জায়গা থেঁতলে অবশ হয়ে গেছে। ফুলে উঠছে পেটটা অভ্যন্তরীণ রক্ত-ক্ষরণের ফলে। একটু নড়লে কুলকুল শব্দ হচ্ছে। চোখ বুজল বব।

ট্রেনের ছাদে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন লুইসের মূর্তিটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। মনে মনে নালিশ জানাল সে ক্যাপ্টেনের কাছে। 'বড় কষ্ট হচ্ছে! ফিরে

এসো ক্যাপ্টেন,' ডাকল সে, 'তোমার কাছে আমার দাবি রইল, ক্যাপ্টেন, প্লীজ, ফিরে এসো। ওরা আমাকে খুব কষ্ট দিয়ে মেরেছে ক্যাপ্টেন, খুব কষ্ট। প্রতিশোধ নিয়ো তুমি! ক্যাপ্টেন, তুমি আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ো!' আবার জ্ঞান হারাল বব।

টার্গেট নাইট-২

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

বারো

ট্রেন লাইন দুটোর মাঝে একটা স্লিপারের উপর দাঁড়িয়েছে রানা। জো-র পাতা অ্যামবুশ পরীক্ষা করছে সে। জানা সত্ত্বেও প্রায় দুই মিনিট লাগল রানার ব্রেনগানের নলটা খুঁজে বের করতে। বড় বড় সবুজ ঘাসের আড়ালে চমৎকার ভাবে লুকানো হয়েছে ওটাকে। মনে মনে জো-র প্রশংসা না করে পারল না, সত্যিই লোকটা কাজের।

'চমৎকার হয়েছে,' জো-র পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'এর চেয়ে ভাল অ্যামবুশ শয়তানেও তৈরি করতে পারবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, বস্,' ক্যাপ্টেনের প্রশংসায় গদগদ হয়ে বলল জো। 'সাধ্যমত চেষ্টা করেছি আমি।'

ঝোপের আড়ালে লুকানো লোকজনের উদ্দেশে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?' সবাই সমস্বরে জানাল তারা শুনতে পাচ্ছে।

'ওরা যদি আসে, ঠিক এইখানে পৌঁছানোর আগে তোমরা গুলি করবে না।' ঝোপ থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে রাখল রানা মাটিতে। 'দেখতে পাচ্ছ তোমরা?' আবার সবাই জানাল হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছে, শত্রু কোন্ পর্যন্ত এগুলে তারা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করবে।

'সন্ধ্যায় লোক পাঠাব আমি তোমাদের রিলিভ করার জন্যে।' ট্রেনের উদ্দেশে রওনা হলো রানা আর জো। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিছুদূর গিয়েই লাইনটা বাঁক নিয়েছে। ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য রয়েছে ট্রেনটা আধ মাইল দূরে।

কার্লস অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। পিছনের বগিটার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্রেড আর কার্লস কথা বলছে।

'কিছু করতে পারলে?' কার্লসকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাহ্, কিছুই করার উপায় নেই ক্যাপ্টেন। বয়লারটা দুই জায়গায় ফুটো হয়েছে। তাছাড়া তামার টিউবও একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। রিপ্লেস করতে হবে, ওটা আর ঠিক করা যাবে না।'

'ঠিক আছে। চিন্তা কোরো না, একটা উপায় নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাবে।' অবাক হয়নি রানা। অত স্টীম বেরুতে দেখেই সে বুঝেছিল, এঞ্জিনের কারবার শেষ।

'মেয়েটা কোথায়?' ফ্রেডকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'লাঞ্চ তৈরি করছে। এখনই খিদে পেয়ে গেল নাকি তোমার?' টিটকারি মারল ফ্রেড। ইচ্ছে করেই 'খিদে' শব্দটার ওপর জোর দিল।

জবাব দিল না রানা। ফ্রেডের চোখে চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পা বাড়াল সামনে।

এঞ্জিনের ভেতর রান্নায় ব্যস্ত সুফিয়া। চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আলু আর পেঁয়াজ ছেলায় ব্যস্ত। স্টীল ফ্লোরে কয়লা জ্বেলে সুন্দর চুলো বানিয়ে নিয়েছে সে। আগুনের তাপে গাল দুটো একটু লালচে হয়ে উঠেছে। কপালে কোন ফাঁকে একটু ছাই লেগেছে জানেও না ও। চোখ তুলে রানাকে দেখেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর, 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাস্ তৈরি করছি!' হাসি মুখে বলল সুফিয়া। 'মাংস, আলু আর পেঁয়াজ।'

'ঠিক আছে। আজ থেকে তোমাকে হেড বাবুর্চি নিযুক্ত করা হলো। অবশ্য বেতন ছাড়া।'

'বয়ে গেছে আমার, অমন চাকরির দরকার নেই।' জিভ বের করে ভেঙিয়ে দিল সুফিয়া রানাকে।

'কার্লস জানিয়েছে, একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, এই এঞ্জিনটা এটা আর আমাদের কোন কাজে আসবে না।'

'কে বলেছে কোন কাজে আসবে না? এইতো, চমৎকার রান্নাঘর হয়েছে না এটা?' রানা সিরিয়াস হতে চাইলেও সুফিয়া সিরিয়াস হতে নারাজ।

'ঠাট্টা না, আসলেই আমরা মস্ত বিপদে ফেঁসে গেছি। এঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, এখন বিকল্প কোন যানবাহন ছাড়া আমাদের পক্ষে দু'শো মাইল পাড়ি দেয়া অসম্ভব।' সত্যিই চিন্তায় পড়েছে রানা।

কিন্তু কোন আমলই দিল না সুফিয়া। 'তুমি থাকতে আমাদের চিন্তা কি? সবাই জানে একটা না একটা ব্যবস্থা তুমি করবেই। আর কোন উপায় যদি না থাকে, তবে জেনারেল ফ্রস্টের কাছে ট্রাকগুলো চেয়ে নিলেই হয়,' ঠাট্টা করল সুফিয়া।

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল রানা। একটা ভাল ক্লু দিয়েছে সুফিয়া তাকে। 'রান্না যদি ভাল না হয় তাহলে কিন্তু হেড বাবুর্চি থেকে থার্ড বাবুর্চিতে নামিয়ে দেব, মনে থাকে যেন!' বলে নেমে গেল সে। জো আর ফ্রেডের সাথে জরুরী আলাপ আছে। দলের সবারই বাঁচা মরা নির্ভর করছে এর উপর।

বাঙ্কে চিৎ হয়ে শুয়ে ওয়াশ বেসিনের ওপর পা রেখেছে ফ্রেড। উল্টো দিকের বাঙ্কে জো আর রানা বসেছে।

'এত জলদি হয়ে গেল? ঢুকলে আর বেরোলে!'

অশ্লীল মন্তব্য করল ফ্রেড রানার উদ্দেশে। কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল রানা ওর

দিকে কয়েক সেকেণ্ড।

'এখন বলব না কিছু, এলিজাবেথভিলে পৌঁছে অথরিটির হাতে তুলে দেবার আগে আমি নিজের হাতে ভাল মত ধোলাই দেব তোমাকে। তোমার পাওনা রইল ওটা।' সংযত রাখছে রানা নিজেকে। বদমেজাজী আর অভদ্র হলেও ফ্রেড অত্যন্ত দক্ষ যোদ্ধা। যে দুঃসাহসী পরিকল্পনা সে নিয়েছে সেটা ফ্রেডের সাহায্য ছাড়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

'শোনো, তোমাদের যে-জন্যে ডেকেছি, এঞ্জিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওটা আর ঠিক করা যাবে না। এখন আমাদের সামনে দুটো মাত্র পথ খোলা। এক হচ্ছে: বোঁচকা পেঁটরা নিয়ে হেঁটেই রওনা হওয়া। তাতে বিপদ এই যে আমাদের বালুবা এলাকা দিয়ে যেতে হবে। প্রতি পদে আমাদের আক্রান্ত হবার ভয় থাকছে। আর দুই: জেনারেল ফ্রস্টের ট্রাকে করে ফেরা।' চুপ করল রানা। কথাগুলো ভালমত মাথায় ঢোকার সময় দিল ওদের।

'অসম্ভব!' বলে উঠল জো। 'ট্রাকগুলো কিভাবে চুরি করা সম্ভব?'

'না, জেনারেল ফ্রস্টের নাকের ডগা থেকে ট্রাকগুলো চুরি করে আনা সম্ভব না। একমাত্র উপায় হচ্ছে আক্রমণ করে ওদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।'

'পাগল হয়েছ?' হেসে উঠল ফ্রেড। 'বদ্ধ উন্মাদ না হলে এমন উদ্ভট পরিকল্পনা কারও মাথায় আসে? লোকবল কত তোমার?'

'জেনারেল ফ্রস্টের সাথেই বা কত লোক আছে, ষাট সত্তরজন হবে?' ফ্রেডের উক্তিকে পাত্তা না দিয়ে বলল রানা, 'আমরা কয়জন আছি, জো? সিভিলিয়ানদের বাদ দিলে আমরা পঁচিশজনের মত আছি না?'

'প্রায়,' সায় দিল জো। 'আপনাকে ধরলে সাতাশ জন।'

'অন্তত তিনজনকে রাখতে হবে অ্যামবুশে। যদিও যথেষ্ট নয়, উপায় নেই এছাড়া।'

'উঁহুঁ।' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল জো। 'আপনি নিশ্চয়ই দিনে অ্যাটাকের কথা ভাবছেন না? রাতে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওদের তিনজনকে জঙ্গলে ফেলে রাখলে ভূতের ভয়েই মারা যাবে। অন্তত দশজন রাখতে হবে অ্যামবুশে।'

'সিভিলিয়ানদের মধ্যে থেকে যদি ভলান্টিয়ার পাওয়া যায়? এয়ার গান আর পয়েন্ট টু-টু রাইফেল নিয়ে যদি সাথে থাকে?'

'তাহলে চলতে পারে, কিন্তু আমরা চব্বিশ জন কি করব ফ্রস্টের ষাট-সত্তর জনের বিরুদ্ধে?'

'মদ খেয়ে এতক্ষণে ঢোল হয়ে আছে সুফতারা, ওদের অর্ধেক লোকেরই উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই এখন। বাকি অর্ধেক সামলাতে পারব না আমরা? বিশেষ করে সারপ্রাইজ এলিমেণ্টটা যদি আমরা কাজে লাগাই?'

'মস্ত বড় ঝুঁকি হয়ে যায়, বস্,' ভুরু কুঁচকে বলল বিগ জো। 'অবশ্য মাতাল

থাকতে থাকতে হঠাৎ আক্রমণ করে বসতে পারলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হয়তো ব্যাটাদের কাবু করতে পারব। যাই হোক, ধরে নিচ্ছি, ট্র্যান্সপোর্ট জোগাড় হয়ে গেল···হীরাগুলোর খবর কি? ওগুলো ঠিক আছে তো?'

কালো হয়ে গেল রানার মুখ। মাথা নাড়ল। 'শেষ কম্পার্টমেন্টে ছিল ওগুলো। এখন ফ্রস্টের দখলে।'

'হীরা?' নড়ে চড়ে উঠল ফ্রেড। হীরার কথা ওকে কিছুই বলা হয়নি। 'হীরা মানে?'

'এখান থেকে কিছু হীরাও উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল,' বলল রানা।

'তাই নাকি? তা আমাকে জানানো হয়নি কেন? জো জানে, অথচ আমি কিছুই জানি না···এবার বুঝতে পারছি, হঠাৎ করে অসহায় নারী-পুরুষের জন্যে কাতাঙ্গা সরকারের হৃদয় উথলে উঠেছিল কেন! আসল ব্যাপার তাহলে হীরা। কত টাকার হীরা নিয়ে ফিরছিলাম আমরা?'

'হীরা আসল ব্যাপার নয়, ফ্রেড, মানুষ উদ্ধারই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এবার শোনা যাক, ফ্রস্টকে আক্রমণ করার ব্যাপারে তোমার মতামত কি।'

ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করল ফ্রেড। তারপর বলল, 'ওরা তো সঠিক জানে না আমাদের এঞ্জিনের কতটা ক্ষতি হয়েছে। শালারা হয়তো ভাবছে আমরা একশো মাইল দূরে চলে গেছি এতক্ষণে। আমার মনে হয় ঠিকই বলেছ, মনে হচ্ছে ট্রাক ছিনিয়ে নেয়াটাই আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায়। নইলে পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে সবাইকে।'

'তাহলে কখন রওনা হচ্ছি আমরা, বস্?' প্রশ্ন করল জো।

'শহর থেকে আমরা বারো মাইলের মত দূরে আছি। ধরো অন্ধকারে ঘণ্টা ছয়েক লাগবে আমাদের পৌঁছতে। কাজেই সন্ধে ঠিক ছয়টায় রওনা হব আমরা। বারোটার মধ্যেই জায়গা মত পৌঁছে পজিশন নেব, কিন্তু আক্রমণটা করব ভোরের দিকে।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন, আমি যাচ্ছি লোক বাছাই করে তৈরি হতে।'

'যাও, সবাইকে একশো রাউণ্ড করে অতিরিক্ত গুলি, আর দশটা করে হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিতে বলো, আর আমার জন্যে চারটে হ্যাভারস্যাক ভর্তি হ্যাণ্ড গ্রেনেড দরকার হবে।' জো চলে গেল সব ব্যবস্থা করতে।

'অ্যাকশনে তোমার জুড়ি নেই, সবাই জানে,' ফ্রেডের দিকে ফিরল রানা। বলল, 'ওই ট্রাকগুলো আমাদের দখল করতেই হবে। পায়ে হেঁটে এলিজাবেথভিল পৌঁছানোর আশা দুরাশা, বালুবাদের এড়ানো যাবে না। আজকের আক্রমণে তাই ঠিক করেছি তোমাকেও সাথে নেব। তুমি যাচ্ছ আমাদের সাথে। কিন্তু মনে রেখো, সতর্ক চোখ রাখব আমি তোমার ওপর। যাও, জো-কে সাহায্য করো গিয়ে।'

অ্যাকশনের কথায় ভেতর ভেতর রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ফ্রেড। করিডর দিয়ে অদৃশ্য হলো সে। একা বসে আছে রানা চোখ বুজে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে বগিটা। ব্রুস লেভী আর আইভী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। হতবুদ্ধি বব চেয়ে রয়েছে বিস্ফারিত চোখে। কেন এমন হয়? ভাবল রানা। সব সময়েই সে দেখেছে, ঝড় ঝাপটা যা কিছু সব দুর্বল আর অসহায় লোকের উপর দিয়েই যায়। দুর্ঘটনার শিকার হয় এরাই বেশি।

ভাবতে ভাবতে কখন চোখ লেগে গিয়েছিল, টের পায়নি রানা।

'লুইস।' ডাক শুনে চোখ খুলল সে। লাঞ্চ নিয়ে এসেছে সুফিয়া। 'লাঞ্চ টাইম।' হাসল সুফিয়া।

'এত জলদি?' ঘড়ি দেখল রানা। একটা বেজে তেরো মিনিট।

'কেন, খিদে পায়নি তোমার?' কোলাপসিব্‌ল্ টেবিলটা বিছিয়ে খাবার সাজাতে সাজাতে জিজ্ঞেস করল সুফিয়া।

'হ্যাঁ, পেয়েছে। ঘড়ি দেখেই চেগিয়ে উঠেছে খিদেটা। জামিল কোথায়?' সোজা হয়ে বসল রানা।

'খেয়ে দেয়ে ফড়িং ধরে বেড়াচ্ছে।'

'রান্না তো দারুণ হয়েছে!' এক চামচ গুলাস মুখে দিয়ে বলল রানা। 'হাত চালাও, জলদি হাত চালাও, নইলে অবশিষ্ট থাকবে না কিছুই!'

মৃদু হেসে খেতে শুরু করল সুফিয়া।

খিদে পেয়েছে দু'জনেরই। নীরবে খেয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝে একবার চোখাচোখি হলো। দু'জনেই একটু হেসে আবার খাওয়ায় মন দিল।

'নাহ্, চাকরিটা তোমার টিকে যাবে মনে হচ্ছে,' খাওয়া শেষ করে বলল রানা। 'সত্যিই এত ভাল রান্না আশা করিনি।'

'ধন্যবাদ। কফি?'

'সোনায় সোহাগা হয় তাহলে।'

'কি করবে এখন?' কফি ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করল সুফিয়া।

'যুবক-যুবতী সুযোগ পেলে নির্জনে যা করে।'

'ঠাট্টা রাখো, আমি জানতে চাইছি আমরা ফিরব কি করে?'

'তোমার পরামর্শ মত জেনারেল ফ্রস্টের ট্রাকে চেপেই ফিরব ভাবছি।'

'আবার ঠাট্টা করছ তুমি।'

'না, সত্যিই তাই করব। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।' রাতের আঁধারে কিভাবে ওদের ট্রাক ছিনিয়ে আনবে খুলে বলল রানা।

মুখ শুকিয়ে গেল সুফিয়ার। 'বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে না? যদি গুলি খাও?'

হাসল রানা। 'চিন্তার কোন কারণ নেই। ভাল মানুষ ছাড়া অকালে কেউ মরে না।'

'সেই জন্যেই তো ভয় করছে আমার।' ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখটা, 'খুব সাবধানে থেকো। তোমার কিছু হলে আমাদের সবার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' রানা কিছু বলতে গেলে বাধা দিল, 'প্লীজ! হালকা কিছু বলে দুঃখ দিয়ো না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তোমার মঙ্গল কামনা করছি আমি এই মুহূর্তে।'

এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল রানা, 'সুফিয়া, আমি···'

'না, লুইস। কথা বোলো না, কিচ্ছু বোলো না।' চোখ বন্ধ করে আছে সুফিয়া। ঘনকালো লম্বা লম্বা পাপড়িগুলো ঈষৎ ভেজা। ঝুঁকে পড়ে ওকে দাঁড় করাল রানা। মসৃণ মরাল গ্রীবায় ঠোঁটের ছোঁয়া পেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার বুকে। মিশে একাকার হয়ে যেতে চাইছে ও রানার বুকের সাথে। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে শক্ত মুঠোয় ধরেছে একগুচ্ছ চুল।

'লুইস, লক্ষ্মী আমার। আহত হয়ো না। তোমাকে গুলি করার সুযোগ দিয়ো না ওদের।'

আলতো করে চুমো খেল রানা ওর ঠোঁটে।

প্রত্যুত্তরে সাড়া দিতে যাচ্ছিল সুফিয়া, এমনি সময়ে কম্পার্টমেন্টের দরজাটা বাড়ি খেল ঠাস করে। অপ্রস্তুত হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুফিয়া। ফ্রেড দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়। 'চমৎকার! বেশ চালিয়েছ দেখছি! বাহবা, ক্যাপ্টেন! চব্বিশ ঘণ্টাও পরিচয় হয়নি, এরই মধ্যে এতদূর! নাকি আরও ছয় ইঞ্চি এগিয়ে গেছ ইতিমধ্যেই?'

'কি চাও তুমি?' ধমকে উঠল রানা।

'তুমি যে কি চাও তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আর ভাবগতিকে মনে হচ্ছে যা চাও তা পাচ্ছও।' লোভাতুর দৃষ্টিতে সুফিয়ার বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ফ্রেড। প্রশংসার সুরে বলল, 'দারুণ জিনিস কিন্তু!'

ঠেলে ওকে করিডরে নিয়ে গিয়ে পায়ের ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'মরণ বাড় বেড়েছ তুমি, ফ্রেড! এখনও সাবধান না হলে খুন হয়ে যাবে!'

'তাই বুঝি?' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল সে। 'তুমিও একটু সাবধান থেকো, লুইস!' গম্ভীর হয়ে গেল ওর চেহারাটা। 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি—ইট ইজ ওনলি ম্যাটার অফ টাইম, ঠিকই মনে করতে পারব কোথায় দেখেছি তোমাকে এর আগে। লুইস পেগান, না কচু! আমি জানি, তুমি একজন মুসলিম। যদি তাই হয়, সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঝুলছে, ক্যাপ্টেন, তোমার মাথার ওপর। আই হেট মুসলিম্‌স্।'

'খুব ভাল কথা। এখন এখানে কি চাও?'

'জো খোঁজ করছে তোমাকে। সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা দেখার জন্যে। কিন্তু তুমি তো খুব ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি। ওকে বরং গিয়ে বলি একদিন পরেই না হয় আমরা আক্রমণ করলাম, কি বলো?'

'ওকে বলো, দু'মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি।'

'দুই মিনিটেই হয়ে যাবে?' বিস্মিত হবার ভান করল ফ্রেড। 'না না, অত

তাড়াহুড়ো করে মজা নষ্ট করার কি দরকার? ধীরে সুস্থে দশ মিনিটে কাজ সেরে এসো।' করিডরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে।

'অভদ্র, ছোটলোক কোথাকার! তুমি যাবে?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওনা হয়ে গেল ফ্রেড।

'দরজা খুলে আবার ঢুকল রানা ভেতরে। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সুফিয়া। রাগে দুই চোখে টলমল করছে দুফোঁটা পানি।

'ওটা একটা জঘন্য ইতর। এত খারাপ লোক জীবনে দেখিনি আমি।'

'ওর কথায় কান দিয়ো না,' বলল রানা।

'সব কিছুকেই ও সস্তা, নীচ, অশ্লীল চোখে দেখে। তোমাকেও শুনলাম ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল। কেন?'

'ও কিছু না। ওর ধারণা আগে কোথাও দেখেছে আমাকে, কিন্তু মনে করতে পারছে না। ওর বিশ্বাস, মিথ্যে পরিচয়ে কাতাঙ্গা আর্মিতে ঢুকেছি আমি, আসলে আমি নাকি মুসলিম।'

'ওর ধারণা কি মিথ্যে ?' একরাশ কৌতূহল সুফিয়ার চোখে।

ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল রানা আধ মিনিট, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'না, মিথ্যে নয়।' এগিয়ে এসে সুফিয়ার কাঁধে একটা হাত রাখল, 'কিন্তু একথা জানাজানি হয়ে গেলে কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে আমার।'

'তুমি মুসলমান ?' রানা মাথা ঝাঁকাতেই জিজ্ঞেস করল , 'মিথ্যে পরিচয় দিয়েছ কেন?'

'কারণ আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এর বেশি কিছুই বলতে পারব না তোমাকে।'

'আমাকে বিশ্বাস করে যতটা বলেছ, সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। ধন্যবাদ, লুইস।'

বেরিয়ে এল রানা কামরা থেকে। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোল করিডর ধরে।

তেরো

সন্ধ্যার আগেই রওনা হলো ওরা। আকাশে বিকেল থেকে মেঘ দেখা দিয়েছে।

সবার আগে চলেছে রানা, মাঝে জো আর একেবারে শেষে রয়েছে ফ্রেড। লেভেল ক্রসিংটা পার হতেই অন্ধকার নেমে এল। একটা দুটো করে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। নিকষ কালো অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা ডাল ভেঙে ওটাকে এক হাতে নিয়ে রেল লাইন ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোচ্ছে রানা অন্ধের মত। এছাড়া দিক ঠিক রাখার কোন উপায় নেই। সবাই সামনের জনের কাঁধে

হাত রেখে এগিয়ে যাচ্ছে একটা বিশাল আকারের কেন্নো পোকার মত।

রাস্তাটা পার হয়েই টের পেল রানা, খাড়াই বেয়ে লুফিরা পাহাড়ে উঠছে ওরা এবার। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চলতে হচ্ছে ওদের এখন।

পিছনে কে একজন কথা বলে উঠতেই ধমকে তাকে থামিয়ে দিল জো। চুপচাপ উঠছে ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে।

হঠাৎ করেই বৃষ্টিটা থেমে গেল। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে একটু বিশ্রাম দেবে রানা সবাইকে। ওখান থেকে শহরের বাতিগুলোও দেখা যাবে। খুব সাবধানে এগুচ্ছে ওরা। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় চারদিকে আশ্চর্য নীরবতা নেমে এসেছে। পেছনের লোকটার শ্বাস ফেলার শব্দও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। একটা গেছো ব্যাঙ ডেকে উঠল। মনে হচ্ছে যেন ঝর ঝর করে ছোট ছোট স্টীল বল ফেলা হচ্ছে কাঁচের গ্লাসে। অদ্ভুত মিষ্টি লাগছে শুনতে।

খুব সতর্ক রয়েছে রানা। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলেই কান আর নাক আরও সজাগ হয়ে উঠেছে ওর। চলার পথে জংলী ফুলের মিষ্টি সুবাস, পচে যাওয়া গাছ-গাছড়ার ভারি গন্ধ, সবই তীক্ষ্ণ ভাবে উপলব্ধি করছে সে। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কেন যেন মনে হলো ওর, সামনে বিপদ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় পিছনের লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর উপর। টাল সামলে নিল রানা। একে একে সবাই সামনের জনের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে দাঁড়াল। একটু বিশৃঙ্খলার গুঞ্জন উঠেই থেমে গেল। সবাই অপেক্ষা করছে নীরবে।

সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে রানা। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে রেখেছে। ট্রিগারে তর্জনী। কিছু একটা আছে ওখানটায়, স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে সে।

ঢিব ঢিব শব্দ হচ্ছে বুকের ভেতর। অজানা আশঙ্কা। একটা মেশিন গান পোস্ট যদি বসিয়ে থাকে ওখানে ফ্রস্ট, কচুকাটা হয়ে যাবে ওরা সবাই। সাবধানে ঘুরে পেছনের লোকটার মাথা হাতড়ে বার করল সে। মাথাটা মুখের কাছে টেনে এনে কানেকানে বলল, 'পেছনের জনকে শুয়ে পড়তে বলেই চুপচাপ নিজেও শুয়ে পড়ো।' কানে কানে পৌঁছে গেল খবরটা সবার কাছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরেট অন্ধকারের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে রানা। পেছনের লোকটা পায়ের গোড়ালিতে টোকা দিল—অর্থাৎ সবাই শুয়ে পড়েছে। বেল্ট থেকে হ্যাণ্ড গ্রেনেড খুলে নিল রানা। আর অপেক্ষা নয়, এগিয়ে দেখতে হবে। পিন খুলে বুক পকেটে রাখল। খুব সাবধানে ক্রল করে আগে বাড়ছে সে । মাঝে মাঝে হাত দিয়ে রেল লাইন স্পর্শ করে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ঠিক দিকে এগুচ্ছে কিনা। দশ গজ এগিয়েই অস্পষ্ট শব্দটা কানে এল রানার। দুটো ছোট্ট নুড়ি নড়ে ওঠার শব্দ। ভয়ে দম আটকে এল ওর। সাবধানে উঠে বসল।

সর্বনাশ ! একেবারে ওদের মধ্যে এসে পড়েছি! ভাবছে রানা। এখন ওরা গুলি

আরম্ভ করলেই সব খেলা শেষ। এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি করে গ্রেনেড ধরা হাতটা ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে ওপরে তুলল সে। দ্রুত চিন্তা চলেছে মাথার মধ্যে। ছুঁড়ে দিয়েই শুয়ে পড়তে হবে। পাঁচ সেকেণ্ডের ফিউজ। অনেক লম্বা সময়, গ্রেনেড পড়ার শব্দেই সজাগ হয়ে গুলি আরম্ভ করবে ওরা।

নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। প্রস্তুত। মাথার ওপর হাতটা পিছিয়ে নিল আর একটু।

ঠিক সেই মুহূর্তে অর্ধেক আকাশ জুড়ে কিলবিল করে জ্যান্ত হয়ে উঠল বিদ্যুৎ চমক। সেই আলোয় দেখতে পেল রানা পরিষ্কার। সোনালীর ওপর কালো ছোপ কাটা প্রকাণ্ড একটা চিতাবাঘের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে। ঠিক দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে ওকে চিতাবাঘটা। যতক্ষণ দেখা গেল চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন। এক সেকেণ্ড, তারপরেই চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়েই লাফ দিল চিতাটা। বাম হাতে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরার চেষ্টা করল রানা, যদিও জানে, ডান হাতে ধরা গ্রেনেডের জন্যে ট্রিগার টিপতে পারবে না সে। রক্ষা নেই আর।

কিন্তু এ কী ! নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না রানা, যখন শুনল ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে সড়সড় আওয়াজ তুলে চোখের নিমেষে গভীর বনের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে বাঘটা।

অন্ধকারেই দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। ভয় পেয়েছে বাঘটা···হয়তো ভাবছে. বড় বাঁচা বেঁচে গেছে এ যাত্রা!

'কি হলো, বস্?' জো-র উদ্বিগ্ন গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'ঘাপটি মেরে বসেছিল ব্যাটা···লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল জঙ্গলে।'

স্বস্তির একটা গুঞ্জন উঠল। উঠে দাঁড়াল সবাই। বুক পকেট থেকে পিন বের করে গ্রেনেডে ঢুকিয়ে দিল রানা।

ডালটা হাতে তুলে নিয়ে আবার আগের মত এগিয়ে চলল সে, পিছুপিছু আর সবাই। একটা ফাঁড়া ভালয় ভালয় কেটেছে, চলতে চলতে ভাবল রানা—আজ রাতটা ভোর হওয়ার আগেই আরও অনেক ফাঁড়া আসবে, সেগুলোও কাটবে কিনা কে জানে!

লুফিরা পাহাড়ের চূড়ার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে। পেছনের লোকটা খামচে ধরে রেখেছে রানার কাঁধ। সবার মধ্যেই কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে, স্পষ্ট টের পাচ্ছে রানা। চূড়াটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপাশের মেঘে কেমন যেন একটা কমলা রং ধরেছে। অন্ধকার কিছুটা কেটেছে মনে হচ্ছে। কমলা আভাটা একবার বাড়ছে আবার কমে যাচ্ছে লক্ষ করল সে।

শেষ আধ মাইল ওই কমলা আভাটার কথা ভাবতে ভাবতেই উপরে উঠল

রানা। আরও সামনের দিকে ঝুঁকে চলতে হচ্ছে এখন ওদের। এই জায়গাটা বেশি খাড়া। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে নিচের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল রানা ওই কমলা আভার কারণ। দাউ দাউ করে জলছে অনেকগুলো ঘর। জ্বালিয়ে দিচ্ছে ওরা পোর্ট রিপ্রিভ।

রেলওয়ের বাড়িগুলোতেও আগুন জ্বলছে। চট করে মিশনটার দিকে নজর ফেলল রানা। না; ওখানে কোন আগুন বা বাতি নজরে পড়ছে না, একটু আশ্বস্ত হলো সে।

পেছনের লোকটার দিকে ফিরে রানা বলল, 'আমরা এখানে বিশ্রাম নেব, কিন্তু সিগারেট খাওয়া বা কথা বলা চলবে না। সবাইকে জানিয়ে দাও।' একে একে সবার কানেই পৌঁছল রানার আদেশ। সবাই শব্দ না করে সাবধানে নিজের নিজের বোঝা নামিয়ে রেখে মাটিতে সুবিধা মত জায়গা করে নিয়ে বসে পড়ল। কাঁধে ঝুলানো খাপ থেকে বিনকিউলার বের করে চোখে লাগাল রানা। ফোকাসের নবটা একটু ঘুরাতেই পরিষ্কার হয়ে এল সব। একলাফে একেবারে কাছে চলে এসেছে শহরটা। রাস্তার ওপর মানুষগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেকের হাতেই বোতল। এতদূর থেকেও লক্ষ করল রানা এলোমেলো পড়ছে অনেকের পা। ওরা কত জন আন্দাজ করার চেষ্টা করল সে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বুঝতে পারল কাজটা অসম্ভব। বাড়ি বাড়ি লুটপাট করে বেড়াচ্ছে ওরা। একদল ঢুকছে, কয়েকজন থেকে যাচ্ছে, কয়েকজন বেরিয়ে এসে যোগ দিচ্ছে অন্য দলের সাথে। এদের কয়েকজন আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অন্য আরেক বাড়িতে। একই লোককে দু'তিনবার গুনে হাল ছেড়ে দিল রানা।

জো এসে দাঁড়াল রানার পাশে। 'খুব ফুর্তি করছে ওরা, তাই না, বস্?'

'হ্যাঁ, খুবই,' নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। মনে মনে বলল, দাঁড়াও, আসছি! চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ফিরল জো-র দিকে। সমস্ত মালপত্র সহ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'একটু বিশ্রাম নেবে না তুমি?'

পিঠ থেকে একটা গোলাগুলির বাক্স নামিয়ে মাটিতে রাখল জো যত্ন করে। 'হ্যাঁ, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে,' বিরাট পাছাটা মস্ত বাক্সটার ওপর সাবধানে রেখে বসল সে।

'সকালে যাদের হারিয়েছি আমরা তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল জো।

আবার হাতে তুলে নিয়ে বিনকিউলার স্টেশনের দিকে ফোকাস করল রানা। 'বগিটা ওখানেই রয়েছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছু।' রানিং কমেন্ট্রি দিচ্ছে রানা। হঠাৎ স্টেশনের কাছে একটা জ্বলন্ত ঘরের ছাদ ধসে পড়ল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। বেশ আলো হয়েছে চারপাশে। 'হ্যাঁ, এখন স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে লাশগুলো।'

'মেয়েদেরও মেরে ফেলছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল জো।

অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে বলল রানা, 'মনে হয় না। ওখানে কোন মেয়ের লাশ নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

'জানা কথাই। মেয়েদের ওরা হোটেলে নিয়ে যাবে। একের পর এক···উহ্, ভাবা যায় না। সকাল পর্যন্ত টিকে থাকবে না একজনও।' পায়ের কাছে থুথু ফেলল জো, 'কি করব এখন আমরা?'

জবাব না দিয়ে ফোকাস নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোটা শহরটা একবার ভাল করে দেখে নিল রানা। আজ সকালে পালাবার সময়ে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক কামানটাকে যেখানে দেখে গিয়েছিল, ঠিক সেখানেই রয়েছে ওটা এখনও। হোটেলের একটু দূরে রাস্তার মাঝখানে পার্ক করা হয়েছে বাকি ট্রাকগুলো। উজ্জ্বল হলুদ-লালে রাঙানো গাড়িটাও দেখা যাচ্ছে ওখানে। ওটা ভরা থাকলেই হয়—অনেক তেল লাগবে ওদের এলিজাবেথভিল পৌঁছতে।

'জো, সবাইকে জানিয়ে দিয়ো ওই ট্যাঙ্কারে যেন গুলি না লাগে। ওটাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ওটা ফুটো হলে হেঁটে ফেরা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকবে না।'

'ঠিক আছে, ওদের আমি বলে দেব। কিন্তু কথাটা সুফতাদের জানিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। ওই ব্যাটারা যখন গুলি আরম্ভ করবে, সব গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না। গুলি কোন দিকে যাচ্ছে বা কোথায় লাগছে সেটা আসল কথা নয় ওদের কাছে, কে কত গুলি করল সেটাই বড় কথা।'

'নিচে নেমে আমরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাব। তুমি আর আমি দশজনকে নিয়ে ঘুরে ওই ডোবাগুলোর পাশ দিয়ে ঢুকব শহরে।' ফ্রেডকে ডাকতে পাঠাল রানা একজনকে। অপেক্ষা করল। ফ্রেড স্থির হয়ে বসতেই আবার আরম্ভ করল, 'তোমার এগারোজনকে নিয়ে তুমি বড় রাস্তার মাথায় থাকবে।' আঙুল দিয়ে দেখাল রানা ঠিক কোন জায়গায় থাকতে হবে ফ্রেডকে। 'জো আর আমি ঢুকব ওই দিক দিয়ে।' আবারও আঙুল দিয়ে দেখাল রানা ঠিক কোনদিক দিয়ে ঢুকবে সে। 'তুমি চুপচাপ অপেক্ষা করবে ওখানে আমরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত। আমরা তৈরি হবার আগেই যদি তোমরা গোলাগুলি আরম্ভ করো তাহলে কচু-কাটা হয়ে যাব সবাই; ওই লরিগুলোর আর দরকার পড়বে না। বুঝেছ?'

'আমাকে বলতে হবে না, কি করতে হবে সেটা আমার জানাই আছে,' বুক ফুলিয়ে বলল ফ্রেড।

'জানা থাকলেই ভাল। আমরা ঠিক ভোর চারটের সময়ে হামলা করব। ঠিক আলো ফোটার আগে। জো আর আমি গ্রেনেড মারব হোটেলে। বেশির ভাগ লোকই হোটেলে থাকবে আশা করা যায়। যারা বাঁচবে, বোমার ভয়ে রাস্তায়

বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। ওরা রাস্তায় বেরুলেই শুরু হবে তোমার কাজ। বুঝেছ?'

'পানির মত,' অবজ্ঞার সাথে বলল ফ্রেড।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সারতে না পারলে আমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে। কারণ সংখ্যায় ওরা আমাদের তিনগুণ বেশি।' একটু থামল রানা, 'ওদের ঘুমের ঘোর কাটার আগেই কাজ সারতে হবে আমাদের।'

ঠিক সাড়ে এগারোটায় নিচে নামতে শুরু করল ওরা। রাস্তায় এখন আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আগুনও অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছে। ইচ্ছে করেই এই সময়টা বেছে নিয়েছে রানা। এখন ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক কম।

একটা লম্বা লাইন করে নিচে নামছে ওরা। অনেকদূর নেমে এসে দাঁড়াল রানা। 'এখান থেকেই আমরা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে যাব। সবাই মনে রেখো, আমাদের গ্রেনেড ফাটার আগে গুলি ছুঁড়বে না তোমরা কেউ।' শেষ বারের মত সাবধান করে দিল সে ফ্রেডের দলকে।

'আমার দিক আমি সামলাব, তোমার দিক তুমি সামলাও। অতবার করে আমাকে বলতে হবে না।' বারবার সাবধান করায় অসন্তুষ্ট হয়েছে ফ্রেড।

'গুডলাক!' বলল রানা। ফ্রেড তার লোকজন নিয়ে ডাইনে বড় রাস্তার দিকে এগুলো। রানা আর জো রওনা হলো বামদিকের ডোবাগুলোর দিকে।

জলার ধারে এসে গেছে ওরা। 'দেরি করে লাভ নেই,' নিচু গলায় বলল রানা জো-কে। রানাই প্রথমে নামল। ওর পেছন পেছন একে একে নেমে গেল সবাই ডোবার নোংরা জলে। প্যাচ-প্যাচে কাদার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। দু'এক জায়গায় কোমর পর্যন্ত পানি। ঠিক মাঝামাঝি এসে বগল ভিজল ওদের। সোয়াম্প গ্যাসের তীব্র দুর্গন্ধে ঝাঁঝ লাগছে নাকে। এক ঝাঁক মশা বন বন করে ঘুরছে রানার মাথার চারপাশে। মাঝে মাঝেই চোখে মুখে বাড়ি খাচ্ছে ওগুলো, ফুটো দিয়ে ঢুকতে চাইছে নাকে। জলার প্যাপাইরাস ঘাস পা জড়িয়ে ধরতে চায়। পুরো একঘণ্টা সময় লাগল ওদের অর্ধেক পথ আসতে।

বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একটু দাঁড়াল রানা।

'একটা সিগারেট ধরাতে পারলে ভাল হত, বস্,' পাশ থেকে বলে উঠল জো।

'হ্যাঁ সিগারেটের নেশা আমাকেও পেয়েছে, কিন্তু উপায় নেই।' শার্টের হাতায় মুখ মুছল রানা। কপাল আর চোখের চারপাশ ভয়ানক জ্বলছে, মনের সুখে রক্ত চুষেছে মশার ঝাঁক।

'পেটের দায়ে কত কিছুই না করতে হয় মানুষকে!' বিড়বিড় করে অনুযোগ করল জো।

'কপাল ভাল থাকলে এসব করেও মানুষ বাঁচে,' জবাব দিল রানা। 'ভোরের

আগে অনেকের কপালেই ঘটে যাবে চরম ঘটনা।'

তা ঘটুক, কিন্তু এখন এই বর্তমান অসুবিধেগুলোই দারুণ ব্যস্ত রেখেছে। ভোরের আক্রমণ সম্বন্ধে চিন্তারই অবকাশ পাচ্ছে না কেউ। মশা, ঘাস, পোকা, জোঁক, কাদা আর দুর্গন্ধ ওদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। দম ফেলার ফুরসত দিচ্ছে না।

'চলো, এবার পাড়ে ওঠা যাক,' নিচু গলায় বলল রানা, 'খুব সাবধান! তোমার লোকজনকে টুঁ শব্দ করতে বারণ করে দাও।'

পাড়ের দিকে এগুলো ওরা। হাঁটু পানিতে এসে চলতে গিয়ে একটু বেশি আওয়াজ হচ্ছে। নিজেরাই বিরক্ত হচ্ছে ওরা, কিন্তু শব্দ এড়াতে পারছে না।

দুটো বেজে গেল পৌঁছুতে। সবাইকে আড়ালে থাকতে বলে সামনে এগিয়ে চারপাশটা দেখে নিল রানা। না, এদিকে ওদের কোন পোস্ট নেই।

দু'জন দু'জন করে পাঁচটা ছোট দল বানাল রানা। আফ্রিকান লোকদের রাতে কোন কাজ করতে দিতে নেই, সাহস হারিয়ে ফেলে ওরা, প্রেতাত্মাদের চলা ফেরার সময় যে ওটা।

সবাইকে ভালমত নির্দেশ দিয়ে শহরে ঢুকিয়ে দিল রানা। নির্দেশ রইল, গ্রেনেড ফাটার পরে সুফতা দেখলেই গুলি চালাবে। মারতে হবে সবাইকে। রাস্তার সবাইকে মারার পর প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে গ্রেনেড মেরে অপেক্ষা করে দেখতে হবে কেউ বেরোয় কিনা।

তিনটে বাজে। ঘড়ি দেখল রানা। নয় ঘণ্টা হয় ওরা ট্রেন থেকে রওনা হয়েছে। ঘুমানোর সুযোগ না পেয়ে চোখ দুটো একটু কচকচ করছে। গায়ে সামান্য ব্যথা। তবু ক্লান্ত নয় সে। মাথাটা ঠিকই সতেজভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

হোটেলটার কাছেই একটা খালি বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে জো আর রানা। দু'জনে মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে চারটে বাজার। সুফিয়ার মিনতি ভরা চোখ দুটো মনে পড়ে গেল রানার। আপন মনেই হাসল। আজ বিকেলে জোর তর্ক শুনেছে সে ভাই-বোনের—বাংলা ভাষায়। জামিলের ধারণা ক্যাপ্টেন লুইসকেই বিয়ে করা উচিত সুফিয়ার, এত ভাল মানুষ নাকি আর পাবে না সে। সুফিয়া ওর হিরোকে নিয়ে টিটকারি মারায় রেগে কাঁই হয়ে গেছে জামিল। ওকে চিতা বাঘের গল্প কি ভাবে বলবে মনে মনে সাজাল রানা। শুনে সুফিয়ার মুখের চেহারা কেমন হবে কল্পনা করার চেষ্টা করল। সিদ্ধান্ত নিল, মেয়েটার দুর্বলতার কোন সুযোগ সে নেবে না।

কিন্তু···ফ্রেডের ব্যাপারটা ক্রমেই ভাবিয়ে তুলছে ওকে।

ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে চারটে।

'উঠে পড়ো, জো। চলো একবার ঘুরে দেখে নিতে হবে অবস্থাটা।'

ছায়ার অন্ধকারে যতটা সম্ভব লুকিয়ে বাড়িগুলোর ধার ঘেঁষে দ্রুত এগিয়ে

চলেছে দু'জন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে দু'জনেই। হোটেলে পৌঁছে দেখল কোন বাতি নেই জানালায়। মনে হয় ভেতরে কেউ নেই। চোখ পড়ল রানার বারান্দায় শোয়া মানুষগুলোর ওপর। জো-র পেটে খোঁচা দিয়ে ওদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে ইঙ্গিতে।

'দশ পনেরো জন হবে,' ফিসফিস করে বলল জো।

'অন্যরা সম্ভবত ভেতরে।' ঘুরে পেছন দিকে চলে এল ওরা। 'মেয়েগুলো কোথায় আছে জানতে পারলে ভাল হত,' বলল রানা।

'বেহেস্তে। ওরা অনেক আগেই মরে গেছে, বস্।' কোণাটা ঘুরেই নরম কিছুর সাথে হোঁচট খেল জো।

'ক্যাপ্টেন!' চাপা গলায় ডাকল সে রানাকে।

চট্ করে টর্চ জ্বালল রানা। হুড লাগানো টর্চ, একফুট বৃত্ত রচনা করল মোলায়েম আলো।

দেয়ালের কাছে ধুলোর ওপর শুয়েছিল লোকটা। জো মাড়িয়ে দিয়েছে ওকে। বিড় বিড় করতে করতে উঠে বসল লোকটা, তারপরেই দারুণ ভাবে কাশতে আরম্ভ করল। ডান হাতে বোতলটা তখনও ধরা। পাশেই পড়ে আছে রাইফেল। গাল দিতে দিতে বাম হাতটা দিয়ে মুখ মুছে নিল। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে জো। রানা সাহায্য করার আগেই লাথি দিয়ে চিৎ করে শুইয়ে একটা পা তুলে দিল সে লোকটার বুকের ওপর, পরমুহূর্তে বেয়োনেটটা আমূল বসিয়ে দিল ওর গলায়।

শরীরটা শক্ত হয়ে গেল প্রথমে, দু'বার খিঁচুনি দিল হাত পা, তারপর নরম হয়ে এলিয়ে পড়ল। ফর্‌র্‌র্‌র্ শব্দ তুলে কিছুটা বাতাস বেরিয়ে এল কেটে যাওয়া শ্বাসনালী দিয়ে। বেয়োনেটটা বের করে পা নামিয়ে নিল জো ওর বুকের ওপর থেকে।

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ওরা এযাত্রা। পড়ে আছে লোকটা। চোখ দুটোতে অবাক বিস্ময়। বোতলটা এখনও হাতে ধরা। বুকটা খোলা, প্যান্টের বোতামগুলোও খোলা। প্যান্টের ওই এলাকায় শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে রক্ত। কিন্তু ওর নিজের রক্ত নয়, পরিষ্কার বুঝল রানা।

পেছন দিক থেকে রান্নাঘর পেরিয়ে এগিয়ে গেল ওরা বাররুমের দিকে। জানালা দিয়ে দেখেছে, রান্নাঘরে কেউ নেই। এনামেল টাইলগুলো চকচক করছে। টেবিল আর বেসিনের ওপর অজস্র এঁটো থালাবাসনের স্তূপ। জো-কে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বাররুমের জানালা গলে ভেতরে ঢুকল রানা। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে কাউন্টারের ওপর। একদল কুকুরের মত কুঁকড়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে লোকগুলো। কে একজন বমি করেছে, সাদা দেওয়ালে হলুদ দাগ দেখা যাচ্ছে। ঘরের বাতাসে ঘামের দুর্গন্ধ। উঁকি দিয়ে লাউঞ্জটা একবার দেখে নিয়ে ফিরে এল সে জানালার ধারে।

'দাঁড়াও এখানে,' জো-র কানে কানে বলল রানা, 'আমি ভেতরটা একবার দেখে নিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছি। বারান্দায় প্রথম; পরে লাউঞ্জে গ্রেনেড মারব আমি। প্রথম গ্রেনেডের আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তুমি। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নেড়ে সায় দিল জো। বুঝেছে তাকে কি করতে হবে। রাইফেলটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে দু'হাতে দুটো গ্রেনেড নিয়ে তৈরি হলো সে।

দ্রুত পায়ে লাউঞ্জে এসে ঢুকল রানা। এখানেও বাররুমের মতই অবস্থা। জনা বিশেক লোক ঘুমাচ্ছে মেঝের ওপর। খোলা দরজা দিয়ে বারের আলোটা ক্ষীণভাবে এসে পড়েছে লাউঞ্জে। বারান্দার দিকে এগোতে গিয়েও দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল রানা। সিঁড়ির ধারে পাশাপাশি শোয়ানো রয়েছে চারটে নগ্ন নারী দেহ। পা টিপে এগিয়ে গেল সে। ভাল করে লক্ষ করে দেখল ওদের কারোই শ্বাস চলছে না। ছুঁয়ে দেখল—ঠাণ্ডা। কি অকথ্য নির্যাতনে মৃত্যু ঘটেছে ওদের ভাবতে গিয়ে মাথায় রক্ত উঠে গেল রানার। যারা এর জন্যে দায়ী তাদের প্রতি কোন রকম অনুকম্পা বা করুণার স্থান নেই ওর মনের মধ্যে। দরজার পাশে চলে এল সে নিঃশব্দে। রাইফেলটা বাম কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হ্যাভারস্যাক থেকে দুটো গ্রেনেড বের করে পিন খুলেই গড়িয়ে দিল বারান্দার কোণে শোয়া লোকগুলোর দিকে। তাড়াতাড়ি দুই পা পিছিয়ে দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। ওর হাতে আরও দুটো গ্রেনেড। পিন খুলে ও দুটোকে লাউঞ্জের মধ্যে গড়িয়ে দিয়েই একলাফে জানালা টপকে নেমে পড়ল রাস্তার দিকের লনে।

বিকট আওয়াজ করে ফাটল প্রথম গ্রেনেড দুটো, তার তিন সেকেণ্ডের মধ্যে ফাটল দ্বিতীয় জোড়া। আরও দুটো গ্রেনেড চলে এসেছে রানার হাতে। দাঁত দিয়ে কামড়ে পিন খসিয়েই ছুঁড়ে দিল জানালা পথে লাউঞ্জের ভেতর।

বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজে ঝনঝন করে গোটা বাড়ির জানালার কাঁচগুলো চুর হয়ে পড়ে গেছে। দুই-তিন সেকেণ্ডের ব্যবধানে আরও ছ'টা গ্রেনেড ফাটার আওয়াজ পাওয়া গেল। দুটো বাররুমে, দুটো লাউঞ্জে, আবার দুটো বাররুমে। চিৎকার আর গোঙানীর আওয়াজ আসছে চারদিক থেকে। জো-র দিক থেকে আরও দুটো গ্রেনেড ফাটার শব্দ পেল রানা।

দু'হাতে চোখ ঢেকে এলোমেলো পা ফেলে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে একটা লোক। আঙুলের ফাঁক গলে টপটপ করে তাজা রক্ত পড়ছে বারান্দায়। খানিকটা সরে এসে খুব কাছে থেকে গুলি করল ওকে রানা। এত কাছে থেকে যে, রাইফেলের মাথার আগুনের ফুলকি লোকটার বুক স্পর্শ করল। ছিটকে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চিৎপাত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল লোকটা মাটিতে।

লাফিয়ে বারান্দায় উঠে এল রানা। এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল ওর আশপাশ দিয়ে। রানাকে সুফতা মনে করে গুলি করেছে ওদেরই লোক। দরজার পাশ থেকে

উঁকি দিয়ে দেখল, ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে লাউঞ্জ।

একটা লোককে আবছা মত দেখা গেল সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে। সই না করেই কোমরে বাঁট ঠেকিয়ে বাম হাতে গুলি চালাল রানা। লাগল না গুলিটা। চিৎকার করে দৌড়ে আবার উপরে উঠে গেল লোকটা।

হ্যাভারস্যাক থেকে একটা গ্রেনেড বের করে পিন খুলেই ছুঁড়ে মারল রানা দেয়ালে। সিঁড়িটা যেখানে ঘুরে উপর দিকে উঠে গেছে সেই দেয়ালে ঠোকর খেয়ে দোতলায় অদৃশ্য হলো গ্রেনেডটা। বন্ধ জায়গায় প্রচণ্ড শব্দ হলো। বিস্ফোরণের হলকায় পরিষ্কার দেখা গেল, ছিন্নভিন্ন দেহটা রেলিং টপকে উড়ে এসে নিচে পড়ছে।

কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে এল রানা। বেডরুমের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে সে। উলঙ্গ এক লোক টলতে টলতে বেরিয়ে এল একটা দরজা দিয়ে। পেটে গুলি খেয়ে দরজার গোড়াতেই পড়ল। হাতে দুটো গ্রেনেড। স্কাই লাইট দিয়ে দুটোকে ঢুকিয়ে দিল রানা দ্বিতীয় আর তৃতীয় কামরায়। চতুর্থ ঘরের দরজা লাথি মেরে খুলে রাইফেল বাগিয়ে ধরল। কানে তালা ধরিয়ে দিল প্রচণ্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণ।

লোকটা ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে। খুব সম্ভব অফিসার হবে। হাতে পিস্তল। দু'জনেই এক সাথে গুলি করল। হেলমেটে লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল গুলিটা রানার মাথাটাকে ভীষণ জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে। টলে পড়ল রানা পাশের দেয়ালের উপর। পড়েই আবার গুলি করল। দ্রুত গুলি চালাচ্ছে রানা। এক একটা গুলি লক্ষ্য ভেদ করছে আর মনে হচ্ছে কেউ যেন পুতুল নাচ নাচাচ্ছে লোকটাকে। পুতুল নাচের ভঙ্গিতেই নড়ছে ওর ক্ষতবিক্ষত দেহটা। শেষ গুলিটা ভেদ করল হৃৎপিণ্ড। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা মেঝেতে। ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মশা উড়ছে ওর কানের চারপাশে।

উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন পাল্টে নিল। সিঁড়ির মাথায় আর একজনকে দেখা যাচ্ছে। রাইফেল তুলল রানা।

'গুলি করবেন না, বস্!' জো-র ভারি গলার চিৎকার কানে এল রানার। কপাল ভাল জো-র, আর একটু হলেই দিয়েছিল ওকে সাবাড় করে।

'আর আছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, সবক'টা খতম।'

'মোট কতজন হবে?'

'জনা চল্লিশ কি পঞ্চাশেক।'

'তাহলে তো আরও রয়েছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে আর নেই।'

'চলো ওদের সাহায্য করি গিয়ে।'

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ওরা দু'জন।

একজন হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে। জো-র গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ওখানেই। ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ঘরময়। কয়েকটার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে মল বেরিয়ে এসেছে, দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায়।

জো রওনা দিয়েছে সদর দরজার দিকে। খপ করে ধরে ফেলল ওকে রানা, 'করছ কি? ওদিক দিয়ে বেরোলে ঝাঁঝরা করে ফেলবে তোমাকে ফ্রেড। ওদের কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মনে নেই?'

'ওহ্, একদম ভুলে গেছিলাম, বস্!'

ভাঙা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা হোটেলের পেছনদিকে।

'ওই যে আমাদের লোকজন আসছে,' আঙুল তুলে দেখাল জো একটা কোণ ঘুরেই। যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী পুরো অ্যাকশনে এগোচ্ছে ওরা। সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে পাঁচ সেকেণ্ড দৌড় দিচ্ছে, থামছে, গুলি করছে বা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারছে, আবার এগিয়ে আসছে ক্ষিপ্র বেগে, থামছে, গুলি করছে।

অন্য মাথা থেকে ফ্রেডরাও এগিয়ে আসছে। একই স্টাইলে হঠাৎ থেমে হঠাৎ দৌড়াচ্ছে ওরাও। সবার আগে রয়েছে ফ্রেড। এক হাতে কোমরে চেপে ধরেছে সে রাইফেল। যখন গুলি করছে গুলির সাথে সাথে সারা শরীর কাঁপছে ওর ঝাঁকি খাওয়া বড়ই গাছের মত।

ওপাশের দোকান থেকে হঠাৎ একটা সুফতা লাফিয়ে নামল রাস্তায়, আতঙ্কে বিস্ফারিত দুই চোখ। রাস্তায় বেরিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল। কনুই দুটো পিস্টনের মত দ্রুত সামনে-পিছনে চলছে পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে।

গুলি শুরু হলো পেছন থেকে। গুলি খেয়েও পড়ল না সে। এলোপাতাড়ি পা ফেলে বৃত্তাকারে দৌড়েই চলল। হাত দুটো শূন্যে, যেন মৌমাছি তাড়াচ্ছে। শব্দ করে লাগছে বুলেটগুলো ওর গায়ে। কোথায় লাগছে বোঝা যাচ্ছে শার্টের সেই সব জায়গা থেকে ধুলো উড়তে দেখে। রাইফেলটা তুলে নিয়ে লোকটার মাথায় একটা গুলি ঢুকিয়ে দিয়ে দৃশ্যটার অবসান ঘটাল জো।

কিন্তু আরও লোক থাকার কথা, কোথায় লুকিয়ে আছে ওরা? অস্বস্তি বোধ করছে রানা। ওর হিসেব মত আরও অন্তত জনা পনেরো লোক থাকার কথা। গেল কোথায় ওরা?

'ওরা অফিস ঘরে নেই তো?' প্রশ্ন করল জো।

ইউনিয়ন মিনিয়ের অফিস ব্লকগুলোর দিকে চোখ তুলে চাইল রানা, 'রাইট! ঠিক বলেছ, ওখানেই রয়েছে বাকি সবাই।'

চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ফ্রেড! সাবধান! অফিস ব্লক!'

কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। ফ্রেডের কিছুটা পেছনে রয়েছে তিনজন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা অন্ধকার জানালায় আগ্নেয়াস্ত্রের স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। তিনজনই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। স্টেন ব্যবহার করছে কেউ জানালা দিয়ে।

রানা আর জো একসাথে গুলি ছুঁড়ল জানালা লক্ষ্য করে। রাইফেলের পুরো ম্যাগাজিন খালি করল ওরা। চিলতে উড়তে দেখা গেল জানালা থেকে, কিন্তু থামানো গেল না স্টেন গানের গুলি বৃষ্টি।

অবাক হয়ে দেখল রানা গুলি বৃষ্টির মধ্যেই এখনও দৌড়াচ্ছে ফ্রেড। লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান নাকি! ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা গুলিও লাগছে না ওর গায়ে। দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে দেয়ালের আড়ালে চলে এল সে।

'লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা আঁচড়ও না!' গর্বের সাথে জবাব দিল ফ্রেড। রাইফেলের খালি ম্যাগাজিনটা ফেলে দিয়ে আর একটা লাগাল। বলল, 'সরে বসো। দেখি শালাদের দু'একটাকে ঘায়েল করতে পারি কিনা।' মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, দেয়ালের ওপর রাইফেল রেখে জানালা লক্ষ্য করে গুলি আরম্ভ করল ফ্রেড।

'এই ভয়ই করছিলাম আমি,' বলল রানা। চড়া গলায় বলতে হচ্ছে কথা। 'অন্তত পনেরো বিশজন আছে ওখানে। এখন ওদের ওখান থেকে বের করতে কতদিন লাগবে কে জানে!' স্টেশন ইয়ার্ডের সামনে রাস্তার ওপর দাঁড় করানো ট্রাকগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা এখান থেকে। 'ওদের গুলির রেঞ্জে রয়েছে ট্রাকগুলো। ওগুলো সরাতে গেলেই ট্রাক আর ট্যাঙ্কার উড়িয়ে দেবে ওরা গুলি করে।'

আগুনের শিখার আলোছায়া চকচকে ট্যাঙ্কারটার গায়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। খোলা জায়গায় ওটাকে বিরাট আর অরক্ষিত দেখাচ্ছে। শত শত গুলির মধ্যে একটা কোনমতে ওটার গায়ে লাগলেই সব শেষ।

ফ্রেডের দলের বাকি সবাই অফিস ব্লকটার ওই পারে কাভার নিয়েছে। সমানে গুলি চালাচ্ছে ওরা। রানারা এবার হোটেলের জানালায় বসাল রাইফেল।

'জো,' ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'এভাবে হবে না। চারজন লোক নিয়ে আমাদের অফিসের ডান পাশে পৌঁছতে হবে। ওই ওপাশের দালানটা থেকে মাত্র বিশ গজ খোলা জায়গা পেরোতে পারলেই দেয়ালের পেছনে কাভার পাচ্ছি আমরা। ওখান থেকে বাড়ির ভেতর গ্রেনেড ছোঁড়া যাবে। কি বলো?'

'ওই বিশ গজ তো বিশ মাইলের মত দেখাচ্ছে এখান থেকে!' মুখে যাই বলুক, গ্রেনেডের ছালা কাঁধে নিয়ে উঠে পড়ল জো চারজন লোক বাছাই করে আনতে। 'আমি চারজন লোকসহ আপনার জন্যে রান্না ঘরে অপেক্ষা করব।' যাবার সময়ে বলে গেল জো।

'ফ্রেড, শোনো,' ডাকল রানা।

'হ্যাঁ, বলো শুনছি,' জবাব দিল সে।

'আমি ওই বাড়ির কোণে পৌঁছে তোমাকে হাত নেড়ে জানাব ঠিক কখন আমরা দৌড় দেব। তুমি গুলি করে আমাদের কাভার দেবে, ওরা যেন জানালায়

মাথা তুলতে না পারে। বুঝেছ?'

'ঠিক আছে,' বলেই আর এক পশলা গুলি বর্ষণ করল সে।

'লক্ষ্য রেখো, তোমার গুলি না আবার আমাদের গায়ে লাগে। আমরা জানালার একেবারে কাছাকাছি পৌছতে চাই।'

ঘুরে চাইল ফ্রেড রানার দিকে। ওর মুখে বিদ্রূপের হাসি, চোখে শয়তানী। বলল, 'বলা যায় কিছু? হাতের টিপ কি নির্ভুল হয়?'

'ঠাট্টা কোরো না!' বলল রানা।

'কে ঠাট্টা করছে?' মুখে হাসিটা লেগেই আছে। 'ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়ো।' ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আবার গুলিবর্ষণে মনোনিবেশ করল সে।

রান্নাঘরে অপেক্ষা করছে পাঁচজন রানার জন্যে।

'চলো বেরিয়ে পড়ি।' রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সেমিটারী লেন ধরে ওরা পৌছে গেল কাছাকাছি বাড়িটার পেছনে। ইউনিয়ন মিনিয়ের অফিস থেকে এ বাড়ির দূরত্বটা মনে মনে মেপে নিয়ে ঘোষণা করল রানা, 'বেশি দূর না।'

সবাই খুব কাছাকাছি গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি থাকলে সাহস বাড়ে।

'মাত্র একটা জানালা খোলা রয়েছে এদিকটায়,' মন্তব্য করল রানা।

'একটাই যথেষ্ট, বস্, আর কয়টা চাই?'

'মনে রেখো, জো, মাত্র একবারই মরার সুযোগ পাবে তুমি।'

'সুযোগটা হেলায় হারাতে পারলে ভাল হত। যাকগে, অত কথার দরকার নেই, বস্। বেশি কথা বললে আমার আবার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

দালানটার কোণে এসে দাঁড়াল রানা। হাত নাড়ল সে হোটেলের উদ্দেশে। মনে হলো ওদিক থেকেও একটা হাত নড়ে উঠল যেন। শুরু হলো গুলি।

লম্বা করে একটা দম নিল সে। 'দৌড়াও!' নির্দেশ দিয়েই ছুটল রানা সামনের দিকে খোলা জায়গার উপর দিয়ে। পথটা অনেক লম্বা মনে হচ্ছে। কালো জানালাটা যেন মড়ার খুলির চক্ষুহীন কোটর—মৃত্যু গহ্বর। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে সবাই। আর মাত্র দশ কদম যেতে পারলেই হয়। কিন্তু···ফ্রেড কি করছে? ওদেরকে কাভার দেওয়ার জন্যে গুলি ছুঁড়ছে না কেন ফ্রেড? আহত হয়নি তো? মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেছে গুলি।

চেঁচিয়ে উঠল কেউ বাড়ির ভেতর। খুব সম্ভব দেখতে পেয়েছে ওদের। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে রানা। চিৎকার করে উঠল, 'শুয়ে পড়ো, জো! দেখে ফেলেছে! শুয়ে পড়ো!'

মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রল করে এগোচ্ছে রানা। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে কড় কড় শব্দে গর্জে উঠবে স্টেনগান ওদের লক্ষ্য করে।

হঠাৎ উজ্জ্বল আলো দেখা গেল জানালা দিয়ে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। জানালার কাঁচগুলো ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। কান ফাটানো শব্দটা কিসের? ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ভেতরে।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'কেউ গ্রেনেড মেরেছে ওখানে!' অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে ওর গলায়।

সোজা গিয়ে পড়ল রানা ডান পাশের দরজাটার ওপর। ওর কাঁধের ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ওরা ভেতরে। ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে গুলি চালাচ্ছে ওরা। কুঁজো হয়ে সামনে ঝুঁকে এগোচ্ছে। কিছু কোথাও নড়লেই দুম।

অন্ধকারে সাদা লম্বা কি যেন দেখা যাচ্ছে মাটিতে। কাছে গেল রানা সাবধানে। 'বব!' টর্চ জ্বেলেই চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'বব ফাটিয়েছ গ্রেনেড!' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে ওর পাশে।

চোদ্দ

কংক্রিট ফ্লোরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে বব। বেঁচে আছে এখনও। জেগে আছে। পেটের ভেতর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে জীবনীশক্তি।

মারা যাচ্ছে সে, জানে; কিন্তু মস্তিষ্কটা এখনও সজাগ। আগুনের আভাস দেখেছে সে আগেই। ভোর রাতের দিকে আচমকা গ্রেনেডের শব্দে প্রথমে ওর মনে হলো সুফতা বাহিনীর ধ্বংসলীলা চলছে। কিন্তু একই জায়গায় এতগুলো গ্রেনেড ফাটছে কেন? নিজেদের মধ্যে ওদের গোলমাল লেগে গেল না তো? মাঝে মাঝে এক-আধটা রাইফেলের আওয়াজ কানে আসতেই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হলো ওর। যুদ্ধ বেধে গেছে ফ্রস্ট-বাহিনীতে নিজেদের মধ্যে। পর মুহূর্তে একটা কথা মনে হতেই চমকে উঠল বব। ক্যাপ্টেন লুইস নয় তো? ওকে উদ্ধার করতে এসেছে ক্যাপ্টেন লুইস পেগান; ওর প্রিয় ক্যাপ্টেন? মনটা খারাপ হয়ে গেল ববের। কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের ছাতে বিশালদেহী আফ্রিকান জো-র পাশে নিরুপায় ক্যাপ্টেন, ঝড়ের বেগে চলে যাচ্ছে ট্রেনটা। মিথ্যে আশায় নিজেকে ভুলিয়ে কি লাভ? এতক্ষণে হয়তো ওরা পৌঁছে গেছে এলিজাবেথভিলে। শেষ বগিটা কাটা না পড়লে ও-ও থাকত ওদের সাথে। হাসত, মদ খেত।

তাছাড়া, কি লাভ যদি আসেই ক্যাপ্টেন? নির্মম ভাবে হত্যা করেছে ওরা সবাইকে। ওকেও হত্যা করেছে। মরতে ও একটু বেশি সময় নিচ্ছে, এই যা। কিন্তু মরে যে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর বেশিক্ষণ না। অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে ওর। সারা শরীর ঠাণ্ডা আর ভারি হয়ে গেছে। পেটটাই শুধু গরম রয়েছে এখনও।

গরম আর ভর্তি।

চোখ বুজল বব। কিছুতেই কিছু এসে যায় না আর। দম ছোট হয়ে এসেছে, আর বড়জোর আধঘণ্টা।

অনেকক্ষণ থেকেই গোলাগুলির শব্দ কানে আসছে তার। এবার খুব কাছে থেকে শব্দ পেয়ে চোখ খুলল সে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল ফ্রস্ট, সাথে আরও তিনজন। জানালা দিয়ে গুলি চালাচ্ছে বাইরে। আরও ছয়জন জানালার দু'পাশে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেল লোড করে ধরিয়ে দিচ্ছে ওদের হাতে, ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেলে নিচ্ছে হাত বাড়িয়ে।

গুলি আসছে বাইরে থেকেও। বুলেটের আঘাতে খোলা জানালার উল্টো দিকের দেয়ালটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটা গুলি ছাদে গিয়ে লাগল। একরাশ চুন-সুরকি খসে পড়ল ববের মাথায়। হালকা ধূসর ধুলোয় ভরে গেছে ঘরটা। হঠাৎ চিৎকার করে উল্টে পড়ল জানালার ধার থেকে একটা লোক। হাতের রাইফেলটা সশব্দে ছিটকে পড়ল একদিকে। কিছুক্ষণ মেঝেতে দাপাদাপি করে ববের পাশে এসে স্থির হয়ে গেল ওর দেহটা।

হঠাৎ কিছুক্ষণ গোলাগুলি বন্ধ। একটা চিৎকার কানে যেতেই আবার চোখ মেলল বব। বাম দিকের খোলা জানালা পথে আঙুল তুলে কি যেন দেখাল একজন। সবাই ঝট করে ফিরল ওইদিকে। 'গুলি চালাও! ওদিক দিয়েও আসছে! গুলি চালাও!'

ফ্রস্টের নির্দেশ পেয়ে বামদিকের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। এমনি সময় পরিষ্কার কানে গেল ওর, বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'শুয়ে পড়ো, জো! দেখে ফেলেছে! শুয়ে পড়ো!'

কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল বব। ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন লুইস পেগান এসেছে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে! তাহলে তার ধারণাই ঠিক। সত্যিই ওরা ফিরে এসেছে ওর জন্যে। এত গোলাগুলি সব ওরই জন্যে! আশ্চর্য একটা আবেগে কাঁপছে ববের বুকটা। খুশিতে পানি বেরিয়ে এল দু'চোখ থেকে। আর তো মরতে ভয় পাবে না সে। প্রমাণ পেয়েছে, তাকে কত ভালবাসে তার দলের লোকজন। আর একটুও ভয় পাবে না সে।

কিন্তু···গুলি খেতে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন। কিছু একটা করা দরকার। এই অনড় অচল অবস্থায় কি করবে সে?

চেঁচিয়ে উঠল বব। অবিশ্বাস্য কর্কশ আওয়াজ বেরোল গলা দিয়ে। চমকে পেছন ফিরে চাইল সবাই। তিন সেকেণ্ড। তারপর ভাবল হয়তো মরণ চিৎকার দিল গুলি খাওয়া লোকটা। একটু নড়ে উঠল বব। উহ্, অসহ্য ব্যথা! পেটের ভেতর রক্ত কুল কুল করছে। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে তার। তার বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছে। একটা কিছু করতেই হবে।

পাশের লোকটার দিকে তাকাল। উবু হয়ে পড়ে আছে লোকটা। কোমরে বেল্টের সাথে ঝুলছে গ্রেনেড।

চোখ বুজে প্রার্থনা করল সে, 'খোদা, এই একটা বারের জন্যে তুমি শক্তি দাও আমাকে। বীরের মত মরতে দাও।'

আস্তে আস্তে হাত বাড়াল সে বেল্টটার দিকে। অসহ্য ব্যথা। কিন্তু সে যে পুরুষ, সহ্য করতেই হবে তাকে। খসিয়ে আনল সে একটা গ্রেনেড। খাঁজগুলোর ওপর আদর করে হাত বুলাল একবার। পিন খুলে ফেলেছে। মরব তো বটেই কিন্তু সত্যিকার বীর পুরুষের মত মরব। গ্রেনেডে একটা চুমো খেয়ে গড়িয়ে দিল সেটা জানালার কাছে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে। জেনারেল ফ্রস্টের পায়ে গিয়ে বাড়ি খেল ওটা। ঘুরে তাকাল ফ্রস্ট। জিনিসটা চিনতে পেরেই এক লাফে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। ফলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাম পাশের জানালায় দাঁড়ানো লোকটার গায়ে। বুঝে নিয়েছে সে কি ঘটতে যাচ্ছে। চোখ তুলে চাইল ববের দিকে। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। কি অদ্ভুত! ভাবল বব। এত বড় জেনারেল, সে-ও ভয় পায়! ব্যুম! আলো, শব্দ আর চিৎকার। ছিটকে এসে কি যেন লাগল পাঁজরে। জ্ঞান হারাল বব। জ্ঞান ফিরে এল একটু পরেই।

মাথায় হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ খুলল বব। মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসা ক্যাপ্টেনকে চিনতে পেরে ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। তৃপ্তির হাসি।

'শোধ নিয়েছি। বীরের মতই শোধ নিয়েছি আমি। তাই না, ক্যাপ্টেন?' ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে ববের গলায়। ওর কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

'সত্যিই তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করছি, বব। তুমি প্রমাণ করেছ, কারও চেয়ে কম নও।' আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা।

রানার চোখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে চাইল বব, পারল না। একটা হিক্কা উঠল। বাম দিকে কাত হয়ে গেল ওর মাথা। মুখ দিয়ে কিছুটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

উঠে দাঁড়াল রানা। ভিতরটা শূন্য মনে হচ্ছে। চারদিকে মৃতদেহ আর রক্ত। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। একটু একা থাকতে চায় রানা। একটা সিগারেট ধরাল। সুফিয়া প্রেজেন্ট করেছে প্যাকেটটা। কিন্তু পানিতে ভিজে ড্যাম্প হয়ে গেছে সিগারেট। জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া গিলল রানা।

'জো।'

'ইয়েস, বস্?'

'এখানকার ঝামেলা পরিষ্কার করে ফেলো। আর চাদরের ব্যবস্থা করতে হবে বব আর হোটেলের ওদের জন্যে। ফ্রেডের সাথের তিনজনের জন্যেও।' নিজের গলাটাই নিজের কাছে কেমন অপরিচিত শোনাল রানার।

'অসুস্থ বোধ করছেন, বস্?' উদ্বিগ্ন হলো জো।

'না, ঠিক আছি। থ্যাঙ্কিউ।' জবাব দিল রানা।

'মাথার চোটটা?'

হাত দিয়ে হেলমেটের বসে যাওয়া জায়গাটা পরীক্ষা করল রানা, 'না, ও কিছু না।'

সুফতাদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল জো, 'এদের নিয়ে কি করব?'

'নদীতে ভাসিয়ে দাও। আর, ভাল কথা, স্টেশনে যারা পড়ে আছে তাদের কথাও ভুলো না।' বেরিয়ে এল রানা রাস্তায়।

ফ্রেড আর তার সাথে আরও চার পাঁচজন তখনও হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ানো। ভেতরে কয়েকজন মৃত দেহগুলোকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মোরব্বার মত কেচে মনের ঝাল মেটাচ্ছে।

রাস্তা পার হয়ে স্টেশন ইয়ার্ডের দিকে রওনা হলো রানা। ভোর হয়ে আসছে। কাল সকালে যেখানে রেখেছিল সেখানেই তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। ফোর্ড ক্রাইসলার। দরজা খুলে সীটে গা এলিয়ে দিল সে। ধীরে ধীরে রাত কেটে সকাল হচ্ছে। কত কি ঘটে গেল চব্বিশ ঘণ্টায়!

পনেরো

'ক্যাপ্টেন, সার্জেন্ট মেজর আপনাকে খুঁজছেন। জরুরী দরকার।' স্যালিউট করে দাঁড়াল একজন সিপাই।

স্টিয়ারিঙের ওপর মাথা রেখে শুয়েছিল রানা, মুখ তুলে চাইল।

'জো কোথায়?'

'ইউনিয়ন মিনিয়েরের অফিস ঘরে।'

'আসছি আমি।' হেলমেট আর রাইফেলটা তুলে নিল সে সীটের ওপর থেকে। ধীর পায়ে ফিরে এল অফিস ব্লকের সামনে।

ট্রাকে তোলা হচ্ছে মৃতদেহ। দু'জন সিপাই চ্যাঙদোলা করে ধরেছে একটা লাশ। দোলাচ্ছে। 'এক, দুই, তিন!' ছুঁড়ে দিল। দেহটা উড়ে গিয়ে শ্লথভাবে ভেতরে পড়তেই হেসে উঠল ওরা।

পা ধরে টানতে টানতে আর একটাকে নিয়ে আসা হচ্ছে বাইরে। মাথাটা সিঁড়িতে ঠোকর খেতে খেতে নামল। নিচে নামিয়ে ছুরির এক পোচে ডান কানটা কেটে নিল একজন। গোলাপী মাংসের মাঝে কালো কানের গর্ত দেখা যাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে অফিসে ঢুকল রানা। ডেস্কের কাছে জো আর ফ্রেড দাঁড়িয়ে। ওকে ঢুকতে দেখেই জো বলে উঠল, 'এই যে, বস্, এগুলো কি করব বুঝতে না পেরে আপনাকে খবর দিলাম।' টেবিলে রাখা হীরার স্তূপটার দিকে নির্দেশ করল সে

হাত দিয়ে।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। শুধু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্ল্যাক ডায়মণ্ড রয়েছে টেবিলের ওপর। ভাল করে ঘেঁটে দেখল সে, 'আরগুলো কই?'

'আর ছিল না, বস্। টেবিলের ওপর হীরা আমিই প্রথম পাই। সেই থেকে আমি এখানেই দাঁড়িয়ে।'

গেল কোথায় তাহলে! মেঝের দিকে চেয়ে আধ মিনিট ভাবল রানা।

'জেনারেল ফ্রস্টকে ট্রাকে তোলা হয়েছে?'

'না, ওকে নদীতে না ভাসিয়ে আগুনে পোড়াবে বলে ঠিক করেছে সবাই। ওকে সরানো হয়নি এখনও।'

'তুমি এখানেই থাকো, আমি আসছি।' পাশের কামরায় অদৃশ্য হলো রানা। একটু খুঁজতেই বাম দিকের বুক পকেটে পেয়ে গেল সে ক্যানভাসের থলিটা। কি মনে করে ফ্রস্টের আঙুল থেকে তিনজনের জন্যে বেছে বেছে দামী তিনটে আংটি খুলে নিল রানা।

'পেয়েছি,' ঘোষণা করল রানা অফিস ঘরে ঢুকেই। 'ফ্রস্টের পকেটে ছিল।' এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর থলেটা উপুড় করল। উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করে উঠল পাথরগুলো। 'জো, এগুলো গুনে ব্যাগে ভরে ফেলো।'

আদেশ পেয়েই কাজে লেগে গেল জো।

তাজ্জব হয়ে গেল ফ্রেড।

'এগুলো ফিরিয়ে দেবে তুমি? পাগল হয়েছ নাকি? এগুলো আমরা তিনজনে ভাগ করে নিলেই তো চুকে যায়! তুমি, আমি আর জো। জীবনে আর টাকা পয়সার অভাব থাকবে না আমাদের।' হাতের পেন্সিলটা ঘুরাতে ঘুরাতে বলল ফ্রেড। পেন্সিলে ডজন খানেক মানুষের কান গাঁথা রয়েছে বটি কাবাবের মত।

'তুমি তো জানো, এগুলো হাতে পাওয়ার জন্যেই রাজি হয়েছে কাতাঙ্গা সরকার টার্গেট নাইন মিশনে। এই যে বড় বড় নয়টা পাথর দেখতে পাচ্ছ, এরই জন্যে এই মিশনের নাম হয়েছে টার্গেট নাইন। অফিসাররা কে কোন্ পাথরটা নেবে···ভাগ বাঁটোয়ারা কমপ্লিট।' হাসল রানা। 'সরকারী কোষাগারে জমা পড়বে না এগুলো···একটা স্লিপে লিখে দেয়া হবে পাওয়া যায়নি··· মিসিং!'

'ওদের হয়ে আমরাই লিখে দিই না কেন—মিসিং? জেনারেল ফ্রস্ট কোথায় লুকিয়েছে ওগুলো আমরা কি জানি?'

'বাঁচবে না, ফ্রেড,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। 'যদি কোন কুমতলব থাকে, এই মুহূর্তে বাদ দাও···নইলে প্রাণে বাঁচবে না।'

ফ্যাকাসে হাসি হাসল ফ্রেড। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। ববকে নিয়ে আসা হয়েছে এই ঘরে। আপাদমস্তক সাদা চাদরে মোড়া।

'কবরের ব্যবস্থা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, বস্। পেছন দিকে ছয়জনকে লাগিয়ে দিয়েছি—কবর খুঁড়ছে ওরা।' আবার বিড় বিড় করে গোণায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল জো।

'ফ্রেড, তুমি আমার সাথে এসো। ট্রাকগুলো কি অবস্থায় আছে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' বেরিয়ে গেল ওরা দু'জনে।

বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা, 'হঠাৎ গুলি বন্ধ করলে যে, ফ্রেড? আমরা মাঝপথে থাকতেই থেমে গেলে কি মনে করে?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে রানার মুখের দিকে চাইল ফ্রেড। কোন জবাব দিল না। রানাও আর চাপাচাপি করল না এ নিয়ে, কিন্তু স্থির করল, ঘটনাটা ভুললে চলবে না, বিপদ হবে।

আধঘণ্টা পর শেষ ট্রাকটা পরীক্ষা করে বনেট লাগাল রানা। 'নাহ্, এটার কার্বুরেটরই থেঁতলে গেছে। এটা আর চালানো যাবে না। তবে এর চাকাগুলো খুলে সাথে নিলে আমরা স্পেয়ার টায়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারব।' কালি মাখা হাত দুটো প্যান্টের পিছনে মুছে নিল সে। 'আমাদের কপাল ভাল, ট্যাঙ্কারটার কোন ক্ষতি হয়নি। আন্দাজ ছয়শো গ্যালন তেল আছে ওতে। আমাদের ফেরার জন্যে যথেষ্ট।'

'ক্রাইসলারটাও সাথে নিচ্ছ নাকি?'

'ওটাও কাজে লাগবে আমাদের।'

'তুমি আর তোমার ওই মেয়েলোকটা ব্যবহার করবে ওটা, তাই না?'

'হ্যাঁ। হিংসা হচ্ছে তোমার?'

'হচ্ছেই তো।'

'সাথে ওর ভাইটাও থাকছে।' হাসল রানা।

'তাতে কি?' গম্ভীর ফ্রেড। 'ওটা একটা মানুষ নাকি? বুঝবেই না কিছু। অসুবিধে দেখলে এক চড় কসিয়ে ওটাকে দশ মিনিটের জন্যে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলেই হলো। তারপর,' চকচক করছে ফ্রেডের চোখ জোড়া, 'নরম গদিওয়ালা ব্যাক-সীটে ফেলে⋯উহ্!'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'দু'জন লোক নিয়ে ট্রাকগুলোয় তেল ভরার ব্যবস্থা করো। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আমাদের, আর দেরি করা ঠিক হবে না। বালুবা এলাকায় বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে এসেছি ওদের সবাইকে।'

একটা বিরাট গর্তে মৃতদের সবাইকে একসাথে কবর দিল ওরা। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি সারল। সবাইকে কবরে নামিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি মাটি চাপা দিয়ে দিল। ওদিকে আগেই নদীতে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে ফ্রস্টের লোকগুলোকে। আগুনে পোড়ানো হয়েছে ফ্রস্টের মৃতদেহ।

'কিছু বলবেন ক্যাপ্টেন?' তাড়াহুড়োয় মৃতের সমুচিত সৎকার করতে না পেরে শান্তি পাচ্ছে না জো। সে চাইছে কেউ একজন কিছু বলুক।

কি বলবে রানা? এই ধরনের অনুষ্ঠানে একজন খ্রীস্টান হিসেবে কি বলতে হয় জানা নেই ওর। মাথা নাড়ল সে। ফ্রেডের সন্দেহটাকে আরও বদ্ধমূল করে দেয়ার ইচ্ছে নেই ওর। বলল, 'এক মিনিট নীরবতা পালন করব আমরা। যার যেমন ভাবে খুশি মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করতে পারো মনে মনে।'

এক মিনিট পর রওনা হয়ে গেল ওরা। ফোর্ড ক্রাইসলারটা সবার আগে। মিশনের রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে রানা বাঁয়ে। একবার ভাবল, ওদের এগিয়ে যেতে বলে ফাদার নেভিল আর বিলের সাথে একটু দেখা করে যাবে? পরক্ষণেই ভাবল, কি দরকার? বিপদমুক্ত ওরা এখন। ভালই থাকবে। যদি না থাকে, কিছু করার নেই ওর। রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল ফোর্ড ক্রাইসলার।

'মাত্র কয়েকটা মাইল। কোন ভাবে এই ক'টা মাইল চলবে না এঞ্জিনটা?' কার্লসকে প্রশ্ন করল রানা।

'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। পেট ফুটো হয়ে গেছে ওর। একটা ঢেকুর তোলারও ক্ষমতা নেই আর।'

এই জবাবই আশা করেছিল রানা। জো-র দিকে ফিরে বলল, 'কিছুই করার নেই, মালপত্র নিয়ে পায়ে হেঁটেই পৌঁছতে হবে আমাদের লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত। ব্যবস্থা করো।'

ওইখানেই রেখে এসেছে ওরা ট্রাকের কনভয়টা।

'কয়দিনের খাবার আছে আমাদের স্টকে?' জানতে চাইল রানা।

'অল্পই আছে, বস্। মিশনে দিয়ে,শহরবাসীদের খাইয়ে আর বড়জোর দু'দিন চলার মত ব্যবস্থা আছে,' জবাব দিল জো।

'যথেষ্ট আছে। এলিজাবেথভিল পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট।'

'সব কিছুই নিতে হবে আমাদের? সার্চ লাইট, গোলাবারুদ, কম্বল, সব?'

'হ্যাঁ। কখন কি দরকার হয় ঠিক নেই, সবই নিতে হবে, ' বলল রানা।

'আজকের বাকি দিনটা লাগবে সবকিছু নিয়ে ট্রাকে তুলতে। ঠিক আছে, বলছেন যখন···' রওনা হচ্ছিল সব ব্যবস্থা করতে। রানা পিছু ডাকল।

'জো।'

'বস্?' ফিরে তাকাল জো।

'বিয়ারগুলো নিতে ভুলো না।'

নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জো-র মুখ। 'মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওগুলোই সবচেয়ে আগে পাঠাব।' চলে গেল সে নিজের কাজে।

'তোমাকে এক কাপ কফি করে দিই?' রানার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সুফিয়া, এতক্ষণে মুখ খুলল সে।

'এক কাপ হলে সত্যিই মন্দ হয় না।' সম্মতি দিল রানা। 'কিন্তু, জামিল গেল

কোথায়? ডাকো তো ওকে। আজ একটা প্যাঁচ শিখিয়ে না দিলে বরখেলাপ হয়ে যাবে কথার।'

সন্ধ্যা হয়ে গেল ওদের সব মাল ট্রাকে লোড করতে। লেভেল ক্রসিঙে ট্রাকের ধারে চলে এসেছে সবাই ট্রেন ছেড়ে। রওনা হবে কাল সকালে।

জোঁকের মত লেগে আছে রানার সাথে জামিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ইতিমধ্যেই সে জেনে নিয়েছে কেমন করে ওরা ট্রাকগুলো দখল করেছে। সবচেয়ে অবাক হয়েছে সে চিতা বাঘের ঘটনায়। কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু কি করে টের পেল ক্যাপ্টেন যে সামনে বিপদ অপেক্ষা করছে! আর বাঘটাই বা বুঝল কি করে যে ক্যাপ্টেন জুডো জানে? রানা ভাবল, আহা! এই বয়সটায় যদি ফিরে যেতে পারত সে!

'আজ রাতে ট্রাক পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে, জো?'

'এই যে, এখনই করছি,' জবাব দিল জো। 'কয়জনকে রাখব ডিউটিতে, বস্?'

'চারজন করে পাহারায় বসাও। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা পর পর রিলিফ। ঠিক আছে?'

'ওকে, বস্।'

নিজে ঘুরে ঘুরে চেক করল রানা সমস্ত কিছু। সিভিলিয়ানরা কোথায় থাকবে, কোথায় ব্রেনগান বসানো হবে, কোথায় সার্চ লাইট, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো রানা। জামিল পিছু ছাড়েনি রানার। সে কি কি করছে, কোথায় কাকে কি নির্দেশ দিচ্ছে মনোযোগের সাথে সারাক্ষণ লক্ষ করেছে জামিল, আর মুগ্ধ হয়েছে। সন্ধের দিকে চারপাশটা একবার দেখে নেয়ার জন্যে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্প থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল রানা জামিলকে নিয়ে। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল ওরা। এখান থেকে ক্যাম্পটা আবছা মত দেখা যাচ্ছে। আর একটু আঁধার হলেই কিছু দেখা যাবে না। রানার নির্দেশে বাতি জ্বালা হয়নি ক্যাম্পে। ওদিক থেকে কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

'সারা রাত খামোকা এখানে নষ্ট না করে আমরা সন্ধ্যাতেই তো রওনা হয়ে যেতে পারতাম?' প্রশ্ন করল জামিল।

দুই হাতে আগুন ঢেকে সিগারেট ধরাল রানা। 'হ্যাঁ, তা পারতাম, কিন্তু তাতে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আলো না জ্বেলে চলা যাবে না রাতে। কিন্তু হেড লাইটের আলো জ্বাললে বহুদূর থেকে দেখা যাবে সেটা। আমরা আসছি জেনে গেলে ওদের সুবিধা মত জায়গায় আমাদের জন্যে ওত পেতে বসে থাকবে বালুবারা,' ব্যাখ্যা করল রানা।

'অনেক হিসাব করে ভেবে চিন্তে কাজ করেন আপনি, তাই না?'

'এতগুলো মানুষকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব যার ওপর তাকে তো একটু ভেবে-চিন্তে চলতেই হবে।'

'আমি…' খপ করে চেপে ধরল রানা ওর মুখ। অবাক হয়ে চাইল জামিল। একটা আঙুল ঠোঁটে ছুঁইয়ে চুপ থাকার ইঙ্গিত দিয়েই রাইফেলটা হাতে তুলে নিল রানা। অন্ধকারে কি যেন নড়তে দেখেছে সে। সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মট্ করে একটা শব্দ কানে এল। এবার শব্দটা আরও কাছে। পায়ের চাপে একটা শুকনো ডাল ভাঙল। ধীরে ধীরে শব্দের দিকে রাইফেল ঘুরাল রানা। জামিলকে সাথে নিয়ে ক্যাম্প থেকে এতটা দূরে চলে আসা ঠিক হয়নি। আগন্তুকের আকৃতি অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখতে পাচ্ছে সে তারার ক্ষীণ আলোয়। বালুবা? ওরা কতজন আছে কে জানে! গুলি করেই জামিলকে নিয়ে দৌড় দেবে ক্যাম্পের দিকে। সমান সমান চান্স। দাঁড়িয়ে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে লোকটা। মাথার আকৃতিটা দেখা যাচ্ছে, হেলমেট নেই, দলের কেউ হতেই পারে না; নিশ্চয়ই বালুবা। রাইফেল তুলে লোকটার বুক বরাবর তাক করল রানা। অন্ধকারে সাইট ব্যবহার করা যাবে না, তবু এত কাছ থেকে মিস হবে না তার। সাবধানে এগিয়ে আসছে লোকটা। ওদের দেখতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। একটু কোনাকুনি পথে পাশ দিয়ে চলে যাবে, যদি সোজা হাঁটে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, বিস্ফারিত জামিলের চোখ।

'লুইস?' সুফিয়ার ভীত কাঁপা গলা শোনা গেল।

খেপে গেল রানা, 'তোমাদের না বলেছি, কেউ ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে যাবে না? এখনই তো গুলি খেয়ে মরতে!'

রানার সাড়া পেয়ে দ্রুতপায়ে কাছে চলে এল সুফিয়া।

'দোষ হয়ে গেছে, মাফ চাইছি। অনেকক্ষণ তোমাদের না দেখে ভাবলাম দেখে আসি কি হলো। কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে এমন ভয় লেগে গেল…'

'আর কখনও এমন কাজ কোরো না। গার্ডের সামনে পড়লে এতক্ষণে গুলি করে বসত। চলো, ক্যাম্পে ফেরা যাক।'

এগোল রানা। ওর একটা হাত জড়িয়ে নিল সুফিয়া নিজের হাতে।

'আমি কিন্তু বুঝতেই পারিনি কেউ আসছে!' অবাক হয়েছে জামিল, মহামানব মনে হচ্ছে তার ক্যাপ্টেনকে।

'তোমরা যাও, আমি একটু আসছি,' ক্যাম্পের কাছাকাছি ওদের পৌঁছে দিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল রানা। ঘুরে ক্যাম্পের উল্টো দিকে চলে এল। পাহারারত সেন্ট্রি দু'জন সচেতন হয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে চায় সে। গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে আবছা মত দেখতে পেল সেন্ট্রিকে। রাইফেল নামাচ্ছে কাঁধ থেকে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে মুখ করে। আর একটু আগে বাড়তেই রাইফেল তাক করল সে। স্যাৎ করে মোটা একটা গাছের আড়ালে চলে গেল রানা, বলল, 'গুলি কোরো না, সোলজার। আমি ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেনের গলা চিনতে পেরে রাইফেল নামিয়ে নিল সিপাই। গাছের আড়াল

থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'বেশ সজাগ আছ দেখছি!' প্রশংসা করল রানা, 'গুড!'

'রাতের বেলা বন-বাদাড়ে একা একা ঢোকা ঠিক না, ক্যাপ্টেন।' গম্ভীর মুখে বলল সৈনিক। বয়স্ক লোক সে, রানার প্রশংসায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি।

'কেন? ভূতে ধরবে বুঝি?' ঠাট্টা করল রানা।

'এসব ঠাট্টার বিষয় না, ক্যাপ্টেন!' আরও গম্ভীর হলো সে। 'আমার এক আত্মীয় বাড়ি থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে গিয়েই অদৃশ্য হয়েছে। আমি উপস্থিত ছিলাম সে বাড়িতে। বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। কোন চিৎকার না, কিচ্ছু না। এসব ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'বাঘ বা সিংহ তো নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে?' যুক্তি দিল রানা।

'আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন। বললাম তো, কোন রক্তপাত নেই, চিৎকার নেই। কারা তুলে নিয়ে গেছে সে ব্যাপারে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। যে দেশের যে রীতি সেটা মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, ক্যাপ্টেন। লেফটেন্যান্ট ফ্রেডকে আমার সাবধান করার দরকার নেই, কিন্তু আপনার একা না গেলেই তো হয়!'

আন্তরিক মঙ্গল কামনা থেকেই, ওর ভালর জন্যে কথাগুলো বলছে বিজ্ঞ আফ্রিকান, বুঝতে পারল রানা। প্রায়ই ওদের এক-আধটা কথা চমকে দেয় ওকে, অভিভূত করে। কৃতজ্ঞ বোধ করে সে ওদের ভালবাসার পরোক্ষ প্রকাশ দেখে। লোকটার কাঁধে হাত রেখে একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'না ভেবেই করেছি কাজটা, ন্'গুয়েন। এখন থেকে তোমার কথাটা মনে রাখব।'

ক্যাম্পে ফিরে গেল রানা। সুফিয়া আর জামিল খাবার প্লেট সামনে নিয়ে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে। বসে গেল রানা। খিদে পেয়েছে বেশ। নীরবেই খেয়ে নিল সবাই।

'দুই দিন ঘুমাওনি তুমি, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, বিছানা করে রেখেছি আমি।'

পরিপাটি বিছানায় শুয়ে দু'মিনিটেই ঘুমে জড়িয়ে এল রানার দু'চোখ।

ষোলো

'নাস্তার কি হবে, বস্?'

'চলতে চলতে রাস্তায় কোথাও খেয়ে নেব। প্রত্যেককে এক টিন স্যামন মাছ আর রুটি দিয়ে দাও। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আমাদের। আর দেরি করা যায় না।' ঘড়ি দেখল রানা। পাঁচটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি।

পুবের আকাশটা ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। একটু গোলাপী আভাও দেখা যাচ্ছে

মেঘের গায়ে।

'সবাইকে তৈরি হতে বলো, জো, সন্ধ্যার আগে যদি বালুবা এলাকা পেরিয়ে ম'সাপা জংশনে পৌঁছতে পারি, তবে সারা রাত পথ চলে সকালে এলিজাবেথভিলের হোটেলে বসে ফাসকেলাস নাস্তা খেতে পারব আমরা।'

হেলমেটটা মাথায় চাপিয়ে নিয়ে ট্রাকের পাশে ঘুমন্ত মানুষ জনকে ওঠাতে লেগে গেল জো।

গাড়ির পেছনের সীটে সুফিয়া আর সামনের সীটে জামিল শুয়েছে গত রাতে। জানালা দিয়ে উঁকি দিল রানা। এখনও ঘুমাচ্ছে দু'জন বেঘোরে। একগোছা চুল পড়েছে সুফিয়ার মুখের ওপর। শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে চুলের গোছাটাও নড়ছে। ওটা আলগোছে তুলে ওর নাকে সুড়সুড়ি দিতেই ঘুমের ঘোরে খরগোসের নাকের মত কেঁপে উঠল সুফিয়ার নাকটা।

'ওঠো, ওঠো! দুপুর হয়ে গেছে!' পায়ের একটা আঙুল টেনে ফুটিয়ে দিল রানা। জামিলও উঠে বসল দুই হাতে চোখ ডলতে ডলতে। 'এই যে, ক্যাপ্টেন সাহেবের ঘুম ভাঙল? চকলেট নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে তোমাকে বিগ জো।'

বাচ্চাদের সাথে ভাব করার আশ্চর্য গুণ আছে জো-র। যখন হাসে, ওকে দেখলে বড় সাইজের বাচ্চা মনে হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে জানের দোস্তী হয়ে যায় যে-কোন বাচ্চার সাথে। জামিলের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ছুটল জামিল।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল সবাইকে ঘুম থেকে তুলে রওনা হতে।

'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্রিজটার কাছে পৌঁছে যাব আমরা।' গাড়ি চালাতে চালাতে অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল রানা।

'ওখানে তো পাহারা দেবার জন্যে লোক রেখে এসেছ, তাই না?' বলে উঠল সুফিয়া।

'হ্যাঁ, যাওয়ার পথে আমরা তুলে নেব ওদের। দেরি করব না। দিন রাত গাড়ি চালিয়ে পরের স্টপেজ রুম ২০, গ্র্যাণ্ড হোটেল লিওপোল্ড দি সেকেণ্ড, এভিনিউ দ্যু কাসাই। আধ ঘণ্টা শাওয়ারের পরে পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে নাস্তায় বসব।' দুই আঙুল দিয়ে দেখাল রানা, 'এই মোটা একটা স্টেক্, সাথে ফ্রেঞ্চ সালাদ আর এক বোতল লিবোফ্রাউমিল্চ্।'

'নাস্তা?' সুফিয়া জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ, নাস্তা।' স্থির করে ফেলেছে রানা ওটাই তার নাস্তার জন্যে চাই।

'রাক্ষস!'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। চমৎকার রোদ উঠেছে। ভাঙা উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে অক্সিজেন ঠাসা খোলা বাতাস, সেই সাথে ভেসে আসছে নানান ধরনের নাম না জানা জংলী ফুলের সুগন্ধ। বড় ভাল লাগছে রানার। চট্ করে একবার সুফিয়ার

দিকে চেয়ে নিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ?'

হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠল সুফিয়া। বলল, 'এই…ভবিষ্যতের কথা।'

'তাহলে ইংল্যাণ্ডেই ফিরে যাচ্ছ তুমি?'

'হ্যাঁ। এবার থেকে ব্রিটিশ হওয়ার চেষ্টা করে দেখব।'

'তার মানে?'

'আমার বাবা ছিলেন বাংলাদেশের লোক, মা আইরিশ। সেই স্কুল জীবন থেকেই ক্রস-ব্রীডিঙের কুফল ভোগ করতে হয়েছে আমাকে। না হতে পেরেছি ব্রিটিশ, না বাঙালী। ব্রিটিশ ছেলে-মেয়েদের কাছে আমি বিদেশী, বাঙালীদের কাছে অচেনা। কেউ দলে নেয়নি আমাকে। জানি আমার আচার ব্যবহার কোন বাঙালী মেয়ের সাথে মিলবে না, ভাবধারা ও জীবন দর্শন আমার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে, ওদের চিনি না আমি, জানি না, তবু আমি বাঙালী হতে চেয়েছিলাম।'

'বাধা দিয়েছে কেউ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দিয়েছে। চরম অবজ্ঞা দিয়ে আমাকে অপমানিত করেছে ওরা!' কালো হয়ে গেল সুফিয়ার ফর্সা মুখ।

'তাই বুঝি? কিভাবে?'

'শোনো, তোমাকে খুলেই বলি। আমি রানা এজেন্সিতে কাজ করি।' সুফিয়ার বলার ভঙ্গিতে মনে হলো ওর ধারণা, নামটা উচ্চারণ করলেই চিনতে পারবে যে কেউ, বলে উঠবে; আরে, তাই নাকি! কিন্তু রানার নির্বিকার মুখ দেখে বুঝল ওই নামের কোন এজেন্সির কথা জীবনে শোনেনি মানুষটা, তাই আর একটু ব্যাখ্যা করে বলল, 'এটা বাংলাদেশের একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। সারা দুনিয়ায় ছড়ানো আছে এর শাখা-প্রশাখা। যে-কেউ টাকার বিনিময়ে এদের সার্ভিস কিনতে পারে।'

'তাই নাকি? এলিজাবেথভিলেও তোমাদের অফিস আছে?'

'আছে। আছে না বলে "ছিল" বলাই ভাল। কাল ওদের অফিসে গিয়ে প্রথমে ইস্তফা দেব, তারপর বাছা বাছা কিছু শব্দ শোনাব শাখা-প্রধানকে।'

'তারপর ইংল্যাণ্ডে ফিরে ব্রিটিশ হওয়ার চেষ্টা করবে?'

'হ্যাঁ। কোন দোকানে সেলস্-গার্লের চাকরি নেব; কিন্তু ওদের ওখানে আর না।'

'কেন? ওরা কি দোষ করল? ওহ্-হো, চরম অবজ্ঞা দিয়ে অপমান করেছে তোমাকে। সেটা কিভাবে?'

'আটকা পড়েছি, সে-খবর জানে ওরা। কিন্তু কেয়ার করল না, কড়ে আঙুলটা পর্যন্ত নাড়ল না আমাকে উদ্ধারের জন্যে। আমি বাঁচলাম কি মরলাম, কিছুই এসে যায় না ওদের। আমার জীবনের কোন দাম নেই ওদের কাছে।'

'তুমি যতটা ভাবছ ততটা হয়তো ক্ষমতাই নেই ওদের।'

'কে বলেছে ক্ষমতা নেই? গোটা একটা দেশ রয়েছে ওদের পেছনে।

তোমাকে বলা হয়তো ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু কথায় কথা এসে যাচ্ছে বলে বলছি—রানা এজেন্সি আসলে একটা কাভার ছাড়া কিচ্ছু না! ক্যামোফ্লাজ। এরই অন্তরালে দুনিয়ার সর্বত্র কাজ করছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অসংখ্য এজেন্ট। ইচ্ছে করলেই ওরা উদ্ধার করতে পারত আমাকে। বাট দে ডিড নট কেয়ার!'

'তুমি বলতে চাও, তোমাকে ততটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে করেনি ওরা?'

'তা নয়। এটা ভ্যালুজের ব্যাপার, নীতির ব্যাপার। ক'টা টাকা বেতনের বিনিময়ে আমার আন্তরিক সার্ভিস নিয়েছে ওরা, কিন্তু যখনই বিপদে পড়েছি—গুটিয়ে নিয়েছে হাত, এড়িয়ে গেছে দায়িত্ব। রানা এজেন্সির চীফ মাসুদ রানার প্রশংসা-পত্র আছে আমার কাছে, যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে অনেক খেটে অর্জন করেছি সেটা আমি।' কথাটা বলতে বলতে দু'ফোঁটা পানি বেরিয়ে এল সুফিয়ার চোখ থেকে। 'দেশের কাজ! ছিঃ! ভেবেছিলাম দেশের কাজ করছি! থুঃ! যে-দেশকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছি মনপ্রাণ ঢেলে...' ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে চোখ ঢাকল সুফিয়া। আধ-মিনিট পর একটু সামলে নিয়ে বলল, 'সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম আমি, লুইস। দেশের সেবা করার সাধ ঘুচে গেছে আমার। কত আশা ছিল, আসবে ওরা, যেমন করে হোক উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আমাকে...দিনের পর দিন গেল, তারপর গড়াল মাসের পর মাস...কেউ এল না। ভুলেই গেছে ওরা আমার কথা। আমার এত্ত বড় মনটা ছোট হতে হতে এই এতটুকু হয়ে গেল।'

'কাঁদছ কেন, আপা?' জানতে চাইল জামিল বাংলায়। 'ক্যাপ্টেন লুইস তো এসেছেনই আমাদের উদ্ধার করতে।'

'তুই বুঝবি না,' ইংরেজিতে উত্তর দিল সুফিয়া। 'যাদের জন্যে প্রাণ বাজি রেখে কাজ করলাম এতদিন, বুঝে গেছি আমি, আই ডোণ্ট বিলং দেয়ার, দে ডোণ্ট কেয়ার ফর এ হাফ-ব্রীড। না হতে পারলাম ইংরেজ না বাঙালী! কোথাও কোন দাম নেই আমার!'

'আই অ্যাম সরি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'বুঝতে পারছি, খুব মানসিক নির্যাতন গেছে তোমার ওপর দিয়ে গত তিনটে মাস। তবে, ডোণ্ট বি ইন্‌কনসিডারেট। বাংলাদেশ থেকে পোর্ট রিপ্রিভে সাহায্য পৌঁছানো চাট্টিখানি কথা নয়। ওদের নীরবতাকে সদিচ্ছার অভাব বা অবহেলা ধরে নিলে হয়তো মস্ত ভুল করবে। যাই হোক, ম্যাপটা দেখো তো, সামনের ওই বাঁক থেকে ব্রিজটা কতদূর?'

ম্যাপটা খুলে হাঁটুর ওপর বিছাল সুফিয়া।

'মনে হচ্ছে এসে গেছি,' বলল সুফিয়া ম্যাপ থেকে চোখ না তুলেই।

নদীর কাছাকাছি ঘন জঙ্গল। গাড়ির গতি কমাল রানা। বাঁক নিয়ে রাস্তাটা মিশেছে রেল রাস্তার সাথে। এর পরেই এক যোগে পাশাপাশি এগিয়ে গেছে রাস্তা আর ট্রেন লাইন কাঠের ব্রিজটার উপর দিয়ে।

গাড়ির গতি আরও কমাল রানা। জঙ্গলটা এখানে আরও ঘন হয়ে উঠেছে। রাস্তাটা একটা টানেলের মত বনের বুক চিরে ভেতরে ঢুকে গেছে। ব্রিজের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামাল সে।

এখনও ধোঁয়া উঠছে ব্রিজ থেকে। মাঝখানের বেশ কিছুটা অংশ অদৃশ্য। দুই তীরের দুই অংশ দেখে মনে হচ্ছে পরস্পরের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দুই মোমিন মুসলমান ঈদের জামাত শেষে কোলাকুলির উদ্দেশ্যে।

'ব্রিজটা জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জামিল।

গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল সুফিয়া। চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'খবরদার! চুপ চাপ বসে থাকো, নোড়ো না! জলদি জানালার কাঁচটা উঠিয়ে দাও।' বাধ্য মেয়ের মত জানালার কাঁচ তুলে দিল সুফিয়া। 'ওরা অপেক্ষা করছে ওই ওখানে,' আঙুল দিয়ে জঙ্গলের ধারটা দেখাল রানা। দরজা খুলে নামল। প্রথম ট্রাকটা পৌঁছে গেছে। দৌড়ে ট্রাকের আড়ালে চলে গেল সে। 'ট্রাক থেকে কেউ নামবে না।' নির্দেশ দিল রানা। বাকি চারটে ট্রাক এসে থামল একটার পেছনে আরেকটা। প্রত্যেক ট্রাকের লোকজনকে একই নির্দেশ দিয়ে শেষ ট্রাকটায় উঠে পড়ল। 'ব্রিজটা পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা,' জো-র উদ্দেশে বলল রানা।

'আমাদের লোকজন কোথায়?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল জো।

'জানি না। কিন্তু পোড়ানো ব্রিজ দেখে অনুমান করা যায়। প্রাণ থাকতে সার্জেন্ট ব্রায়ান ব্রিজ পোড়াতে দেয়নি, এটা জানা কথা। তোমার ট্রাকের ছাদটা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে নাও।' এই একটা ট্রাকই ছাদ বিহীন। 'ঢাকা থাকলে তীর-ধনুক দিয়ে সুবিধা করতে পারবে না ওরা।' জো-র নির্দেশে ছয়জন লেগে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই ত্রিপল দিয়ে ছাদ ঢেকে ফেলল ওরা। ট্রাকগুলো দুই সারিতে পাশাপাশি নিয়ে আসা হলো। এমন ভাবে রাখা হলো যাতে হাঁটা চলার জন্যে মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা পাওয়া যায়, অথচ কোন দিক থেকেই বিষাক্ত তীর এসে লাগতে না পারে কারও গায়ে।

'ফ্রেড, তিনজন লোক নিয়ে ট্রাকের তলায় ঢোকো তুমি,' নির্দেশ দিল রানা। 'ব্রেন দুটো নিয়ে ফিট্ করো ওখানে। বনের দুই দিকেই নজর রাখবে। বিশেষ করে ব্রিজের দিকটা।' বিপদ বুঝতে পেরে বিনা তর্কে নেমে গেল ফ্রেড ব্রেনগান নিয়ে। ওর সাথে নামল আরও তিনজন। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ট্রাকের নিচে।

আধ ঘণ্টা ধরে সম্ভাব্য সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়ার পর মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রাকের ধারে জো-র পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ফাঁকা জায়গাটা ঢেকে ফেলা হয়েছে তেরপল দিয়ে। গরমে কষ্ট পেতে হবে বটে, কিন্তু বিষাক্ত তীরের ভয় আর নেই আপাতত।

'কি হবে, বস্?' রানাকে যে চিন্তা বিব্রত করে রেখেছে সেটাকেই কথায় রূপ দিল জো।

'আমরা দু'জন প্রথমে ব্রিজটা পরীক্ষা করে দেখতে যাব,' বলল রানা। 'ব্রিজের ক্ষতির পরিমাণ বুঝে নিয়ে পরের কর্তব্য স্থির করতে হবে।'

'যাও, পাছায় তীর খেয়ে এসো গোটা কতক,' ট্রাকের নিচ থেকে টিপ্পনি কাটল ফ্রেড।

'জো, ডজন খানেক গ্যাস কেপ নিয়ে এসো। ছয়টা করে নেব একেকজন। এতগুলো রবারের বর্ম ভেদ করে ওদের তীর আমাদের গা পর্যন্ত পৌঁছবে বলে মনে হয় না। আর মাথায় তো হেলমেট থাকবেই।'

ছয় পাল্লা রবার মেশানো ক্যানভাস দিয়ে গা মুড়ে দরদর ঘামছে রানা। জো এমনিতেই বিশাল, ওগুলো গায়ে চড়াবার পরে এখন রূপকথার দৈত্যের মত লাগছে ওকে দেখতে। ব্রিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ট্রাকের তলায় সবাই তৈরি রয়েছে ওদের কাভার দেওয়ার জন্যে। দু'পাশের জঙ্গল রাস্তা থেকে গজ তিরিশেক দূরে। চলন্ত অবস্থায় থাকলে এত দূর থেকে বালুবারা লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে না আশা করেই ঝুঁকিটা নিয়েছে রানা। কিন্তু ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে বিষ-মাখানো তীরের আশঙ্কায় কলজে শুকিয়ে এল। যদি ক্যানভাস ভেদ করে গায়ে সামান্য একটু আঁচড় কাটতে পারে···ওরেব্বাপ! রানা দেখেছে এই বিষের ক্রিয়া। মরতে দেখেছে মানুষকে।

'কি, এখনও শীত লাগছে না তো?' একটু হালকা হতে চাইল রানা রসিকতা করে। 'আরেকটা ক্যানভাস লাগবে তোমার?'

'কি যে বলেন, বস্! বিশটা দিলেও তো আমার কাঁপুনি থামাতে পারবেন না!' চোয়াল বেয়ে টপটপ ঘাম ঝরছে ওর।

ব্রিজের কাছে পৌঁছবার আগেই গন্ধটা নাকে গেল ওদের। তীব্র দুর্গন্ধ। মানুষ পচা গন্ধ। চিনতে পারল রানা।

'সন্দেহ নেই আর। গন্ধেই টের পাচ্ছি কি ঘটেছে সার্জেন্ট ব্রায়ানের কপালে।' থুথু ফেলল জো। ভিতর থেকে সব উল্টে আসতে চাইছে।

'কোত্থেকে আসছে গন্ধটা?' সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল রানা, কিন্তু চোখে পড়ল না কিছুই।

প্রশ্নের উত্তর পেল সে ব্রিজের কাছে পৌঁছে। পানির কিনারে পাড়ের দিকে নজর পড়তেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। দশবারোটা চুলো জ্বালানোর কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। একটু উপরের দিকে দু'জোড়া খুঁটি পোঁতা রয়েছে। আফ্রিকার সব শিকারের তাঁবুর পাশেই ওই রকম থাকে। অনেকটা গুণ চিহ্নের মত দেখতে। আরেকটা খুঁটি সমান্তরাল ভাবে রাখা হয় দু'জোড়া খুঁটির ওপর, অনেকটা গোল পোস্টের বারের মত। সেটা ব্যবহার করে ওরা শিকারের পা বেঁধে ঝুলানোর জন্যে। ছুরির একটা লম্বা টানে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

এক্ষেত্রে শিকার ছিল তাদেরই দলের মানুষ। ঝুলন্ত রশিগুলো একে একে গুনল

রানা। বিশটা! কেউই রেহাই পায়নি তাহলে! 'নিচে যাচ্ছি আমি দেখতে, আমাকে কাভার করো।'

'ও কে, বস্।' রাইফেল নিয়ে রেডি হলো জো।

মানুষের চলাচলে একটা পথের দাগ পড়েছে মাটিতে। সোজা নেমে গেল রানা ওই পথ ধরে। গন্ধটা আরও উৎকট হয়ে উঠেছে। উৎসটা নজরে পড়ল তার। সমান্তরাল খুঁটির নিচে একটা ঘন গাঢ় রঙের স্তূপ। মাছি ভনভন করছে ওটার ওপর। লক্ষ লক্ষ মাছি। ওদের নড়াচড়ায় প্রতি মুহূর্তে স্তূপটার আকৃতি বদলাচ্ছে—মনে হচ্ছে ওটা একটা জীবন্ত কিছু। আর একটু কাছে যেতেই শব্দ তুলে অনেকগুলো মাছি উড়ে আবার বসল।

চুলোগুলোর পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাড়গুলো। পায়ের কাছে একটা ফাটা খুলি পড়ে আছে। দুভাগ করা হয়েছে ওটাকে মগজ বের করার জন্যে।

বমি আসছে রানার। আর দাঁড়ালে বমি হয়ে যাবে। দ্রুত পায়ে উপরে উঠে এল সে। ব্রিজটা একটু পরীক্ষা করে জো-র পাশে এসে দাঁড়াল। 'এখানে আর দেখার কিছু নেই। চলো, এবার ফেরা যাক।' ট্রাকগুলোর কাছে ফিরে এল ওরা।

ফোর্ডের বনেটে বসে সিগারেট ধরাল রানা। জোরে টান দিল পর পর কয়েকটা। মুখের টক স্বাদ বদলাতে চেষ্টা করছে ও। পচা গলা দৃশ্য দেখে মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে।

'সাঁতার কেটে এসেছিল ওরা রাতের অন্ধকারে,' বলল রানা। 'ব্রিজের থাম বেয়ে উঠে এসেছে ওপরে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে ফেলেছে ব্রায়ানের দলকে। নদী পথে যে আক্রমণ আসতে পারে, ভাবেনি বেচারা।'

'ওদের সবাইকে খেয়ে ফেলেছে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ফ্রেড। 'নদীর ধারে গিয়ে নিজের চোখে দৃশ্যটা দেখতে পারলে হত।'

'ভাল কথা, তোমাকেই তাহলে ওদের কবরের ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হলো।'

প্রতিবাদ না করে জানতে চাইল ফ্রেড, 'এখনই?'

'না, এখন না। তুমি আর জো দুটো ট্রাক নিয়ে এখন ফিরে যাবে পোর্ট রিপ্রিভে। ব্রিজ মেরামত করার জন্যে যা যা দরকার সব নিয়ে আসবে তোমরা ওখান থেকে।'

দু'জনেই খুশি হয়ে উঠল বাঁচার একটা উপায় দেখতে পেয়ে। 'এই বুদ্ধিটা একবারও মাথায় আসেনি আমার!' মন্তব্য করল জো। 'প্রচুর মোটা মোটা কাঠ আছে হোটেল আর অফিস ব্লকে। ওগুলো কায়দা করে ফিট করতে পারলে মনে হয় ব্রিজটা পার হয়ে যেতে পারব আমরা ট্রাক নিয়েই।'

'গজাল,' বলে উঠল ফ্রেড। 'বড় বড় গজালও লাগবে আমাদের।'

'শোনো, এখন দুটো বাজে। তোমাদের পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হবে। সকাল থেকে মাল তুলে কাল দুপুর নাগাদ রওনা দিলে সন্ধ্যার দিকে এখানে এসে পড়তে পারবে তোমরা। ট্রাকের ট্যাঙ্ক ভরে নাও। পনেরো জন লোক লাগবে তোমাদের। তোমরা পাঁচজন, আর সেই সাথে দশজন সিভিলিয়ানকে নিয়ে নাও। ওরাই ভাল জানবে কোথায় কি আছে।'

'ঠিক আছে, বস্।' আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জো।

'ভাল কথা,' আবার বলল রানা, 'দুই ডজন ঢেউ-টিনও এনো সাথে। ওদের তীরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঢাল হিসেবে টিন শীট ব্যবহার করব আমরা ব্রিজ মেরামতের সময়ে।'

'হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি বার করেছ।' বলে উঠল ফ্রেড।

ট্রাক দুটোতে তেল ভরে লোকজন নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। পোর্ট রিপ্রিভের পথ ধরে ট্রাক দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। গত চারদিনের উত্তেজনা, হতাশা, গরম আর ঘুমের অভাব; শরীরটা কাহিল লাগছে রানার। শেষ একটা চক্কর দিয়ে দেখে নিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা। ক্রাইসলারের পেছনের সীটে উঠে পড়ল সে। হেলমেটটা খুলে রাইফেলের পাশে রেখেছে। সীটে গা এলিয়ে দেবার সাথে সাথেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে।

সতেরো

সুফিয়ার ডাকে ঘুম ভাঙল রানার। অন্ধকার হয়ে গেছে। এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ আর একবোতল বিয়ার এগিয়ে দিল সে রানার দিকে। চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল রানা। একটানা চারঘণ্টা ঘুমিয়েছে, তবু মাথাটা ধরেই আছে।

'খাব না, খিদে নেই আমার।' প্লেটটা সরিয়ে রাখল রানা। 'এই ভ্যাপসা গরমে খিদে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'একটু কিছু মুখে দিতেই হবে, লুইস। এত ঝামেলা যাচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে, না খেলে শরীর টিকবে কি করে?' জোর করেই নিজের হাতে একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে খাইয়ে দিল।

অযাচিত আদরটুকু মন্দ লাগল না রানার। আয়েশ করে বিয়ারে চুমুক দিল সে। 'জামিলের জন্যে মন খারাপ করছে?'

স্বীকার করে ফেলল সুফিয়া, 'হ্যাঁ। তুমি অনুমতি দিয়েছ শুনে বাধা দিলাম না।'

'ইচ্ছে করেই জো-র সাথে যেতে দিয়েছি ওকে। ওদের সাথেই নিরাপদে থাকবে ও। চঞ্চল ছেলে তো, এখানে নানা রকম বিপদের আশঙ্কা।' সিগারেট

ধরাল রানা।

'আচ্ছা, তুমি কোন্ দেশের মানুষ, লুইস?' হঠাৎ জানতে চাইল সুফিয়া।

'মানুষ?' হাসল রানা, 'মানুষ আর হতে পারলাম কোথায়? সত্যিকার মানুষ হতে হলে...'

'কথা এড়াচ্ছ, লুইস। এক্ষুণি তোমার আঁটি ভেঙে শাঁস খাওয়ার ইচ্ছে নেই, আমি জানতে চাইছি, কোথায় তোমার জন্ম?'

'অত আগের কথা মনে আছে নাকি? আর মনে থাকবেই বা কি করে, তখন তো আমি ছোট।' হাসল রানা। 'কেন, দেখে বোঝা যায় না? আন্দাজ করো তো দেখি?'

'মনে হয়, মিডল ঈস্ট। স্প্যানিশ বা গ্রীক হওয়াও বিচিত্র নয়। যাক, বলতে আপত্তি রয়েছে বুঝতে পারছি—ভুলে যাও। আর জানতে চাইব না। তবে এটুকু বলতে পারি, কাতাঙ্গা আর্মির সামান্য এক মার্সেনারী ক্যাপ্টেন তুমি নও। এর চেয়ে অনেক বড় কিছু হবার যোগ্যতা রয়েছে তোমার মধ্যে।'

চুপচাপ সিগারেট টানছে রানা।

'তা তুমি যে-ই হও,' আবার বলল সুফিয়া, 'আমি খুব কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। তুমি না এলে আমার, জামিলের কি হত কল্পনা করতেও ভয় পাই আমি।' শিউরে উঠল সে নিজের অজান্তেই কল্পনা করে।

'যাই, এক পাক ঘুরে দেখে আসি সবাই সতর্ক আছে কিনা,' হেলমেটটা মাথায় চড়িয়ে রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালো রানা। হাতটা চেপে ধরল সুফিয়া দুই হাতে, ঠোঁটের কাছে এনে চুমো খেল। 'কাজ! সব সময় শুধু কাজ!'

'হ্যাঁ, সেই জন্যেই এখনও বেঁচে আছি। একটু অসাবধান হলে আমাদের সার্জেণ্ট ব্রায়ান আর তার সঙ্গীদের মত বালুবাদের পেটে যেতে হবে। জানো তো, মেয়েদের মাংস পেলে ওরা আর কিছু চায় না!'

'জলদি ফিরো, নইলে আমার ভয় করবে।'

'বেশি দেরি হবে না আমার,' রাইফেলটা তুলে নিল রানা।

এই সময়ে জঙ্গলের ভেতর শুরু হলো ড্রামের আওয়াজ।

'লুইস!' খামচে ধরল সুফিয়া রানার হাত। ভয় পেয়েছে সে। এতক্ষণ লোকজনের কথাবার্তা হাসি ঠাট্টার আওয়াজ আসছিল, তারাও চুপ হয়ে গেছে ড্রামের শব্দে। রাতের অন্ধকারে ড্রামের শব্দ দুম্, দুম্, দুম্, দুম্,একেবারে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে এসে ঘা দিচ্ছে। ড্রামের গুরুগম্ভীর শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠেছে আকাশ বাতাস।

'লুইস!' আবার ডাকল সুফিয়া। সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়েছে ওর। আঙুলগুলো অনেক দূর ঢুকে গেছে রানার পেশীতে। 'ভয় করছে আমার!' ফিসফিসিয়ে বলল ও।

সত্যি, ভয়েরই ব্যাপার। অদ্ভুত একটা অশরীরী, অতিপ্রাকৃত ভাব রয়েছে গম্ভীর ড্রামের ভৌতিক ছন্দে। সাহস দেয়ার জন্যে ওকে জড়িয়ে ধরে লম্বা একটা চুমো খেল রানা। 'ভয়ের কি আছে, ওটা নেহাৎ একটা শব্দ ছাড়া কিছু না। শুধু আওয়াজ কোন ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের।'

নিবিড় আলিঙ্গন ভয়ের সময়ে ভয়কে জয় করতে সাহায্য করে। কাঁপুনি কমে এসেছে সুফিয়ার। কিছুটা সাহস ফিরে এসেছে, কিন্তু কিছুতেই হাত ছাড়ছে না রানার।

'চলো, তুমিও আমার সাথে এসো। লোকজন সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে, ওদের একটু সাহস দিয়ে আসি।' লোকজনের মধ্যে এসে দাঁড়াল ওরা। পাংশু মুখে চাইল সবাই ওদের দিকে। রানা বুঝল, শব্দকে শব্দ দিয়েই জব্দ করতে হবে। গলা উঁচু করে ডাকল রানা, 'র‍্যাল্‌ফ্‌ নাইট্‌স্‌?' উঠে এল র‍্যাল্‌ফ্‌। 'ড্রাম বাজাচ্ছে ওরা, বোধহয় ভাল জাতের গান শুনতে চায়। একজন বাঙ্গালা কেমন সুন্দর গাইতে পারে শুনিয়ে দাও দেখি ওদের!' এতক্ষণ উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল সবাই, রানার কথায় একটু নড়েচড়ে বসল।

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে চেঁচিয়ে শুরু করল র‍্যালফ। বেসুরো একটা আওয়াজ বেরুল গলা দিয়ে। সবাই হেসে উঠল। ঢিল পড়ল এতক্ষণের উত্তেজনায়। আবার গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল র‍্যালফ। নয়াঙ্গাও ভারি গলায় যোগ দিল ওর সাথে। ঢিমে তালের ড্রাম বিটের মাঝে হাত তালি দিয়ে লয়টা ডবল করে নিল ওরা। তিন মিনিটেই জমে গেল গান। গানের তালে তালে দুলছে সবার দেহ। সবাই লক্ষ করল, গান গাইলে দূর হয়ে যায় আতঙ্ক। মেতে উঠল গানে।

আর কাঁপছে না এখন সুফিয়া। এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে সেঁটে রয়েছে সে রানার গায়ের সঙ্গে।

সুফিয়াকে জড়িয়ে ধরেই তৃতীয় ট্রাকের সামনে চলে এল রানা। আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, সারা রাত তো আর গান চালানো যাবে না।

'সার্জেন্ট আগু!' ডাকল রানা।

'জ্বি, ক্যাপ্টেন?'

'সার্চ লাইটগুলো জ্বালো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে নজর রাখবে।' কোথায় বসাতে হবে দেখিয়ে দিল রানা। দুটো করে স্পেয়ার ব্যাটারী আছে। আট ঘণ্টা করে চলবে এক একটা; অর্থাৎ আজ আর কাল এই দুটো রাত আলো পাবে ওরা।

উজ্জ্বল সাদা আলোর ছটা অন্ধকার চিরে আলোকিত করল দুপাশের জঙ্গলের কিনারাগুলো। ক্যাম্পের মধ্যেও বেশ অনেকখানি আলো আসছে। অন্তত কোন্ মুখটা কার চেনা যাচ্ছে। ভাল করে প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখল রানা ভয়ের চিহ্ন আর নেই কারও চেহারায়।

ওদের পরস্পরকে জড়িয়ে থাকতে দেখে দু'একজন মুখ টিপে হাসছে লক্ষ করল রানা, একজন কনুই দিয়ে গুঁতো দিল পাশের জনের পাঁজরে। হাত নামিয়ে নিতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু ভাবল, কি দরকার, ওদের নিয়ে আলোচনা করে একটু মজা পায় পাক না। মনটা অন্যদিকে ব্যস্ত থাকবে, ভালই হবে।

গাড়ির দিকে চলে এল ওরা ধীর পায়ে।

'ক্লান্ত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটু।' হাসল সুফিয়া।

সামনের সীটের পিঠ নামিয়ে পিছনের সীটের সাথে লাগিয়ে দিল রানা। 'শুয়ে পড়।'

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল সুফিয়া।

'গাড়ির পাশেই বিছানা করে নিচ্ছি আমি,' বলে কোমর থেকে বেল্ট সুদ্ধ পিস্তলটা খুলে সুফিয়াকে পরিয়ে দিল। 'এখন থেকে এটা তোমার কাছেই থাক। কাজে আসতে পারে।'

নিজের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল সুফিয়া। সবচেয়ে ছোট করে বেল্ট লাগানোর পরও পিস্তলটা সুফিয়ার হাঁটুর কাছে ঝুলছে।

জিভ বের করে ঘাড় কাত করে রানাকে একটা ভেংচি কেটে গাড়িতে ঢুকে গেল সুফিয়া।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। দুম্ দুম্ ড্রামের শব্দ ছাপিয়ে চাপা কণ্ঠের ডাকটা কানে এল রানার, 'লুইস!'

'কি হলো?'

'না, এমনি। দেখলাম তুমি আছ কিনা।'

চিত হয়ে শুয়ে আছে রানা। কিছুতেই ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ হলো থেমে গেছে গান। এখন কেবল একটানা ড্রামের আওয়াজ ভেসে আসছে জঙ্গলের ভিতর থেকে। দুম্ দুম্ দুম্ দুম্। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই…যেন জাদু করছে ওদের। অসহ্য রকমের হাঁপ ধরে যায় কিছুক্ষণ মন দিয়ে শুনলে। কেমন যেন ভৌতিক লাগে, আতঙ্কে বন্ধ হয়ে আসতে চায় শ্বাস-প্রশ্বাস। রানার বুকের ভেতরটা সমান তালে তাল ঠুকছে: দপ্ দপ্ দপ্ দপ্। একেবারে নিঃসঙ্গ একা মনে হচ্ছে তার নিজেকে। রেবেকা সাউলের মুখটা ভেসে উঠল। সুন্দর মিষ্টি মুখ। রানার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দাতাকুর ভীষণ নিষ্ঠুর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে এবার। হ্যাঁ, ওরই জন্যে সে হারিয়েছে রেবেকাকে। উঠে বসল রানা। আর একবার খুন করবে সে দাতাকুকে। হারিয়ে গেল ওরা। শুয়ে পড়ল সে আবার। সোহানার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা ধীরে ধীরে ভেসে উঠল এবার। আশ্চর্য এক মেয়ে! হৃদয়ে একনিষ্ঠ বঙ্গললনা; চিন্তা-ভাবনা-মানসিকতায় মুক্ত-বুদ্ধি পশ্চিমা—অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। কাছে এলে

টানে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে, দূরে গেলে রয়ে যায় হালকা মায়ার বাঁধন। কেমন যেন সম্পর্কটা…দুর্বোধ্য। কোথায় ও? দপ্ করে নিভে গেল সোহানার ছবিটা, সেই জায়গায় উচ্ছল হাসিতে জীবন্ত হয়ে উঠল পাগলী অনীতা গিলবার্ট। তারপর এল মোনিকা, মায়া ওয়াং, জিনাত, মিত্রা, সবিতা, রাফেলা, শীলা ক্লিফোর্ড, আরও কত মুখ! কত দেশ, কত প্রান্তর ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে সে, হাঁটছে তো হাঁটছেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অবিরাম চলছেই শুধু, জন্মজন্মান্তর ধরে চলছে—মোক্ষ লাভ আর হলো না ওর। হবেও না, জানে রানা। এই জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না সে। কিছুই বুঝতে পারবে না, সে ক্ষমতাই দেয়া হয়নি তাকে, বা আর কাউকে। অনর্থক বেঁচে থাকবে সে, যতদিন সম্ভব।…দপ্ দপ্ দপ্ দপ্ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ভয়ানক একা লাগছে। ভয় লাগছে।

'লুইস!'

চমকে উঠে বলল রানা। 'কি হলো?'

'ভয় লাগছে, লুইস! ভীষণ ভয় লাগছে আমার!'

'ভয় কিসের? এই তো আমি এখানে।'

'কোথায় তুমি, লুইস? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন!'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা, দ্রুতপায়ে গাড়ির পাশে এসে টর্চ জ্বালল। 'কি হয়েছে তোমার!'

সীটের ওপর উঠে বসে অন্ধের মত দু'হাত বাড়িয়ে চারদিক হাতড়াচ্ছে সুফিয়া। টিপে বন্ধ করে রেখেছে দু'চোখ। ঘেমে নেয়ে উঠেছে একেবারে। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। রানার স্পর্শ পেয়েই ফুঁপিয়ে উঠে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল রানা, কোনমতে সামলে নিয়ে উঠে এল গাড়িতে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, তীব্র আতঙ্কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা। ওর পিঠে হাত বুলাতে শুরু করল সে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গা-টা।

'কোন ভয় নেই…কিসের ভয়…এই তো আমি…'

বুকের সাথে আরও চেপে ধরল ওকে সুফিয়া। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে ওর। হিস্টিরিয়ার পূর্ব লক্ষণ।

সাহস দেয়ার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতেই অন্য পথ ধরল রানা। চুমো খেতে শুরু করল ওর ঠোঁটে, গালে, গলায়। পিঠে হাত বুলাতে গিয়ে ব্রা-র হুকটা বারবার হাতে লাগছে। খুলে দিল ওটা। হাত বুলানোর এলাকা বাড়ছে ক্রমেই। নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে এবার রানাও। লক্ষ করল, কাঁপুনি কমে এসেছে সুফিয়ার। গরম হয়ে উঠছে শরীর, নিঃশ্বাস। নড়েচড়ে জায়গা করে দিচ্ছে রানার হাত দুটোকে, যেতে দিচ্ছে শরীরের যেখানে খুশি, কাপড় সরে যাচ্ছে কোন কোন অংশ থেকে—যেন খেয়ালই নেই সেদিকে।

মিনিট তিনেক পর সক্রিয় ভাবে সাড়া দিতে শুরু করল সে-ও। চোখ বন্ধ।

মুচকি হাসল রানা। সুফিয়ার কানের লতিতে আলতো করে কামড় দিল।

'অ্যাই, পাজী মেয়ে! পরে অনুতাপ হবে না তো?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সে।

'না!' পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে রানার চোখে। ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি।

দুম্ দুম্ দুম্ দুম্। বেজেই চলেছে ড্রাম জংলী ছন্দে।

আস্তে ঠেলা দিয়ে শুইয়ে দিল ওকে রানা সীটের ওপর।

তারপর কখন থেমে গেছে ড্রামের আওয়াজ, কখন শেষ হয়ে গেছে রাত, বলতে পারবে না ওরা কেউ। রানার যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হতেই দেখতে পেল, নাস্তা নিয়ে এদিকেই আসছে সুফিয়া। ঠোঁটে মুচকি হাসি।

আঠারো

ড্রামের শব্দ থেমে যাওয়ায় চারদিকে কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে। ড্রামের শব্দটা কানে সয়ে এসেছিল, শব্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মনে হচ্ছে কি যেন একটা নেই। নাস্তা সেরে দলের লোকদের মাঝে এসে দাঁড়াল রানা। স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে গেছে, সবাই কেমন আড়ষ্ট। ঠাট্টা মস্কারায়ও প্রাণ খুলে হাসতে পারছে না, নিষ্প্রভ হাসি হাসছে সবাই। বারবার তাদের দৃষ্টি ফিরে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। ভয়ানক মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়েছে ওদের প্রত্যেককে। সারা রাতের স্নায়বিক নির্যাতন কাহিল করে এনেছে ওদের।

রানা চাইছে ওরা আক্রমণ করুক। অন্তত ওরা দেখা দিলেও কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু কিছুই করছে না ওরা। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে রানা, জঙ্গলের ভেতর থেকে অনেক জোড়া চোখ নজর রেখেছে তাদের ওপর।

দক্ষিণ মাথায় চলে এল রানা। ট্রাকের তলায় বিধ্বস্ত সার্জেন্ট আগুকে দেখে একটু হাসল সে। ওর পাশে বসে ট্রাকের তলা দিয়ে পোড়া ব্রিজটার দিকে তাকাল।

'ট্রাক দুটো ফিরে এলেই আর বেশি সময় লাগবে না আমাদের ব্রিজটা মেরামত করতে,' সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল ওকে রানা।

কোন জবাব দিল না সার্জেন্ট আগু। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে ওর চওড়া কপালে। 'এই যে অপেক্ষা, ক্যাপ্টেন, এই অপেক্ষাই দুর্বল করে তোলে মানুষকে। পেটের মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি হয়।' একরাতেই দার্শনিক হয়ে উঠেছে তরুণ সার্জেন্ট।

'শিগগিরই এসে পড়বে ওরা,' সাহস যোগাল রানা। সার্জেন্ট আগু এতটা দুর্বল

হয়ে পড়লে বাকি সবার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে, অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কাছেই বসা লোকটার মুখের দিকে চাইল সে। ভয়ে রক্তশূন্য একটা মুখ। এখন যদি ওরা আক্রমণ করে, কি যে ঘটবে বলা মুশকিল। আতঙ্কিত অবস্থায় কে কি করবে কিছুই বলা যায় না।

একটা অমানুষিক তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল জঙ্গলের ধার থেকে। চমকে ফিরে তাকাল রানা শব্দটার উৎস খুঁজতে। বীভৎস শব্দে কুঁকড়ে গেছে ক্যাম্পের লোকজন।

আবার ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার। ওদের দুর্বল স্নায়ুর উপর চাবুক কষাচ্ছে শব্দটা।

দশ-বারোটা রাইফেল গর্জে উঠল একসাথে।

হা-হা করে হেসে উঠল রানা। রানার হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল গুলি। যারা গুলি চালিয়েছিল রানার হাসিতে তারা লজ্জা পেয়ে রিলোড করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিচ্ছু না...ইয়েলো হর্নবিল পাখির ডাক। খামোকা ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়েছে ওরা, হাসছে। যাক, ভাবল রানা, কিছুক্ষণের জন্যে তো মুক্তি পাওয়া গেল স্নায়বিক নির্যাতনের হাত থেকে।

গুলির শব্দে সুফিয়া বের হয়ে এল গাড়ি থেকে। রানা এগিয়ে গেল ওর দিকে।

'লাঞ্চে কি খাওয়াচ্ছ আজ আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আলু আর গরুর মাংস,' জবাব দিল সুফিয়া।

'আবার গুলাস?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, পেঁয়াজ নেই আর। তাই ইচ্ছে থাকলেও গুলাস বানানো যাবে না।'

'আর কতটা খাবার আছে আমাদের?'

'আগামী কাল লাঞ্চ পর্যন্ত চলবে।'

মনে মনে হিসেব করল রানা। কালকের পুরো দিন লেগে যাবে ব্রিজ ঠিক করতে। তার পরে আরও একটা দিন লেগে যাবে এলিজাবেথভিলে পৌঁছতে। মাথা নাড়ল সে।

'এখন থেকে অর্ধেক রেশন চলবে। এই খাবার দিয়েই আরও দুটো দিন চালাতে হবে আমাদের।'

কথায় ব্যস্ত রানা শুনতে পায়নি শব্দটা। ছুটে এল সার্জেন্ট।

'ক্যাপ্টেন, ওটা কিসের আওয়াজ?' চোখ বড় হয়ে গেছে আগুর আশঙ্কায়।

কান খাড়া করে শুনল রানা। 'ট্রাক দুটো ফিরে আসছে!' একটু জোরেই বলল রানা। স্বস্তির মৃদু গুঞ্জন উঠল ক্যাম্পে। অপেক্ষার পালা শেষ হতে যাচ্ছে।

মিনিট দশেক পরেই দেখা গেল ট্রাক দুটোকে। ট্রাকের পিছনে কাঠের তক্তা, টিন আর মোটা খুঁটিগুলো বেরিয়ে আছে তেরপলের বাইরে—দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ট্রাক দুটো।

'কোথায় নামাব মালপত্র?' জিজ্ঞেস করল ফ্রেড। প্রথম ট্রাকটা সে-ই চালাচ্ছে।

'সোজা ব্রিজের কাছে চলে যাও,' বলল রানা। 'আমিও আসছি জো-র ট্রাকে চড়ে।' এগিয়ে গেল প্রথম ট্রাক।

পরের ট্রাকটা থামল রানার সামনে। ট্রাক থেকে নেমে এল জো। ওর পিঠে দেয়ালের গায়ে টিকটিকির মত ঝুলছে জামিল।

'অনেক জলদি ফিরেছ তোমরা! এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে ভাবিনি আমি,' বলল রানা।

'অনেক কাজের ছেলে এই বিচ্ছুকুট্টিটা!' বুড়ো আঙুল দিয়ে জামিলকে দেখিয়ে বলল জো। 'শহরের কোথায় কি আছে সব তার মুখস্থ। কাল রাতেই আমাদের লোডিং শেষ! তক্তা লাগবে? ওই তো ওখানে। টিন? আঙ্কেল পিটার একটা শেড বানাবার জন্যে এই তো সেদিন অনেক টিন কিনেছিল। আর মোটা মোটা কাঠের থাম? পোর্টের তিন নম্বর জেটির ধারে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। ব্যস, আমরা শুধু জায়গা মত গেছি আর লোড করেছি। পোর্টের শেড থেকে টিন খুলে আনতে হলে সন্ধের আগে পৌঁছানো যেত না।'

'ক্যাপ্টেন জামিল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!' আনুষ্ঠানিক ভাবে ধন্যবাদ জানাল রানা। 'এবার তোমার আপার দেখা-শোনা করোগে তুমি। আমরা ব্রিজের মেরামতের ব্যবস্থায় যাই। চলো, জো।'

ট্রাকে উঠে পড়ল রানা। জো-ও উঠে এল। 'এদিককার খবর কি, বস্, কোন ঝামেলা হয়নি তো?' জানতে চাইল জো।

'না, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি এখানে। তবে ওরা আশে-পাশেই আছে। সারারাত ড্রাম পিটিয়ে সেটা জাহির করেছে।'

'নিজেদের আরও লোকজনকে খবর পাঠিয়েছে ওরা ড্রাম পিটিয়ে। এখনও আক্রমণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। কিন্তু দেখবেন, আমরা রওনা হওয়ার আগেই যুঝবে ওরা একবার আমাদের সাথে।'

রানারও তাই ধারণা। মরিয়া হয়ে এক সময় আক্রমণ করে বসবে ওরা। ঠিক সেই সময় ওর লোকজন কতটা প্রস্তুত থাকবে, তারই ওপর নির্ভর করবে জয়-পরাজয়।

'ব্রিজের ধারে ফ্রেডের ট্রাকটার পাশে রাখো,' নির্দেশ দিল রানা জো-কে। 'মাঝে চার হাত ফাঁক। ওই ফাঁকের মধ্যে মাল নামাব আমরা। টিনের বেড়াটাও তৈরি করতে হবে ওখানেই।'

নদীর ধারে চেয়ে দেখল রানা—নাড়িভুঁড়ি হাড়-গোড়ের স্তূপটা অদৃশ্য হয়েছে। কুমীরের কাজ। গুটি-গুটি উঠে এসেছিল রাতে। খুঁটিগুলো আগের জায়গাতেই রয়েছে। খাবারগুলো অদৃশ্য হলেও এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে রানা, এখনও মাছি

ভনভন করছে ওখানে। গন্ধটাও আগের মতই প্রকট।

'ওই খুঁটিগুলো সরাতে হবে ওখান থেকে।' বলল রানা, 'ব্রিজ মেরামত করার সময়ে ওগুলো মানসিক ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে।'

'ঠিক বলেছেন, বস্। দু'জন লোক পাঠিয়ে ওগুলো ভেঙে নদীতে ফেলে দিতে হবে।'

দুই ট্রাকের মাঝের ফাঁকে নামল জো। রানাও নেমে দাঁড়াল ওর পাশে।

'ফ্রেড?' ডাকল রানা।

'দ্যাটস্ মাই নেইম। কে ডাকে?' ড্রাইভিং সীটের পাশের জানালা দিয়ে গলা বের করে রানার দিকে চাইল ফ্রেড।

'আশা পূর্ণ হলো না তোমার। রাতে কুমীর এসে তোমার কাজ কমিয়ে দিয়েছে।'

'তাই তো দেখছি।' কুমীরের চলার দাগগুলো দেখছে সে খুঁটিয়ে।

'দেখা হয়েছে? এবার মালপত্র নামানোর কাজে হাত লাগালে কেমন হয়?'

'তুলবও আমরা, নামাবও আমরা; এটা কি ধরনের বিচার? এখানে যারা সারারাত ঘুমিয়েছে, আর এখন বসে বসে আঙুল চুষছে, ওদের ডাকলেই তো হয়!' আপত্তি জানাল ফ্রেড।

'সারারাত পালা করে পাহারা দিয়েছে ওরা। ড্রামের জ্বালায় চোখের পাতা এক করতে পারেনি। এখনও কেউ আঙুল চুষছে না, আমাদের নিরাপত্তার জন্যে রাইফেল বাগিয়ে ধরে বসে আছে, সিভিলিয়ানরা রান্নার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। তোমার স্বার্থপর...'

'হয়েছে, হয়েছে; আর লেকচার লাগবে না,' খেঁকিয়ে উঠল ফ্রেড রানার কথার মাঝখানে। লাফিয়ে ট্রাক থেকে নেমে মাল খালাসের কাজে লাগিয়ে দিল লোকজনকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশপাশের বাতাস দূষিত করে ফেলল সে জঘন্য গালি-গালাচ দিয়ে।

'সবচেয়ে মোটা কাঠ কি আছে?' জো-র দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নয়-তিন। কিন্তু অনেকগুলো এনেছি আমরা।'

'ভাল করেছ। এক একটা খুঁটির জন্যে এক ডজন করে হবে তো?'

'হবে।'

'পেরেক আর গজালের কি অবস্থা?'

'হার্ডওয়্যারের দোকান ভেঙে এনেছি। চার গ্রোস্।'

'ঠিক আছে,' নাকের ওপর বসা মাছিটা তাড়াল রানা হাত নেড়ে। 'সাইজ মত আলাদা করে সব মাল নামাও। হাতুড়ি আছে?'

'দশটা, বস্। দুটো করাতও এনেছি। দরকার হতে পারে।'

'টিন শীটগুলো আগে বের করো।' ওগুলো কোথায় দাঁড় করাতে হবে দেখিয়ে

দিল রানা।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল, সিভিলিয়ানদের একজন কোন্ ফাঁকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে রাস্তার ধারে প্যান্টের জিপ খুলে দাঁড়িয়েছে। শরীরটা ঝাঁকি খাচ্ছে দেখে বোঝা যাচ্ছে কাজ শেষ করে এনেছে। 'অ্যাই, গর্দভ!' চিৎকার করে উঠল রানা! 'জলদি ফিরে এসো! খোলা জায়গায় গেছ কেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল লোকটা। চিনতে পারল রানা ওকে। ডেভিড ব্রাউন, পোর্ট রিপ্রিভের মস্তান। রানার ডাক শুনে একটু ইতস্তত করল তখুনি দৌড় দেবে কিনা ভেবে। ব্যস্ত হাতে জিপ লাগাচ্ছে।

ঠিক তখনই প্রথম তীরটা উড়ে এসে পড়ল ওর পাশে। ভয় পেয়েছে ব্রাউন। ট্রাকের দিকে দৌড়াল সে জিপ আঁটতে আঁটতেই। বিস্ফারিত চোখে ভীত-চকিত দৃষ্টি। এক ঝাঁক তীর ছুটে আসছে এবার। একটা গেঁথে গেল ওর পিঠে। দৌড়াচ্ছে সে তখনও।

'ওকে ধরো!' চিৎকার করে উঠল রানা। দু'জন সিপাই ঠেসে ধরল ওকে। ছুটে গেল রানা। তীরটা পিঠ থেকে খুলে ফেলার নিষ্ফল চেষ্টা করছে ব্রাউন। ফলার অর্ধেকটা ঢুকে গেছে পিঠে। একটানে বের করে ফেলল রানা তীরটা। 'ছুরি দাও!' একজন বেয়োনেট খুলে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। তীর খুলে এসেছে ঠিকই কিন্তু ফলাটা রয়ে গেছে।

'বৃথা চেষ্টা করছেন, বস্। ও বাঁচবে না। ভয়ঙ্কর সাপের বিষ রয়েছে ওই তীরের ফলায়।'

বেয়োনেটের খোঁচায় মাংস সুদ্ধ ফলাটা বের করে নিল রানা। 'তুমি ঠিক জানো, যে সাপের বিষ ব্যবহার করে ওরা?'

'হ্যাঁ, কাসাভার সাথে সাপের বিষ। সাবধান, বস্। ওই ফলার আঁচড় যেন না লাগে কোথাও!'

'তুমি জঙ্গলের দিকে নজর রাখো। এগোতে দেখলেই ডাক দেবে আমাদের।'

'খামোকা ওর পেছনে সময় নষ্ট করছ, লুইস। ঠিকই বলেছে জো, সাপের বিষ ঢুকেছে ওর শরীরে। কেউ বাঁচাতে পারবে না আর ওকে।'

'সাপে কাটার ওষুধ কোথায়? ইঞ্জেকশন?'

'ক্যাম্পে আছে। কে যাবে খোলা জায়গার ওপর দিয়ে ওষুধ আনতে?'

'ইঞ্জেকশনে আর কাজ হবে না,' মন্তব্য করল একজন সিপাই। 'ওর চোখ দুটো দেখেছেন, ক্যাপ্টেন? মারা যাচ্ছে লোকটা!'

চোখের কালো অংশ ছোট হয়ে দিয়াশলাই কাঠির বারুদের আকৃতি নিয়েছে। শরীরটা মৃগী রোগীর মত কাঁপছে। বিষ ছড়িয়ে পড়ছে ডেভিড ব্রাউনের দেহে।

'ট্রাকে তোলো ওকে!' নির্দেশ দিল রানা।

ওকে ট্রাকে তুলে নিয়ে ব্যাক গিয়ারে ট্রাকটা ক্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে আসা হলো।

'নামাও ওকে,' বলল রানা। 'জলদি মেডিকেল কিট নিয়ে এসো!'

মেডিকেল কিট থেকে একটা অ্যাম্পুল বের করে মাথাটা টোকা দিয়ে ভেঙে সিরিঞ্জের সুঁই ডুবাল তাতে রানা।

বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছে ব্রাউন। আর ভীষণ ভাবে ঘামছে। ক্ষতটা লক্ষ্য করল রানা। রক্ত ঝরছে না, পীতাভ একটা কষের মত তরল পদার্থ দেখা দিয়েছে ক্ষতের মুখে।

'লুইস!' ছুটে এসে সামনে দাঁড়াল সুফিয়া। 'কি হয়েছে?'

'জংলীদের তীর খেয়েছে ব্রাউন। সরে যাও এখান থেকে, জামিলকেও আসতে দিয়ো না।'

'কেন?' ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারা। বুঝতে পেরেছে, ও ভয় পাবে বলেই এখান থেকে সরে যেতে বলছে ক্যাপ্টেন। না জানি কেমন বীভৎস মৃত্যু হয় বিষাক্ত তীর খেলে! 'আমার কোন সাহায্য দরকার হবে তোমার?'

'হ্যাঁ, এখান থেকে কেটে পড়ো। এটাই সবচেয়ে বড় সাহায্য হবে।' সুফিয়া সরে গেল কি গেল না, দেখবার সময় নেই; সিরিঞ্জের অর্ধেক ওষুধ পুশ করল রানা লোকটার বাম বাহুতে। ব্রাউনের ঘামে তৈলাক্ত শরীরটা একটু যেন বেশি ঠাণ্ডা বলে মনে হলো ওর।

'চিৎ করে শোয়াও ওকে,' আদেশ দিল রানা।

মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। মুখ থেকে লালা ঝরছে। ছোট ছোট শ্বাস নিচ্ছে ব্রাউন।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তামাশা দেখছ? জো-কে সাহায্য করো গিয়ে।' ধমকে উঠল রানা ফ্রেডকে ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

'এর শেষ না দেখে নড়ছি না আমি!' চকচক করছে ফ্রেডের চোখ জোড়া। মানুষের কষ্ট পেয়ে মরাটা যেন এক দারুণ মজার ব্যাপার।

তর্ক করার সময় নেই রানার। ইঞ্জেকশন দেবার জন্যে ব্রাউনের পেটের চামড়া টান করে ধরতেই সশব্দে মলত্যাগ করল সে নিজের অজান্তেই।

'কাণ্ড দেখেছ!' হিহি করে হেসে উঠল ফ্রেড দুরবস্থা দেখে।

'চুপ কর, হারামজাদা কোথাকার!' মুখ খারাপ করে বসল রানা। আবার সুঁই ঢুকিয়ে বাকি অর্ধেক ওষুধ ওর শরীরে পুশ করার চেষ্টা করতেই ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল ব্রাউনের গোটা শরীর। মট্ করে ভেঙে গেল সুঁই।

'এইবার মরছে ব্যাটা, কেমন কাটা মুরগীর মত লাফাচ্ছে দেখো। সত্যি দেখার মত একটা দৃশ্য!' প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছে ফ্রেড।

আর সহ্য করতে পারল না রানা, একলাফে উঠে দাঁড়াল। চড়াৎ করে পিস্তলের আওয়াজ তুলে প্রচণ্ড এক চড় পড়ল ফ্রেডের গালে। আচমকা চড় খেয়ে ট্যাঙ্কারটার ওপর ছিটকে পড়ল সে। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওর ওপর।

দু'হাতে গলা টিপে ধরেছে। ওর শ্বাস-নালীটা ইলাস্টিক পাইপের মত ছোট হয়ে যাচ্ছে রানার আঙুলের চাপে।

'একটা লোক মারা যাচ্ছে, আর মস্করা করছিস তুই, হারামজাদা! দ্যাখ্, কেমন লাগে মরতে!'

জিভ বেরিয়ে পড়েছে ফ্রেডের, ঠিকরে বেরিয়ে আসছে চোখ, এমনি সময়ে ছেড়ে দিল ওকে রানা।

ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল সে। খানিকক্ষণ হাঁ করে হাঁপাল। নিজের গলায় হাত বুলাচ্ছে, দুই চোখে প্রতিহিংসার আগুন।

'এর শোধ আমি নেব,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'তুমি কত বড় ক্যাপ্টেন হয়েছ দেখে নেব আমি!'

ডেভিড ব্রাউনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। এত চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না ওকে। দাপাদাপি করছে শরীরটা মাটির ওপর। মিনিট তিনেকের মধ্যেই গোটা কয়েক খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল। বীভৎস আকার ধারণ করেছে মুখের চেহারা।

'ট্রাকের পেছনে তুলে রাখো ওকে, আগামীকাল কবর দিতে হবে,' নির্দেশ দিল রানা দু'জন সৈনিককে।

উনিশ

সন্ধের আগেই টিনের ঘেরটা তৈরি হয়ে গেল। শুধু চারদিকে চারটে দেয়াল। কোন ছাদ নেই। টিনের গায়ে কয়েকটা ফুটো করা হয়েছে, দরকার হলে ওখান দিয়ে গুলি চালানো যাবে।

ডজন খানেক লোক স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারবে ওটার মধ্যে দাঁড়িয়ে, বসে। সাড়ে ছয়ফুট মত উঁচু হবে, দলের সবচেয়ে লম্বা লোকটাও নিরাপদ আশ্রয় পাবে ওখানে। চার দেওয়ালের একটা দিক ভেতরে ঢুকবার জন্যে খোলা রাখা হয়েছে। ভেতরে ঢুকে বন্ধ করা যাবে ওটা।

'ক্যাম্পে নিয়ে যাব আমরা এটাকে,' বলল রানা, 'ট্রাক দুটো ফেরত নিয়ে যাও জো আর ন্'গুয়েন।'

'যাচ্ছি···কিন্তু এটা নেবেন কি করে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল জো।

'কায়দা আছে—তোমরা ট্রাক নিয়ে যাও, আমরাও আসছি।' বারোজন লোক নিয়ে ভেতরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

ট্রাকদুটো ব্যাক করে ক্যাম্পে ফেরত নিয়ে গেল জো আর ন্'গুয়েন। একটা ছাদহীন ঘরের মত দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজের কাছে টিনের ঘেরটা। ভেতরে দুইধারে ছয়জন করে দাঁড় করিয়েছে রানা। 'ওই নিচের কাঠটা ধরে উঁচু করবে এটাকে।

রেডি?' ছয় ইঞ্চি উপরে উঠে গেল ওটা। বাইরে থেকে ওদের বুটগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে।

দূর থেকে দেখল জো, শুঁয়ো পোকার পায়ের মত পাগুলো নড়ছে, আর স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসছে গোটা ঘেরটা।

ক্যাম্পের লোকজন চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে ওদের। সবাই উপভোগ করছে, আনন্দ করছে। বালুবাদের বিষাক্ত তীর আর চারপাশের জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তুর কথা বেমালুম ভুলে গেছে ওরা।

ক্যাম্পে পৌঁছে থামল টিনের ঘের, নামল মাটিতে। পেছন দিকটা সামান্য একটু ফাঁক করে একজন একজন করে বের হয়ে ট্রাকের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় নিল সবাই। হাসি ঠাট্টা চলেছে ওদের মাঝে। 'যথেষ্ট আনন্দ হয়েছে, এবার যার যার কাজে মন দাও,' চিৎকার করে বলল রানা। ধীরে ধীরে নীরব হয়ে গেল সবাই। হেঁটে একেবারে মাঝখানে চলে এল রানা। গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'খিদে পেয়েছে তোমাদের?'

একবাক্যে সবাই জানাল হ্যাঁ, চোঁ-চোঁ করছে পেটের ভেতর।

'আজ আর কাল সকালের জন্যে খাবার আছে আমাদের, তারপরেই শেষ।' সবাই চুপ করে শুনছে রানার কথা। 'ব্রিজ মেরামত করে যত তাড়াতাড়ি নদী পার হতে পারি ততই মঙ্গল। কারণ এলিজাবেথভিল পৌঁছানোর আগে আর কোন দানা পেটে পড়বে না আমাদের।' মৃদু গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। 'শোনো। তোমরা সবাই দেখেছ, বাইরে বেরিয়ে কি অবস্থা হয়েছে ডেভিড ব্রাউনের। সার্জেন্ট মেজর তোমাদের জন্যে পাঁচ গ্যালনী ড্রামের ব্যবস্থা করছে, ছাউনি ছেড়ে বাইরে যাবার আর দরকার হবে না তোমাদের। মনে রেখো, সারা রাত ধরে যতই ঢোল পেটাক, আমরা খোলা জায়গায় না গেলে আমাদের একটা চুলও ছুঁতে পারবে না ওরা।' আবার গুঞ্জন উঠল। ঠিক কথাই বলেছে ক্যাপ্টেন। 'সার্জেন্ট আগু, তৈরি হয়ে যাও। অন্ধকার হলেই সার্চ লাইটগুলো জ্বালাবে তুমি।'

কথা শেষ করে ক্রাইসলারের কাছে চলে এল রানা। একা গাড়িতে বসে একটা বই পড়ছে সুফিয়া। জামিল তার আঙ্কেল জো-কে সাহায্য করতে ব্যস্ত। হেলমেটের স্ট্র্যাপ খুলে ওটা সীটের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। ঘামে ভিজে গেছে চুল। আঙুল চালিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল।

'ইস, ঘেমে কি অবস্থা হয়েছে তোমার!' চোখের চারপাশ কালচে হয়ে গেছে রানার অত্যধিক খাটুনিতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করল সুফিয়া। তারপর বলল, 'আজ তোমাকে সারা রাত ঘুমাতেই হবে। এখানেই ভাল করে বিছানা করে দেব আমি।'

'তোমার সাথে?' অবাক হলো রানা। 'আর জামিল?'

'জামিল ওর আঙ্কেল জো-র সাথে ট্রাকে ঘুমাবে বলে বায়না ধরেছে। বাঘ

সিংহ গরিলা গণ্ডারের কিছুই নাকি বাদ রাখেনি আঙ্কেল, সব মেরেছে। সেই গল্প শোনায় ঘুমের আগে। কেন, সবাই জেনে যাবে বলে বলছ?'

'না, তা ঠিক না...তবে...'

'পরোয়া করি না আমি!' ঘোষণা করল সুফিয়া।

'লজ্জাও না?'

'না।'

'বেশ, তবে তাই হোক।' হাই তুলল রানা।

অন্ধকার হবার ঠিক দুই ঘণ্টা পর শুরু হলো ড্রাম । রানার বুকে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে সুফিয়া। ড্রামের শব্দে আর ভয় পাচ্ছে না। ক্লান্ত, তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ দেহ-মন।

অঘোর ঘুমে অচেতন ক্যাপ্টেন লুইস পেগান।

সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথেই ওরা পৌঁছল ব্রিজের কাছে। বহু পা ওয়ালা একটা টিনের কচ্ছপের মতই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ওরা খোলা রাস্তার উপর দিয়ে। হাসি ঠাট্টা চলেছে ভেতরে।

'আর কথা না, অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে!' চুপ করিয়ে দিল জো।

কাজ শুরু করল ওরা। এক ঘণ্টার মধ্যেই রোদে তেতে উঠে আভেনের মত হয়ে গেল ভেতরটা। কোমর পর্যন্ত জামা খুলে দরদর ঘামছে, আর কাজ করছে সবাই। হাতুড়ি, করাত, ছেনি নিয়ে নির্দেশ মত যে যার কাজে ব্যস্ত। দুপুরের মধ্যেই তক্তা চারটে তৈরি হয়ে গেল। ব্রিজের ফাঁকটায় দুটো করে বসিয়ে সবাইকে ওটার ওপর দাঁড় করিয়ে কতটা শক্ত হয়েছে পরীক্ষা করে দেখল রানা।

'কেমন বুঝছেন, বস্?' সরল প্রশ্ন করল জো।

'চারটেয় কাজ হতে পারে। নিচে কিং পোস্ট লাগিয়ে নেব আমরা।'

'ওই ট্যাঙ্কারটা নিয়েই ভয়, অনেক ওজন ওটার।'

'জানি, কিন্তু ঝুঁকি নিতেই হবে আমাদের। প্রথমে ফোর্ডটা, তারপরে ট্রাকগুলো, সবশেষে ট্যাঙ্কার পার হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জো। 'একটা বিয়ার না খেলে হচ্ছে না, কি বলেন, বস্?'

'তোমার স্টক কি এখানে নিয়ে এসেছ?' ভুরু দুটো থেকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘাম ঝরাল রানা।

'আমার প্যান্ট আর বিয়ার ছাড়া আজকাল কোথাও যাই না আমি।' ছোট্ট একটা ক্রেট বের করল জো ওর ঝোলা থেকে। বোতলের ঠোকা ঠুকিতে মিষ্টি মেয়েলী আওয়াজ হলো। 'বস্, শব্দটা শুনেছেন, কি মিষ্টি না?'

'শুনেছি। যেন জলতরঙ্গ!' হাসল রানা। 'ঠিক আছে, দশ মিনিট বিশ্রাম নাও

সবাই।

ছয়টা বোতল বের করে বারো জনের জন্যে চারটে বোতল বরাদ্দ করল সে। রানা আর জো বাকি দুটো নিয়ে বসল। 'এরা এ জিনিসের ঠিক কদর বোঝে না, এদের বেশি দিয়ে লাভ নেই,' চোখ টিপে জানাল জো রানাকে, 'শুধু শুধু নষ্ট হবে।'

ঢক ঢক করে শেষ করে ফেলল রানা নিজের বিয়ারটা। সূর্যের তাপে গরম হয়ে যাওয়া বিয়ার তৃষ্ণা বাড়াল বই কমাল না। বোতলটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'বাকি কাজটা এবারে শেষ করে ফেলা যাক। গজাল ঠুকে তক্তাগুলো ঠিক মত বসিয়ে দিতে হবে।'

'আরে!' অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে চাইল বিগ জো। 'কসম খোদার, বস্, এত কম সময়ে দশমিনিট পার হতে এর আগে কোনদিন দেখিনি আমি!'

'তোমার ঘড়ি স্লো চলছে, জো,' জবাব দিল রানা। 'এসো, বাকি তক্তাগুলো জায়গা মত বসিয়ে ফেলি।'

কাজে লেগে গেল সবাই। ভারি তক্তা নিয়ে নড়াচড়া করছে ওরা। এখন আর হাসি মস্করা নেই, ভারি কাজ করতে করতে হাঁপ ধরে গেছে ওদের। মুখ দিয়ে ছোট ছোট শ্বাস আর গালি ছাড়া কিছুই বেরুচ্ছে না আর।

'দড়ি লাগাও।' আদেশ দিল রানা। দড়ি লাগানোর পরে নিজে গিঁঠ পরীক্ষা করে জো-র দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল সে।

'তোল্, পাগ্লা।' অনুমতি দিল জো তার লোকজনকে। 'দু'জন শুধু দড়ি ধরে থাক।'

আস্তে আস্তে শূন্যে উঠে গেল গুঁড়ির মত মোটা তক্তার একদিক। একদম সোজা দাঁড়ানোর পর একটু ওদিকে হেলতেই রশিতে টান পড়ল।

'এবার ধীরে ধীরে ঢিল দিয়ে নামাও,' বলল রানা।

প্রথম দিকে ঠিকই আস্তে আস্তে নামছিল—কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী পার হবার পরই মাটির টানে দ্রুত নেমে এল ওটা।

'টেনে ধর, উল্লুক! টান!' চেঁচিয়ে উঠল জো। উত্তেজনায় তার অর্ধনগ্ন শরীরের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে।

খুব জোরে টেনে ধরেছিল ওরা বাঁকা হয়ে। কিন্তু তক্তার ওজন সামলাতে পারল না, টানের চোটে সামনে এগিয়ে আসতে বাধ্য হলো ওরা। শব্দ করে পড়ল তক্তাটা ওদিকের পোড়া থামের ওপর ছাই কালির মেঘ উড়িয়ে। এখনও কাঁপছে তক্তা।

'আর একটু হলেই গেছিল!' ধমকে উঠল জো, 'কি করো, রুটি খাও না?'

'খাই, কিন্তু আপনার মত অত না!' কাঁচুমাচু মুখ করে জো-র বিরাট বপুর প্রতি কটাক্ষ করল একজন।

এত উত্তেজনার মধ্যেও হাসির একটা রোল উঠল।

'কথা কম, কাজ বেশি!' তাড়া দিল ওদের অপ্রস্তুত জো।

দ্বিতীয় তক্তাটা উঠে গেল ওপরে। নামছে এবার। এবারও সামলাতে পারল না ওরা। কপাল মন্দ। খুঁটিতে বাড়ি খেয়ে পাশ দিয়ে নিচে নদীতে গিয়ে পড়ল ওটা। ঝপাং করে শব্দ তুলে পানি ছিটিয়ে ডুবে গেল তলায়। একটু পরেই আবার ভেসে উঠে প্রবল স্রোতের টানে চলল ভাটির দিকে।

'সর!' লাফিয়ে এসে দড়িটা ছিনিয়ে নিল জো ওদের হাত থেকে। দড়ির টানে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে তক্তাটা এখন। স্রোতের বিপরীতে ধীরে ধীরে টেনে কাছে নিয়ে এল ওটাকে জো।

কয়েকজনে মিলে 'হেঁই মারো হেঁইও' করে টেনে টেনে উপরে তুলল ওটাকে ওরা। উপরে না ওঠা পর্যন্ত মেশিনগানের মত একটানা গালাগালি চালিয়ে গেল জো। অবাক হলো রানা ওর গালির স্টক দেখে। একটা গালও সে একবারের বেশি দুবার উচ্চারণ করেনি!

'সত্যি, জো, তুমি একটা গালাগালির চলন্ত ডিক্‌শনারী। একটা বই লেখো না কেন?' মন্তব্য করল সার্জেন্ট আগু। নির্জলা ভক্তি এসে গেছে তার বিগ জো-র ওপর।

'আগে ব্রিজটা ঠিক করে নিই!' গম্ভীর মুখে জবাব দিল জো।

জো-র গালাগালির ঠেলায় আবার উঠল তক্তা আকাশে। এবারে তিনজনে ধরেছে রশি। বাধ্য ছেলের মত এবারে ঠিক জায়গামত ফিট হলো ওটা আগেরটার পাশে।

'গাল না খেলে সোজা হয় না কেউ। এবারে কেমন সিজিল মত বসেছে তক্তাটা, দেখেছেন, বস্?'

কাজ অনেক সোজা হয়ে গেল এবার। প্রথমে টিনের ঘরটা আগে বাড়াল ওরা। আগের বসানো তক্তার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে জায়গা মত বসানো হলো। পেরেক গজাল মেরে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আজকের মত কাজ শেষ করতে সন্ধে হয়ে এল। সারাদিনে তিনবার বদল হয়েছে কর্মীদল, কিন্তু রানা আর বিগ জো-কে রিলিফ দেয়ার কেউ নেই। সারাটা দিনই থাকতে হয়েছে ওদের দু'জনকে কাজের তদারকিতে।

সন্ধ্যা। ক্লান্ত, অবসন্ন লোকজন ফিরে এল ক্যাম্পে টিনের বেড়া বয়ে নিয়ে। এবড়োখেবড়ো কাঠ নিয়ে সারাদিন কাজ করে প্রায় সবার হাতেই এখানে-ওখানে ছড়ে-ছিলে গেছে। তবে, ক্লান্ত হলেও সবাই তৃপ্ত। কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখে আসতে পেরেছে ওরা। এখন শুধু আর একটা দিনের অপেক্ষা, তারপরই মুক্তি।

'সার্জেন্ট আগু,' ডাকল রানা।

'জি, ক্যাপ্টেন?'

'একটা সার্চ লাইট সারা রাত ব্রিজের চারপাশে ঘুরাবে। খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আমাদের বন্ধুরা এসে আবার ব্রিজ পুড়িয়ে দিক, এটা আমি চাই না।'

'ব্যাটারি যা আছে তাতে সারারাত চলবে না, ক্যাপ্টেন,' নিচু গলায় বলল আগু।

'তাহলে একবারে একটা করে ব্যবহার করবে। ব্রিজ আমাদের সারা রাত পাহারা দিতেই হবে।'

'ওকে, ক্যাপ্টেন।' নিজের কাজে চলে গেল আগু।

জো-র দিকে এগিয়ে গেল রানা, 'তোমার বিয়ারের স্টকের অবস্থা কি?'

'আর মাত্র দুই কেস আছে, বস্।' মাথা চুলকাতে চুলকাতে জবাব দিল সে। বিপদ ঠিকই টের পেয়ে গেছে।

'আজকে যারা ব্রিজের কাজে গেছিল তাদের সবাইকে এক বোতল করে দাও।'

'পুরো এক বোতল, বস্?' রানা কটমট করে চাইতেই বলে উঠল, 'অবশ্য অনেক খেটেছে ওরা।'

'আর শোনো, চারজন লোক লাগিয়ে দাও রাতেই ট্রাকগুলোয় তেল ভরে নেয়ার জন্যে। ট্যাঙ্কারের ওজন যত কমে ততই মঙ্গল।'

'ঠিক বলেছেন, বস্। আমি এখনই লোক লাগিয়ে দিচ্ছি।'

একটা ট্রাকের ধারে দাঁড়িয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে নখ পরিষ্কার করছে ফ্রেড।

'এদিককার কি খবর, ফ্রেড, সব ঠিকঠাক তো?' সরল মনেই প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ, কি মনে করো তুমি নিজেকে? মনে করো, তুমি না থাকলেই আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে? সবাইকে কচি খোকা মনে করো নাকি তুমি?'

তর্ক করার রুচি নেই রানার। সারাদিন কাজ করে একেবারে পরিশ্রান্ত সে। বলল, 'আজ রাতে পাহারার চার্জে থাকবে তুমি। ভোর পর্যন্ত।' ওকে এতক্ষণ একটানা খাটাবার ইচ্ছে ছিল না রানার, কিন্তু ইনসাবর্ডিনেশনের জন্যে এটা ফ্রেডের প্রাপ্য বলে মনে হলো ওর।

ভিতরে ভিতরে জ্বলে গেল ফ্রেড। 'সারা রাত পাহারা দেব, না? আর তুমি? তুমি কি করবে সারারাত?' হাত মুঠো করে অশ্লীল ইঙ্গিত করল সে ক্রাইসলারের উদ্দেশে। তারপর কোমর নেড়ে দেখাল।

কোন জবাব না দিয়ে ফিরে এল রানা গাড়ির কাছে। জো-র সাথে রিফিউয়েলিং তদারক করছে জামিল, হাতে চকলেট।

'কি খবর, ব্রিজের কাজ শেষ?'

রানাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুফিয়ার মুখ।

'না, আরও একদিন লেগে যাবে কাজ পুরো শেষ করতে।'

'ইস, কি অবস্থা হয়েছে তোমার হাতের!' রানার হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে

ভাল করে পরীক্ষা করল সে। হাতে কাঠের চিলতে ঢুকেছে কয়েক জায়গায়। 'দাঁড়াও, সুঁই দিয়ে ওগুলো বের করে দিচ্ছি আমি, নইলে ফুলে উঠবে হাত।'

ফ্রেডের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। ভুরু কুঁচকে চেয়ে ছিল এই দিকে, রানার চোখে চোখ পড়তেই ঝট করে ঘাড় ফেরাল অন্যদিকে।

বিশ

ভোর হয়ে আসছে। ব্রিজের কাঠামোটা আবছা মত দেখা যাচ্ছে ভোরের আলোয়। চুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। খিদেয় পেট জ্বলছে রানার। বনের মধ্যে একটানা বেজেই চলেছে ড্রাম। কিন্তু কানে সয়ে গেছে শব্দটা। কেউই আর ওদিকে খেয়াল করছে না এখন।

'ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে,' বলল জো সার্চ লাইটের হলুদ আলোর দিকে চেয়ে। মাঝরাত থেকে ডিউটিতে রয়েছে সার্জেন্ট আগু, এখনও ওটাকে ব্যস্তভাবে ব্রিজের চারপাশে ঘোরাচ্ছে।

'উহ্, যা খিদে পেয়েছে না আমার! একটা পোর্টার হাউস স্টেক আর দুটো ডিমের জন্যে প্যান্ট খুলে দিতেও রাজি আমি।' খিদেয় ছটফট করছে জো।

লোভনীয় খাবারের কথায় রানার জিভে জল এসে গেল। জোর করে মনের পর্দা থেকে সুস্বাদু খাবারের ছবি মুছে ফেলে বলল, 'আজও বোধ হয় ব্রিজ পার হওয়া যাবে না।'

'না, পুরো একদিনের কাজ এখনও বাকি, বস্,' রানার মন্তব্যে সম্মতি জানাল জো। 'বিকেলের আগে যদি সারা যেত...'

'যাবে না। সন্ধে পেরিয়ে যাবে। আজকে ব্রিজের কাজ আমি একা দেখব। ফ্রেড ক্যাম্পে থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে পালা করে আমাদের কাভার দেবে। আর তুমি বারোজন লোক সাথে নিয়ে মাইল দশেক পেছনে যাবে দুই ট্রাক ভর্তি জ্বালানী কাঠ আনতে। অনেক কাঠ লাগবে। সারা রাত ক্যাম্পের চারপাশে আগুন জ্বেলে ওই আলোতেই পাহারা দেব আমরা।'

'বুদ্ধিটা ভালই, কিন্তু ব্রিজের কি হবে, বস্?' প্রশ্ন করল জো।

'পাহারা বসাতে হবে ব্রিজে,' চিন্তিতভাবে জবাব দিল রানা।

'কে পাহারা দেবে? আমি যাচ্ছি না। ব্রায়ানের মত হাঁড়িতে চড়তে চাই না আমি,' আগে থেকেই জানিয়ে দিল ফ্রেড।

'তোমাকে পাহারায় যেতে বলেনি কেউ!' ধমকে থামিয়ে দিল রানা ওকে। 'অনেক কাঠ লাগবে আমাদের। সিভিলিয়ানদেরকেও কাজে লাগাবে। বুঝেছ?'

ঘাড় কাত করে জানাল জো, বুঝেছে সে।

ব্রিজ ঠিক করতে করতে বিকেল হয়ে গেল রানার। কিং পোস্টগুলো জায়গামত বসানোর জন্যে রানাকে চারজন সহ নিচে নামতে হয়েছিল। যতক্ষণ নিচে ছিল খুব অসহায় বোধ করেছে সে। বালুবারা তীর ছুঁড়লে ওদের করার কিছুই ছিল না। কিন্তু একটা তীরও আসেনি। কপাল ভাল ওদের। নদীর ধারের ঝোপ থেকে তীর মারলে বাঁচার কোন উপায় ছিল না।

কাজ শেষ করে শেষ বারের মত সব খুঁটিয়ে দেখল রানা। এঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন কনটেস্টে প্রাইজ না পেলেও কাজ চলার মত হয়েছে।

'চলো, এবার ফেরা যাক।' সহকর্মীদের উদ্দেশে বলল সে। সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিল। ফিরে এল ওরা ক্যাম্পে।

শুরু হয়েছে ড্রাম।

ক্যাম্পের চারপাশে বিশ তিরিশ ফুট দূরে দূরে আগুন জ্বালা হয়েছে। ঘুরেফিরে চারদিক দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো রানা। যথেষ্ট আলো পাওয়া যাচ্ছে আগুন থেকে। ব্রিজটাও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে। ক্যাম্পে যারা থাকবে তাদের মধ্যে ডিউটি ভাগ করে দেয়া হলো।

'রেডি, জো?' নিজে ব্রিজ পাহারায় থাকবে বলে ঠিক করেছে রানা।

'ইয়েস, বস্।' ছয়জন সশস্ত্র সিপাইসহ টিনের ঘেরার ভেতরে ঢুকল জো।

ব্রিজের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ব্রিজের ওপরেই রাত কাটাবে ওরা আজ।

মাঝরাতের আগেই শীত করতে লাগল ওদের। বেশ বাতাস বইছে। আকাশে মেঘ নেই যে দিনের উত্তাপটাকে ধরে রাখবে।

পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়েছে রানা আর জো। দু'জনের হাতেই অটোমেটিক রাইফেল। অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে। ক্যাম্পের আগুনে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে ব্রিজের মেরামত করা অংশটা।

'ঘন্টা খানেকের মধ্যেই চাঁদ উঠবে,' বলল জো।

'হ্যাঁ, ছোট চাঁদ। তবু তার আলোয় বেশ দেখতে পাব আমরা।' নিচের নদীটার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা। ওই পথেই এসেছিল ওরা ব্রায়ান আর তার সঙ্গীদের শেষ করতে।

'টর্চটা জ্বালান না, বস্?' অনুরোধ করল জো। এত অন্ধকার ভাল লাগছে না ওর।

'না, এখন না, ওদের আওয়াজ পেলে জ্বালব।' ডান হাত থেকে বাম হাতে পাচার করল রানা টর্চটা।

'কিন্তু যদি আওয়াজ না পাই?' কুণ্ঠিত ভাবে বলল সে।

'নৌকো নিয়ে এলে দাঁড়ের আওয়াজ পাওয়া যাবে। যদি সাঁতার কেটে আসে,

তাও ঠিকই টের পাব আমরা। ওদের ভিজে গা থেকে পানির ফোঁটা পড়ার শব্দ হবে।'

'ব্রায়ান আর তার লোকজন তো টের পায়নি?'

'ওদের কপাল খারাপ ছিল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। নদীতে পানি পড়ার শব্দকে ওরা বৃষ্টির শব্দ বলে ভুল করেছিল,' ব্যাখ্যা করল রানা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। চিন্তা করছে জো, ভুল বলেনি ক্যাপ্টেন। মেঘমুক্ত আকাশ আজ, ওরা এলে ঠিকই টের পাওয়া যাবে। হঠাৎ খুব কাছ থেকে একটা শব্দ এলো কানে। চমকে উঠল জো, তারপর হেসে ফেলল। নাক ডাকার শব্দ। একজন সিপাই বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনিট খানেক অবাক হয়ে চেয়ে রইল জো ওর দিকে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আওয়াজটা। ওর পাশে বসা দু'জন হাসছে নিঃশব্দে। কষে একটা লাথি লাগাল জো ওর পাছায়। ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসল লোকটা।

'স্বপ্ন দেখছিলে?' নরম গলায় জানতে চাইল জো।

'কই, আমি তো ঘুমাইনি!' প্রতিবাদ করল লোকটা। গম্ভীর।

'তাহলে ঘাড় গুঁজে কি করছিলে?'

'চিন্তা করছিলাম আমি।'

'ও, তাই নাকি! চিন্তা করছিলে? তা, বেশ তো, করো, কিন্তু অত জোরে না। আমি তো ভেবেছিলাম করাত দিয়ে ব্রিজ কাটতে লেগে গেছ তুমি।'

হেসে উঠল সবাই। আরও আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

'বেশ ভাল জ্বলছে ক্যাম্পের আগুন,' মন্তব্য করল জো।

ঘাড় ফিরিয়ে টিনের ফুটো দিয়ে দেখল রানা। আবছা আঁধার বাগানে হলদে সূর্যমুখীর মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। বলল, 'হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে সকাল পর্যন্ত চলবে। ভাল কাঠ এনেছ তুমি।'

আবার চুপচাপ হয়ে গেল ওরা। অপেক্ষা করছে। মশার পিনপিন আওয়াজ আর নিচে খুঁটিগুলোর সাথে স্রোতের বাড়ি খাওয়ার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পিস্তলটা সুফিয়ার কাছে রয়ে গেছে। ওটা সাথে করে নিয়ে এলে ভাল হত। বেয়োনেটটা রাইফেলের মাথা থেকে খুলে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করে বেল্টের খাপে গুঁজে রাখল সে।

'উহ্, খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে!' নড়ে উঠল জো।

'বেশি মোটা তুমি, এই সুযোগে দেখো যদি কিছুটা কমতে পারো।' আবার চুপচাপ প্রতীক্ষা।

ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল রানা। অন্ধকারে নিচে কি সব নড়ে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছে। টর্চ জ্বালবার অদম্য ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দাবাল সে। চোখের ভুল নয় তো? ঠিক আছে, চোখ বুজে দশ পর্যন্ত গুনে আবার ভাল করে চেয়ে দেখবে সে। চোখ বুজতেই রানার কাঁধে আস্তে চাপ দিল জো। চোখ খুলল রানা। না, চোখের

ভুল নয়, জো-ও টের পেয়েছে কিছু।

'শুনেছেন, বস্?' ফিসফিসিয়ে রানার কানে বলল জো।

পানিতে পানির ফোঁটা পড়ার আওয়াজ পেল রানা। কি যেন একটা ব্রিজের সাথে ধাক্কা খেল, খুব আস্তে। শব্দটা কানে না শুনলেও অনুভব করল সে।

পাশের সিপাইয়ের কাঁধে টোকা দিল রানা। বিপদ টের পেয়ে শক্ত হয়ে গেল ওর দেহটা মুহূর্তের জন্যে। একটু অপেক্ষা করল রানা। সবার কাছে সিগনাল পৌঁছে গেছে। ফাঁক দিয়ে রাইফেল ধরে নিচের দিকে তাকাল রানা। দপ্ করে জ্বলে উঠল টর্চটা। তরতর করে উঠে আসছে ওরা। মিশমিশে কালো ন্যাংটো দেহগুলো চকচক করছে পানিতে ভিজে। গায়ে উদ্ভট নক্সার উল্কি। সামনের লোকটার কপালটা ঢালু, ঠিক শিম্পাঞ্জীদের মত। হাতে পাঙ্গার লম্বা ফলা ঝিকমিক করছে। লোকটা চেয়ে আছে উপর দিকে মুখ করে ওর দিকেই।

গুলি করল রানা। থরথর করে কাঁপছে রানার দেহ অটোমেটিক রাইফেলের ধাক্কায়। আগুনের ফুলকির মত একটার পর একটা গুলি গিয়ে বিঁধছে ওদের দেহে, আর ঝপাং ঝপাং করে পানি ছিটিয়ে পড়ছে ওরা নিচে। খুঁটিগুলোর আশেপাশে দেহগুলো একটা করে গুলি খাচ্ছে আর ছটফটিয়ে বেঁকে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। গলা চিরে বেরিয়ে আসছে মরণ আর্তনাদ।

ম্যাগাজিনটা শেষ হতেই আরেকটা টেনে বের করল রানা বেল্ট থেকে। জো আর তার লোকজন ওদিকে রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওদের নিচের স্তূপগুলোর ওপর গুলি চালাচ্ছে।

'আরেক থাম বেয়ে উঠছে ওরা, বস্!' সাবধান করে দিল জো।

রানার পায়ের কাছে গর্ত গলে একটা মাথা উঠে এল। বুক পর্যন্ত উঠে পড়েছে সে।

হাতে পাঙ্গা! ভীষণ আক্রোশে পাঙ্গা ঘুরাল সে রানার পা লক্ষ্য করে। টর্চের আলোতে চোখ দুটো জ্বলছে ওর হিংস্র শ্বাপদের মত।

লাফিয়ে পিছিয়ে গেল রানা। ছুরিটা ইঞ্চিখানেকের জন্যে তার হাঁটুর নাগাল পেল না। পোকার মত কিরকির করে মুহূর্তে বেরিয়ে এল লোকটা গর্ত দিয়ে।

তীক্ষ্ণ বুক কাঁপানো একটা হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার ওপর।

বেয়োনেট ছাড়াই চার্জ করল রানা। ডান চোখে চার ইঞ্চি ঢুকে গেল রাইফেলের নল। চোখ গলে পানির মত কি যেন নামছে রাইফেলের নল বেয়ে।

টেনে, ঘুরিয়ে চেষ্টা করেও কিছুতেই ছুটাতে পারল না রানা রাইফেল। রাইফেলের সাইট আংটার মত গেঁথে গেছে হাড়ের সাথে। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা। ওর পিছনেই আর একটা মাথা জেগে উঠছে।

রাইফেল ছেড়ে পাঙ্গাটা তুলে নিল রানা। লাফিয়ে অসাড় দেহটা পার হয়ে গর্তটার কাছে চলে এল। দুহাতে ভারি পাঙ্গা তুলে ধরেছে মাথার ওপরে।

ফেঁসে গেছে লোকটা। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কিছুই করার নেই ওর। মুখ তুলে চাইল সে রানার দিকে। মুখটা একটু হাঁ হয়ে আছে শঙ্কায়।

লাকড়ি ফাড়া কোপ মারল রানা ওর মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে প্যান্ট ভিজিয়ে দিল ওর। কাঁচা লোহা দিয়ে তৈরি পাতটা ভেঙে ওর মাথাতেই গেঁথে রইল।

চারপাশটা জরিপ করে দেখল রানা। ওদিকের গার্ড রেইল পার হয়ে ব্রিজের ওপর উঠে এসেছে একদল বালুবা। সামান্য আলোয় চকচক করছে ওদের ভিজে দেহ। একজন সেপাই মরে পড়ে আছে। মাথাটা কাত হয়ে আছে পিছন দিকে। রাইফেলটা এখনও হাতে ধরা।

'জো!' চিৎকার করে সাবধান করল রানা, 'তোমার পেছনে! টপকে ঢুকে পড়ছে!' পাঙ্গার হাতলটা ফেলে ছুটে গিয়ে রাইফেল তুলে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পৌঁছবার আগেই পাঙ্গা চালাল বালুবা লোকটা রানার মাথা লক্ষ্য করে। হাঁটু ভেঙে ঝপ করে নিচু হয়ে বসে পড়ল সে। কোপটা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। আবার কোপ মারার আগেই ব্লাড হাউণ্ডের মত লাফ দিল রানা, জড়িয়ে ধরল ওকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান কনুইয়ের প্রেসার পয়েন্ট টিপে ধরেছে সে। চাপ বাড়াতেই চিৎকার করে উঠল লোকটা। শব্দ করে পাঙ্গাটা পড়ল ব্রিজের ওপর। বাম হতে গলা জড়িয়ে ধরে খাপ থেকে বেয়োনেটটা বের করে নিল ডান হাতে। ওর মুখটা ঠেসে ধরেছে রানা নিজের কাঁধে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না ও, অন্ধের মত খামচাচ্ছে শুধু; লক্ষ্য রানার চোখ। নাকের কাছে খামচি খেল রানা। বেয়োনেটটা পুরো ঢুকিয়ে দিল ও লোকটার বুকে। কেঁপে উঠল লোকটা, বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। লোকটা মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না রানা। ওকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাইফেলটার ওপর।

রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল ব্রিজের গার্ড রেইল-এর ওপর দাঁড়ানো আরেক বালুবা। জো তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা দেহটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর লাশের বাড়ি খেয়ে উল্টে নিচে পড়ল লোকটা।

রাইফেল নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। একসারিতে অনেকগুলো বালুবা এগিয়ে আসছে। নিচে থেকে অসংখ্য লোক চিৎকার করে উপরের সাথীদের উৎসাহ আর সাহস জোগাচ্ছে।

ট্রিগার টিপে ধরল রানা। এত কাছে থেকে মিস হবে না। কোন সুযোগই পেল না ওরা। আর্তনাদ করে উল্টে উল্টে পড়ল নিচের নদীতে একের পর এক। বাকি গুলি নিচের লোকদের ওপর শেষ করে বেল্ট থেকে আর একটা ম্যাগাজিন বের করল রানা। লোড করে লক্ষ করল পালাচ্ছে ওরা। ডুব সাঁতার দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে মাথাগুলো শ্বাস নেবার জন্যে। রাইফেল নামিয়ে

নিল রানা। ঘুরে দেখল তার বেয়োনেট খেয়েও বালুবা লোকটা মরেনি এখনও তিনজন সেপাই বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে ওকে। এখনও কাতরাচ্ছে ও। অসম্ভব জীবনী শক্তি! অবাক হলো রানা। মুখ ঘুরিয়ে নিল ও।

গরুর শিং-এর মত একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। কাতরানি থেমে গেছে এখন।

'বস্, ঠিক আছেন তো?' জো এসে দাঁড়াল পাশে।

'আমি ঠিকই আছি, তোমার খবর কি?'

'খবর ভাল, বস্! কিন্তু ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। খোদাই জানে, এই হুড়োহুড়িতে আমার বোতলগুলো ঠিক আছে কিনা!' ঝোলাটা খুঁজতে চলে গেল সে।

চার মিনিট। সাতঘণ্টা নিষ্ক্রিয় অপেক্ষার পর চার মিনিট উন্মত্ত কর্মব্যস্ততা। যুদ্ধের রীতিই এই। শুধু যুদ্ধ কেন জীবনটাই এই রকম।

একটা চিৎকার ভেসে এল ক্যাম্পের দিক থেকে, 'তোমাদের কি খবর?' সার্জেন্ট আগুর গলা। চিনতে পারল রানা। 'সব ঠিক আছে তো?' এত গোলাগুলির শব্দে উদ্বিগ্ন হয়েছে সার্জেন্ট।

'মেরে ভাগিয়ে দিয়েছি আমরা ওদের,' চেঁচিয়ে বলল জো। 'নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে পারো তোমরা। আরে, না না! সত্যি সত্যিই আবার ঘুমিয়ে পোড়ো না!'

টর্চ জ্বেলে মৃত বালুবাটার মুখ দেখল রানা। ওর গালের আর কপালের উল্কি ছাড়া চেহারায় খুব একটা তফাৎ নেই ওর রানার দলের বাম্বালা আর বাকুবাদের সাথে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত টর্চ ঘুরিয়ে দেখল সে। হাত-পাগুলো সরু সরু হলেও পাকানো দড়ির মত, পেশী বহুল। অপুষ্টির ফলে পেটটা দেহের অনুপাতে অনেক বড়। আবার মুখের ওপর টর্চ ধরল রানা। বেজায় পুরু ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে। মুখের ভেতরে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। চোখা চোখা দাঁত। হাঙ্গরের মত। ঘষে ঘষে ওগুলোকে চোখা করা হয়েছে।

'এটাই শেষ, বস্,' বলল জো, 'এটাকেও নদীতে ফেলে দিই, কি বলেন? কুমীরের ভোজ হোক?'

'হ্যাঁ, সেই ভাল,' সম্মতি দিল রানা।

অনায়াসে দেহটা তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল জো। শব্দ করে নদীতে পড়ল ওটা। হাত দুটো গার্ড রেইলের ওপর মুছে নিয়ে রানার পাশে এসে বসল জো।

'শালা শিম্পাঞ্জী!' তিক্ত গলায় বলল জো। আফ্রিকার বিভিন্ন উপ-জাতীয়দের মধ্যেকার আদি বিরোধ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ওর স্বরে। 'ইউ এন-এর লোকজন বিদায় নিলেই ওদের একটু শিক্ষা দিতে হবে। এখনও যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি ওদের।'

হাসল রানা। এসব বিবাদ-বিসম্বাদের কোন অর্থ নেই ওর কাছে। ঘড়ি দেখল দু'ঘণ্টার মধ্যেই ভোর হয়ে যাবে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর।

'ওরা আর আসবে না, বস্,' বলল জো, 'আপনি একটু শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন। আমি সজাগ থাকছি।'

'প্রস্তাবটার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু ঘুম আসবে না আমার এখন। তাই তোমার সাথে আমিও সজাগ থাকব।'

'একটা বিয়ার খাওয়া যাক, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, একটা বিয়ার হলে মন্দ হয় না,' রাজি হয়ে গেল সে।

উঠে গিয়ে দুটো বিয়ার নিয়ে এল জো।

নীরবে বিয়ারে চুমুক দিল রানা। ক্যাম্পের আগুনগুলোর দিকে চেয়ে দেখল তেজ কমে এসেছে আগুনের। এখন আর শিখা নেই, কয়েকটা লালচে স্তূপের মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। কিন্তু জো ঠিকই বলেছে, জানে রানা। ওরা আজ রাতে আর আক্রমণ করবে না।

একুশ

সূর্য উঠেছে। ফোর্ড ক্রাইসলারটার পাশে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া টিনের আচ্ছাদনটার দিকে চেয়ে আছে রানা। লম্বা ছায়া পড়েছে ওর দেহের।

কিছু বাকি রয়ে গেল না তো? আর একবার ভেবে দেখল রানা। ব্রিজ পার হবার প্রস্তুতি শেষ। কিছু ভুলে যাচ্ছে না তো সে?

ফ্রেডকে বারো জন সোলজার ও বারোজন সিভিলিয়ানের চার্জ দিয়ে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে রানা। ওপারে টিনের আড়ালে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। ওদিক থেকে বালুবা আক্রমণ হলে ঠেকাবে।

ফোর্ডটা নিয়ে প্রথমে পার হবে সুফিয়া আর জামিল। একে একে ট্রাকগুলো পার হবে তারপরে। ট্রাকগুলো খালিই পার করা হবে। তাতে ব্রিজ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। একটা করে লরি ওপারে পৌঁছলেই টিনের আড়ালের লোকগুলোকে তাতে তুলে ফ্রেড এপার থেকে আরেক ব্যাচ নিয়ে অপেক্ষা করবে দ্বিতীয় ট্রাকের জন্যে। সেটা পার হলে আবার টিনের ঘের নিয়ে ফিরে আসবে তৃতীয় ব্যাচ পার করার জন্যে। ট্রাকের ক্যানভাসের নিচে নিরাপদেই থাকবে সবাই। শেষ ট্রাকটা লোড করা অবস্থাতেই পার করতে হবে—উপায় নেই। তা নইলে হঠাৎ আক্রমণ করে বালুবারা অনায়াসে কাবু করে ফেলতে পারে অরক্ষিত শেষ ট্রাক ড্রাইভারকে। সব শেষে রানা পার করবে ট্যাঙ্কারটা। সবচেয়ে কঠিন আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বীরত্ব দেখাবার জন্যে নিজে এই কাজটা করছে না রানা। আর কাউকে এই কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে। এমন কি জো-কেও না। ওই কয়েকশো গ্যালন তেলের ওপরই নির্ভর করছে ওদের নিরাপদে ফিরে যেতে

পারা বা না পারা। ট্রাকের ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল নেয়া হয়েছে বটে কিন্তু ম্'সাপা জংশন পৌঁছানোর আগেই আবার তাদের তেলের দরকার পড়বে।

ড্রাইভিং সীটে বসা সুফিয়ার দিকে চাইল রানা, 'সেকেণ্ড গিয়ারে চালাবে। সাবধানে ধীরে ধীরে চালাবে। আর যাই করো, মাঝপথে গাড়ি থামিয়ো না।'

ঘাড় কাত করল সুফিয়া। চোখে-মুখে একটা আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ। রানার দিকে চেয়ে একটু হাসল।

'তুমি পার হয়ে গেলেই প্রথম ট্রাকটা পাঠাব আমি,' আবার বলল রানা। 'খবরদার দু'জনের কেউ নামবে না গাড়ি থেকে।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি।' ধীর গতিতে এগিয়ে গেল ফোর্ডটা ব্রিজের দিকে। পাশে বসা জামিলকে সাবধান করে দিল রানা, জানালার কাঁচ যেন কোন অবস্থাতেই না নামায়।

ব্রিজে উঠেছে গাড়িটা। দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা। নিরাপদেই পার হয়ে গেল ওরা মেরামত করা অংশটার ওপর দিয়ে। শব্দ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। ওপারে গিয়ে টিনের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল গাড়িটা।

'কার্লস,' ডাকল রানা। আগে থেকেই প্রথম ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে ছিল এঞ্জিন ড্রাইভার কার্লস। ডাক শুনেই ট্রাক নিয়ে এগিয়ে গেল সে। আবার রুদ্ধ শ্বাস অপেক্ষা। ট্রাকের ওজনে অনেকখানি বাঁকা হয়ে গেছে নতুন বসানো কাঠগুলো। কাঠের ককিয়ে ওঠা প্রতিবাদ পরিষ্কার শোনা গেল। দুলছে ব্রিজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টলমল করতে করতে পৌঁছে গেল ওপারে।

'অবস্থা সুবিধের না!' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'না,' সায় দিল জো, 'ট্যাঙ্কারটা নিয়ে যাবার ভার আর কাউকে দেন না, বস্?'

'একবার তো বলেছি তোমাকে, ট্যাঙ্করটা আমারই পার করতে হবে।'

নদীর ওপারে ফ্রেড টিনের আড়াল থেকে লোকজনকে ট্রাকে তুলছে। লোকজনকে ট্রাকে উঠিয়ে দিয়েই টিন নিয়ে রওনা হলো এপারের দিকে।

চার ঘণ্টা লেগে গেল ওদের চারটে ট্রাক পার করতে। লোকজন আর মালপত্র টিনের ঘের দিয়ে ওপারে নিতেই সময় লাগছে বেশি। যদিও খিদেয় নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হবার জোগাড়, আটকা পড়া অবস্থা থেকে মুক্তির আনন্দে উৎসাহের সাথেই কাজ করেছে সবাই; কিন্তু কাজ এগোতে পারেনি। আসলে তাড়াহুড়োর কাজ নয় এটা।

এখন বাকি কেবল পঞ্চম ট্রাক আর পেট্রল ট্যাঙ্কারটা। শেষ ট্রাক আর ট্যাঙ্কারের নিরাপত্তার জন্যে দশ জন রাইফেলধারী এপারে রাখতে বাধ্য হয়েছে রানা। ওরা ফিরবে পঞ্চম ট্রাকে। ওরা পার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ট্যাঙ্কারটা পার করবে রানা। স্টার্ট দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে সঙ্কেত দিল রানা। সামনের ট্রাকের

ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাত নেড়ে জানাল, সে রওনা হচ্ছে। এগিয়ে চলল ওরা ব্রিজের দিকে।

ব্রিজের কাছে এসে ট্যাঙ্কার থামাল রানা। ট্রাকটা এগিয়ে গেল ব্রিজের ওপর দিয়ে। ট্রাকে বাড়তি দশজন মানুষ। অর্থাৎ, পনেরো বিশ মন বাড়তি বোঝা। মেরামত করা জায়গাটার ওপর দিয়ে যাবার সময় ধীর হয়ে গেল ট্রাকের গতি। প্রায় থেমে যাচ্ছে!

ড্রাইভার কি ওর নির্দেশ ভুলে গেছে? 'চালিয়ে যাও, থেমো না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা; যদিও জানে এঞ্জিনের গর্জনে ওর কথা পৌঁছবে না ড্রাইভারের কানে। ট্রাকটার ওজনে ভীষণ ভাবে কোঁকাচ্ছে কাঠগুলো। ক্যানভাস আচ্ছাদন এপাশ ওপাশ দুলছে বেশ জোরে।

'গাধা! একটা হাঁদারামকে কাজের ভার দিয়েছি আমি!' নিজে নিজেই বিড়বিড় করে বলল রানা চরম হতাশা আর বিরক্তিতে। খুব একা আর অসহায় লাগছে ওর। কেউ নেই সাহায্য করার। এপারে ও একা! সামনের ট্রাকের অবস্থা দেখেই বুঝে নিয়েছে সে, ট্যাঙ্কার নিয়ে ওপারে যেতে পারবে না সে। যা-ও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা ছিল, ওই ট্রাকের ড্রাইভার গাধার মত চালিয়ে সেটাও নষ্ট করে দিল। ট্রাক নিয়ে হয়তো পার হয়ে যাবে ব্যাটা, কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বাঁধন আলগা হয়ে একপাশে সরে গেছে একটা তক্তা।

আস্তে আস্তে ট্যাঙ্কারটা আগে বাড়াল রানা। হঠাৎ করেই যেন রানার নির্দেশ মনে পড়ে গেল ট্রাক ড্রাইভারের। একসেলারেটর চেপে ধরেছে। এখান থেকেই শব্দ পাচ্ছে রানা। স্লিপ করে দ্রুত ঘুরছে পেছনের চাকা। নীল ধোঁয়া উঠছে টায়ারের ঘষায়। হঠাৎ একটা তক্তা ছুটে গেল। গোঁ গোঁ শব্দ তুলে ব্রিজ পেরিয়ে পৌঁছে গেল ট্রাকটা অন্য পারে।

দ্রুত ভাবছে রানা। ব্রিজটা আবার মেরামত না করে ট্যাঙ্কার নিয়ে এগোনো ঠিক হবে না। কিন্তু তার মানে আর একটা রাত দেরি করতে হবে ওদের। এমনিতেই গতকাল সকাল থেকে উপোষ রয়েছে সবাই। সমস্যায় পড়েছে রানা, কি করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

হঠাৎ ওপার থেকে ব্রেন গানের গুলির শব্দ উঠল। দশ-বারোটা রাইফেলও গর্জে উঠল প্রায় একই সাথে। কি ব্যাপার! পাগল হয়ে গেল নাকি? ওর দিকে গুলি ছুঁড়ছে কেন ওরা? হঠাৎ কি হলো ওদের সব ক'জনের? মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে ওর। সাইড ভিউ মিররে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল রানার চোখ। ঝট করে জানালা দিয়ে মুখ বের করে পিছনে চাইল সে। সব পরিষ্কার হয়ে গেল মুহূর্তে। জঙ্গলের ধার থেকে অসংখ্য বালুবা বেরিয়ে এসেছে। তীর ধনুক আর পাঙ্গা হাতে ছুটে আসছে ওরা তারই দিকে! ঠন করে একটা তীর এসে পড়ল ট্যাঙ্কারের ওপর। আর দেরি নয়, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা, উপায় নেই—ঝুঁকি

তাকে নিতেই হবে। সাঁই সাঁই হাতল ঘুরিয়ে কাঁচ তুলে দিয়েই ব্রিজের ওপর উঠে গেল সে ট্যাঙ্কার নিয়ে।

মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করতে করতে ছুটে আসছে হাজার হাজার বালুবা। এঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে কানে আসছে রানার সেই শব্দ। খুব কাছে এসে পড়েছে ওরা। আয়নায় চেয়ে দেখল সে, মাত্র দশ কদম দূরে দেখা যাচ্ছে একটাকে। এত কাছে যে, ওর মুখের উল্কি চিহ্নও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা।

ইচ্ছে করছে একসেলারেটর পুরো দাবিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে পালাতে। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করল রানা। সামনের চাকা উঠে গেল নতুন বসানো কাঠের ওপর দিয়ে। এখন আর সামনের গুলি, পেছনের চিৎকার, ব্রিজের নিদারুণ কোঁকানি, কিছুই কানে যাচ্ছে না রানার। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ট্যাঙ্কারটা। পেছনের চাকাগুলো তক্তার ওপর উঠতেই মোটা তক্তা দু'টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ার শব্দ কানে এল। সামনে না গিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবার ট্যাঙ্কারটা।

'নদীতে ঝাঁপ দাও! ট্যাঙ্কারটা পড়ছে নিচে!' ভেতর থেকে কে যেন বলে দিল রানাকে। হাতল ঘুরাতে গিয়ে টের পেল, পুরো ব্রিজটা ভেঙে পড়ছে ওর মাথার ওপর। এখন লাফিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পেটের মধ্যে কেমন যেন লাগছে রানার। মেলার নাগরদোলা নিচে নামতে থাকলে যেমন লাগে, ঠিক তেমনি। মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরেই পানিতে বিরাট আলোড়ন তুলে রানা সহ অদৃশ্য হলো ট্যাঙ্কারটা নদীতে। গুলির শব্দ আর বালুবাদের কোলাহল হারিয়ে গেল মুহূর্তে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সামলে নিতেই কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল রানার। সামনে উইণ্ডস্ক্রীনে চেয়ে দেখল, নদীর সবুজ পানি চিড়িয়াখানার অ্যাকুয়েরিয়ামের মত দেখাচ্ছে। হু-হু করে পানি ঢুকছে ভেতরে। হাতল ধরে দরজা খোলার চেষ্টা করল রানা। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়েও একটু নড়াতে পারল না ওটা। ড্যাশ বোর্ডে পা বাধিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল সে দরজাটার ওপর। থরথর করে কাঁপছে শরীর, কিন্তু এত করেও কোন কাজ হলো না। জাম হয়ে এঁটে গেছে দরজাটা পানির চাপে। কোমর পর্যন্ত পানি ভরে গেছে ভেতরে। শিগগির কিছু একটা করতে না পারলে মরণ অবধারিত। রাইফেল তুলে নিল রানা। গুলি করে উইণ্ডস্ক্রীন ভাঙতে গিয়েও থেমে গেল। পানি ঢুকেছে রাইফেলের ব্যারেলে। এখন গুলি করলে ব্যারেল ফেটে যদি না-ও মরে, গুলি করলেই শত চূর্ণ হয়ে পানির চাপে সোজা এসে ঝাপটা মারবে গোটা উইণ্ডস্ক্রীন ওরই চোখে মুখে।

কিন্তু এখনও দুলছে কেন ট্যাঙ্কারটা? এতক্ষণে নদীর তলায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। ট্যাঙ্ক! ভুলেই গিয়েছিল রানা। পাঁচ হাজার গ্যালনের ট্যাঙ্ক, মাত্র চারশো গ্যালন তেল আছে তাতে। আর্কিমিডিসের প্রিন্সিপল অনুযায়ী প্রায় দশ টন ঊর্ধ্ব চাপ। অর্থাৎ ভেসে উঠতেই হবে এটাকে। লম্বা একটা দম নিয়ে অপেক্ষা করতে

লাগল রানা। ভেতরে পুরো পানি ভরে গেছে এখন। পানির মধ্যেই চোখ খুলে দেখল রানা অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। ভুশ করে ভেসে উঠল ট্যাঙ্কারটা। এখন পানির চাপ নেই। সহজেই দরজা খুলে ফেলল সে। বেরিয়েই দক্ষিণ পাড়ের দিকে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল। প্রবল স্রোতের তোড় ঠেলে উজানে যেতে হবে তাকে। কাজটা সোজা হবে না টের পেল সে একটু পরেই। ভারি বুট আর ভেজা ইউনিফর্ম নিয়ে সাঁতার কেটে সামনে এগুতে পারছে না সে। ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে স্রোতের টানে উত্তর-পুবের বাঁকটার দিকে। ওখানে বিজ বিজ করছে অসংখ্য বালুবা। জামিল, সুফিয়া আর অন্যান্যদের উত্তেজিত চিৎকার কানে পৌঁছাচ্চে রানার। হেলমেটটা খুলে ফেলল। অনেক কসরতের পর জামাটাও খসাল। লম্বা একটা দম নিয়ে ডুব দিল। বুট জোড়াও খুলে ফেলতে হবে, নইলে পার হতে পারবে না সে। পুরো একটা দিন খাবার পড়েনি পেটে। এমনিতেই অনেক দুর্বল তার দেহ। বুট খুলে ভেসে উঠল আবার রানা। পাশেই ঝপ করে কি যেন পড়ল পানিতে। ভ্রূক্ষেপ করল না রানা, সাঁতরে চলল সে ব্রিজটার দিকে। আর একটা কি যেন পড়ল পানিতে। এবার আরও কাছে। মাথা তুলে দেখল রানা ওপারের ঝোপের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ছে বালুবারা ওকে লক্ষ্য করে। মাথার ওপর দিয়ে আর একটা তীর গিয়ে পড়ল দু'হাত সামনে। ডুব দিল রানা। এভাবে তীর আসতে থাকলে ঘ্যাচ করে বিঁধে যাবে যে-কোন একটা। ডুব সাঁতার দিয়ে এগুলে তীর তার গায়ে লাগলেও হয়তো তেমন ক্ষতি হবে না, হয়তো পানিতে ধুয়ে হালকা হয়ে যাবে বিষের ক্রিয়া। পানির দু'হাত তলা দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু ক্লান্তিতে দম রাখতে পারছে না বেশিক্ষণ। বারবার দম নিতে ভেসে উঠতে হচ্ছে, আর সাথে সাথেই কয়েকটা তীর এসে পড়ছে ওর আশপাশে। একটা ওর গায়ে লাগলেই শেষ।

আর মাত্র পঞ্চাশ ষাট ফুট বাকি। কিন্তু হাত পা আর চলছে না রানার। ওই ষাট ফুট ষাট মাইলের মত মনে হচ্ছে তার। বুঝে ফেলেছে রানা, মরণ অবধারিত। হয় ডুবে, নয় তীরের আঘাতে। দম শেষ, শক্তি শেষ। এখন আর ডুব সাঁতারের প্রশ্নই ওঠে না। উপর দিয়েই সাঁতার কাটছে সে। এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে, খাবি খাচ্ছে, দুই চোখ বিস্ফারিত। তীরগুলো ঝপঝপ শব্দ তুলে পড়ছে আশেপাশেই, কিন্তু বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছে রানা, এখন আর ওগুলো আমল দিচ্ছে না সে। বিরাট আওয়াজ তুলে কি যেন পানিতে পড়ল দক্ষিণ তীরের কাছে। ওরা কি কামান দাগছে এবার তীর ধনুক ফেলে? কিন্তু তা কি করে হয়? কি ঘটছে চারপাশে? এত হৈ চৈ কিসের? কিছুই বুঝতে পারছে না সে আর, কিছুই ভাবতে পারছে না। পরিষ্কার বুঝল রানা তলিয়ে যাচ্ছে ও। শেষ বারের মত হাত পা ছুঁড়ে একবার চেষ্টা করে দেখল। নাহ্, কিছুতেই এগোনো যাচ্ছে না আর, প্রবল স্রোত ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওকে নদীর বাঁকের দিকে। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা। খড়কুটো বা ভাসমান তক্তা নয়—কুমীর! মাথাটা ভেসে আছে পানির ওপর, চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। দ্রুত পানি কেটে এগিয়ে আসছে ওটা। ত্রিশ ফুট দূরে।

তীব্র আতঙ্কে আধ-মিনিট স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুঝল রানা, এগোল কয়েক ফুট, তারপর চরম অবসাদে জ্ঞান হারাল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে সাত ফুট পানির নিচ থেকে ভেসে উঠল সে। নাকে-মুখে ঢুকে যাওয়া পানি বেরিয়ে যেতেই শব্দ তুলে শ্বাস নিল। ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল কুমীরটাকে। আর মাত্র দশ ফুট দূরে! হাল ছেড়ে দিল রানা। তলিয়ে গেল আবার। তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই সারা জীবনের প্রায় সব ঘটনা চোখের সামনে সিনেমার মত দেখতে পেল সে। ফাঁকে ফাঁকে দেখল একজোড়া কাঁচা-পাকা ভুরু। তার নিচে তীক্ষ্ণ দুই চোখে ভর্ৎসনা।

'আমি কি করব, স্যার!' ককিয়ে উঠল রানা। 'আর তো পারছি না।'

'পারতেই হবে তোমার! বাঁচতেই হবে!' বুকের ভেতর গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

হাত-পা নেড়ে আবার ভেসে উঠল সে। মনে মনে ঝেড়ে গাল দিচ্ছে সে কট্টর বুড়োর উদ্দেশে। কিন্তু জানে, এ আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই তার। শেষ চেষ্টা করতে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে রানার ঘাড় কামড়ে ধরল কুমীরটা।

'বিদায় না নিয়েই কোথায় চলেছেন, বস্?' বলল কুমীর।

অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখল রানা জো-কে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, চিত হয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে কুমীরটা, রক্তে লাল হয়ে গেছে নদীর কিছুটা অংশ। দলের কেউ গুলি করে মেরেছে ওটাকে। ধবধবে সাদা পেট, একদম নিরীহ দেখাচ্ছে।

রানাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল জো ব্রিজের খুঁটির আড়ালে। এখানে তীর আসবে না। আপাতত নিরাপদ ওরা। রানার পেটে মাথা রেখে ওকে শূন্যে তুলে নিল জো। একটু ঝাঁকাঝাঁকি করতেই নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে বের হয়ে এল পানি। ডুবে ডুবে অনেক পানি খেয়েছিল সে।

মাথার ওপর থেকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল জো, 'এখন কেমন বোধ করছেন, বস্?'

মাথা নেড়ে জানাল রানা ভাল বোধ করছে।

'খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠতে হবে আমাদের। উঠেই তীরের মুখে পড়ব আবার। ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে। পারবেন তো, বস্?'

পারা না পারার প্রশ্নই ওঠে না। পারতেই হবে তাকে, নইলে মরতে হবে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে রানা, সব কিছুই কেমন অবাস্তব ঠেকছে ওর কাছে। ভোঁ-ভোঁ করছে কান।

খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। মাঝে মাঝে জো ঠেলেঠুলে সাহায্য করছে রানাকে। গার্ড রেইল টপকে ব্রিজে উঠে গেল জো। রানা ঝুলছে রেলিং ধরে। অবশ হয়ে আসছে হাত দুটো। টেনে তুলতে পারছে না নিজেকে।

তীর পড়তে আরম্ভ করেছে চারপাশে। অনেক কষ্টে মুখটা তুলল রানা গার্ড রেইলের ওপর। একটা তীর এসে বিঁধল ঠিক ওর ছয় ইঞ্চি বাঁয়ে। থরথর করে কাঁপছে এখনও তীরটা। টেনে হিঁচড়ে ব্রিজের ওপর তুলে ফেলল ওকে জো। বুকের কাছে একটু ছিলে গেল রেইলের ঘষায়।

'দৌড়ান, বস্।' রানার হাত ধরে ঝেড়ে দৌড় দিল জো। টানের চোটে দৌড়াচ্ছে রানাও, কিন্তু একে দৌড়ানো বলে না, কোনমতে পড়ে যাওয়া ঠেকাচ্ছে সে। নিজের পা দুটো রবার দিয়ে তৈরি মনে হচ্ছে তার। রাইফেলের আওয়াজ আসছে দক্ষিণ পাড় থেকে। কাঠের ব্রিজ ছেড়ে শক্ত মাটির ওপর দিয়ে চলেছে ওরা এখন। আর তীর আসছে না। আশেপাশে গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে রানা। ওকে ধরে উপুড় করে শোয়ানো হলো ট্রাকের মেঝেতে। কে যেন আর্টিফিশিয়াল রেস্পিরেশন দিচ্ছে পিঠের ওপর চাপ দিয়ে দিয়ে। আরও কিছুটা পানি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। সুফিয়ার গলা শুনতে পেল রানা। কি বলছে সুফিয়া বুঝতে না পারলেও আশ্বস্ত বোধ করল। এখন সে নিরাপদ।

আবার বমি করল। প্রথমে একটু, তারপর গলগল করে। মুখের তেতো স্বাদে ঘোর কেটে গেল রানার।

'ছাড়ো এবার।' নড়ে উঠল রানা সার্জেন্ট আগুর হাতের তলায়। ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগু। কাশতে আরম্ভ করল রানা। সুফিয়া একটা হাত রেখেছে ওর পিঠে। 'বিশ্রাম দরকার তোমার।'

'না!' জোর করে উঠে বসল রানা। 'আমাদের এখনই রওনা হতে হবে।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বস্। বালুবারা সব নদীর ওই পারে রয়েছে, মাঝখানে নদী। আমাদের ভয় কি?'

'তুমি কি করে জানো যে এই পারেও ওরা নেই?'

'মানে...'

'জানো না তুমি,' বলল রানা,'নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে নদীর দুই পারেই বালুবা গিজ গিজ করতে দেখে এসেছি আমি।' আবার কাশল সে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রওনা হচ্ছি আমরা। সবাইকে জানিয়ে দাও।'

'ওকে, বস্,' বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'জো।' রানার ডাকে ফিরল আবার। রানার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছে সে।

'ধন্যবাদ!' বলল রানা।

সলজ্জ হাসি হাসল জো। 'ও কিছু না। ক'দিন গোসল করিনি, এই ফাঁকে

কাজটা সেরে নেয়া গেল, বস্!'

'ফিরেই এক ব্যারেল বিয়ার খাওয়াব আমি তোমাকে।'

'ঠিক আছে, আপনি ভুলে গেলেও মনে করিয়ে দেব আমি।' হাসতে হাসতে নেমে গেল জো। উচ্চৈঃস্বরে লোকজনকে নির্দেশ দিচ্ছে, শুনতে পেল রানা।

'ভেবেছিলাম তোমাকে আর ফিরে পাব না,' বলল সুফিয়া। একহাতে রানার বাহু জড়িয়ে ধরে আছে সে।

'বলেছি তো, পাজী লোক সহজে মরে না!' হাসল রানা। 'কুমীরটাকে মারল কে?'

'সার্জেন্ট আগু,' বলল সুফিয়া।

সার্জেন্টের দিকে ফিরল রানা। অল্প বয়স ছেলেটার, রানা ফিরতেই কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে আরেকজনের আড়ালে লুকাবার চেষ্টা করল সে। লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেছে মুখটা।

উঠে দাঁড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল ওকে রানা। কানে কানে বলল, 'ধন্যবাদ, আগু!'

ওর পিঠে দুটো চাপড় দিয়ে ছেড়ে দিল রানা। দেখল, খুশিতে পানি বেরিয়ে এসেছে সার্জেন্টের চোখ থেকে। হঠাৎ ধমকের সুরে বলল রানা, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে! যাও, হাত লাগাও কাজে!'

এইবার হাসি বেরিয়ে এল আগুর। রানাকে ঝকঝকে সাদা দাঁত আর গোলাপী মাড়ি দেখিয়ে গটমট করে চলে গেল সে কাজে।

ফোর্ডের সামনের সীটে বসে শেষ বারের মত তাকাল রানা ব্রিজটার দিকে। নতুন মেরামত করা অংশটা ভেঙে ঝুলে রয়েছে। দূরে ওপারে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা বালুবা মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এত দূর থেকে দুপুরের রোদে ওগুলোকে সেলুলয়েড পুতুলের মত দেখাচ্ছে।

বাঁকের কাছে দেখা যাচ্ছে ট্যাঙ্কারটা। স্রোতের ধাক্কায় বাঁকের উত্তর পারে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে ওটা। শেলের মনোগ্রাম এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলটা যেন ঘন হয়ে নদীর টুঁটি টিপে সরু করে ফেলেছে ওই বাঁকটার কাছে।

'চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।'

গাড়িতে স্টার্ট দিল সুফিয়া। ওদের পিছু পিছু এগিয়ে চলল ট্রাকের কনভয়টা। নদীর ধারের ঘন ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা রাস্তা ধরে।

ঘড়ি দেখল রানা। পানিতে ভিজে ঘড়ির কাঁচ ভেতর দিকে ঘেমেছে। কানের কাছে নিয়ে বুঝল, ঘড়ি বন্ধ হয়ে রয়েছে।

'কয়টা বাজে?' প্রশ্ন করল রানা।

'একটা বাজতে বিশ মিনিট,' ঘড়ি দেখে জবাব দিল সুফিয়া।

'অর্ধেকটা দিন নষ্ট হয়ে গেল এখানেই!' অসন্তুষ্ট মন্তব্য করল রানা। 'সন্ধ্যার আগে আর ম্'সাপা জংশনে পৌঁছানো যাবে না।'

'তাহলে কি করবে?'

'সন্ধ্যার আগেই কোথাও ক্যাম্প করব আমরা। অবশ্য তার আগেই খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিভাবে?'

'দেখা যাক, চলতে চলতেই বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে একটা কিছু।' জামিলের দিকে ফিরল রানা, 'তুমি খেয়েছ তো, ক্যাপ্টেন?'

'না,' শুকনো মুখে জবাব দিল জামিল।

'না কেন?' ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'তোমার জন্যে তো খাবার আলাদা করে রাখার কথা। দেয়নি জো?'

'দিয়েছিল। কিন্তু আঙ্কেল ফ্রেড একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।' মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল জামিলের।

'তারপর?'

'তারপর "ওই যে পাখি" বলে পিছন দিকে দেখিয়েই ছোঁ মেরে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে…' আর বলতে পারল না জামিল। নিটোল দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে নামছে ওর মসৃণ গাল বেয়ে।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল রানা। কয়েক সেকেণ্ড কিচ্ছু দেখতে পেল না সে চোখে। তারপর বলল, 'গাড়িটা সাইড করে দাঁড় করাও।'

'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে কোন গোলমাল হোক, তা আমি চাই না, লুইস!' অনুনয়ের সুরে বলল সুফিয়া।

'এটা সামান্য কোন ব্যাপার নয়,' বলল রানা। 'তবে এই মুহূর্তে গোলমালের কোন ভয় নেই। এখন কাউকে শায়েস্তা করার চেয়ে বাচ্চাটার খাওয়ার ব্যবস্থা করা বেশি জরুরী। গাড়ি থামাও।'

ফোর্ড ক্রাইসলার থেমে দাঁড়াতেই পাশে এসে থামল প্রথম ট্রাক। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল ন্'গুয়েন, 'কি হলো, ক্যাপ্টেন?'

'বাচ্চাটা সকাল থেকে খায়নি কিছু। খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে। তোমাদের কারও কাছে কিছু আছে?'

কথাটা শুনেই ট্রাকের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল প্রবীণ যোদ্ধা, কি যেন বলল হাঁক ছেড়ে। দুই মিনিটের মধ্যেই একটা হেলমেট এগিয়ে দিল সে। হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়েই অবাক হয়ে গেল রানা। জ্যাম, জেলি, পনির, মাখনের ছোট ছোট কৌটো থেকে শুরু করে রেশনের খাবার থেকে বাঁচানো রুটি, চকোলেট আর কেক দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে ওরা হেলমেটটা। আগামী তিনদিন খেয়েও শেষ

করতে পারবে না জামিল।

'জাত সোলজার ব্যাটারা!' বিড়বিড় করে বলল রানা, 'দেখেছ, এই আক্কারার দিনেও নিজেদের ব্যবস্থা কেমন ঠিক রেখেছে!' পেছনের সীটে ঢালল সব।

ধন্যবাদ জানিয়ে হেলমেট ফেরত দিল রানা। গাড়ি ছেড়ে দিল সুফিয়া। একবার সাধতেই গপাগপ খেতে শুরু করল জামিল।

'উহ্, আজকের কথা ভুলব না আমি সারাজীবন,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল সুফিয়া। 'ট্যাঙ্কারটা নিচে পড়তে দেখে বুকের ভেতরটা কেমন খালি হয়ে গেল, মনে হলো সব হারালাম আমি!' ভাবের আবেগে মুহূর্তের অসাবধানতায় রাস্তা ছেড়ে পাশের এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে ধাক্কা খেল গাড়ির চাকা। তাড়াতাড়ি সামলে নিল সুফিয়া।

'ব্রিজ থেকে পড়ে কোন মতে বেঁচে গেছি, কিন্তু যা অবস্থা দেখছি, তোমার হাত থেকে রেহাই নেই আমার।'

পেছনের মন্থর গতি ট্রাকগুলোর সাথে সমান তাল রেখে ধীরে ধীরে চলেছে ওরা। বিকেল হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই দু'বার রাস্তার ধারে দুটো পরিত্যক্ত বালুবা গ্রাম পার হয়েছে ওরা। ঘাসের ছাউনি দেয়া ঘরগুলো জায়গায় জায়গায় পচে ক্ষয়ে গেছে। পাশেই চাষের জমিতে অযত্নে আগাছা জন্মেছে।

'সম্ভবত উপোষ দিতে হবে না আজ আমাদের,' রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে বলল রানা। ব্রিজ থেকে নব্বই মাইল সরে এসেছে ওরা। জঙ্গলের চেহারা অনেক বদলে গেছে। 'শিকার পাওয়া যেতে পারে এখানে, অনেক রকম জন্তুর পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছি আমি। চোখ খোলা রাখো জামিল, কিছু নড়তে দেখলেই বলবে!'

এখানকার গাছগুলো অপেক্ষাকৃত লম্বা আর বেশ দূরে দূরে ছড়ানো। ডালপালাগুলো বেশি ঘন নয়, ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখা যায়। মাঝে মাঝে ফাঁকা, সবুজ মাঠ, দু'একটা বাঁশ ঝাড় রয়েছে মাঠের এখানে ওখানে।

'এখনও আধঘণ্টা বাকি সন্ধ্যা হতে,' ছোট্ট একটা ঝর্ণা পার হতে হতে বলল রানা, 'ঝর্ণার আশেপাশেই কোথাও ক্যাম্প করা উচিত আমাদের।'

যেখান দিয়ে পার হলো ওরা সেখানে পানি খুবই কম। চাকার অর্ধেকও ডুবল না পানিতে। গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে ওপরে উঠে গেল সুফিয়া ঝর্ণার ঢালু পাড় বেয়ে। ছুটল ঝর্ণার ধার ঘেঁষা রাস্তা ধরে।

'ওই যে!' চিৎকার করে উঠল জামিল।

রাস্তার খুব কাছেই দুটো বিশাল কালো মোষ চরে বেড়াচ্ছে। জোরে ব্রেক কষল সুফিয়া। একটু স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি। পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিল রানা। হাতল ঘুরিয়েই কাঁধের ধাক্কায় গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল সে চোখের পলকে।

বিপদ টের পেয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড়াচ্ছে দুটোই।

দূরেরটাকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি করল রানা। থপ করে শব্দ হলো। লেগেছে গুলিটা। ধীর হয়ে গেল ওর গতি। থামতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সামনের পা দুটো পিছলে আগে বেড়ে গেল, এবং সাথে সাথেই মুখ থুবড়ে পড়ল সেটা মাটিতে। বার কয়েক পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে খানিক ধুলো ওড়াল সে মরার আগে।

এসব দেখল জামিল, রানা ব্যস্ত দ্বিতীয়টাকে নিয়ে। ও জানে, একটা মোষে পেট ভরবে না সবার।

দ্বিতীয়টার গতির সাথে রানার কাঁধের রাইফেলটা ঘুরছে ধীরে ধীরে। গুলি করল রানা। গুলিটা লাগল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল মোষটার ভাব-ভঙ্গি। আকাশের দিকে চাইল একবার, উদভ্রান্তের মত বনের দিকে ছুটল, কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে একটা চক্কর মেরে আবার বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। সোজা ফোর্ড ক্রাইসলারের দিকে ছুটে আসছে এখন। গাড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে বিপদ! যত্নের সাথে লক্ষ্য স্থির করে আবার গুলি করল রানা। সোজা মাথায় গিয়ে লেগেছে গুলিটা। সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে পড়ল মোষটা। তিন চোখ তুলে ক্ষণিকের জন্যে চাইল ওদের দিকে। বিকট একটা অন্তিম আর্তনাদ করে মাটি কাঁপিয়ে ধপাস করে পড়ল নিচে।

'কাজের কাজ করেছেন, বস্!' রানার তাকের প্রশংসা করল জো; 'আধমন সাইজের একটুকরো মাংস আমি একাই খাব আজ!'

'ট্রাকগুলো গোল করে পার্ক করে ক্যাম্পটা তৈরি করে ফেলো আগে।' গুলির শব্দে রানার কান ভোঁ ভোঁ করছে এখনও।

'এক্ষুণি সব করে ফেলছি।' পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে গেল জো। কাজ শেষ হলেই রান্না চড়বে, এই ভাবনাটাই তার এত উৎসাহের একমাত্র না হলেও, প্রধান কারণ।

সামনের মোষটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। দশ-বারোজন লোক লেগে গেছে ওটার পেছনে। অনেক কষ্টে মরা মোষটাকে চিৎ করে চামড়া ছিলতে লেগে গেল ওরা। বিরাট একটা মাথা। অন্তত চল্লিশ ইঞ্চি হবে। 'অনেক মাংস হবে, ক্যাপ্টেন! আজ রাতে পেট ভরে খাব আমরা।' বলেই চামড়া ছিলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ন্'য়াঙ্গা।

'হ্যাঁ, অনেক মাংস হবে,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল রানা। জীবনে অনেক শিকার করেছে ও। কাঁধে রাইফেলের ঝাঁকি, শিকারের উত্তেজনায় পেটের ভেতর বিচিত্র অনুভূতি, সব মিলে ভালই লাগে। কিন্তু সব শেষ হওয়ার পরে মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে যায়। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। শুধু দৈহিক তাগিদে নারী-সঙ্গমের পর যেমন অপরাধ বোধ জাগে, ঠিক তেমনি।

গাড়িতে ফিরে গেল রানা। সুফিয়া বসে আছে গাড়িতে। দরজাটা খোলা

রেখেই বসল রানা।

'কি বিশাল ছিল মোষদুটো। বিরাট, বিকট...কিন্তু সুন্দর। মায়া লাগে,' বলল সুফিয়া।

'প্রয়োজনে মেরেছি, মাংসের দরকার ছিল আমাদের,' বলল রানা। অপরাধ বোধটা কাটানোর জন্যে যুক্তিটা খাড়া করেছে সে। কিন্তু নিজের মনকে ফাঁকি দেবে কি করে? নিছক শিকারের আনন্দ পাওয়ার জন্যেও অনেক পশু মেরেছে সে।

'হ্যাঁ, অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রচুর মাংসের দরকার আছে আমাদের,' মেনে নিল সুফিয়া।

ছুটতে ছুটতে এল জামিল। এতক্ষণ জো-র সাথে মোষ কাটার তদারকি করছিল সে। 'জানো, আপা, একটা গুলিও মিস যায়নি!' বাংলায় বলল জামিল।

'হ্যাঁ, তা তো হবেই, তোমার হীরো মেরেছে যে!' বাংলাতেই জবাব দিল সুফিয়া। 'কিন্তু এর মধ্যে বাহাদুরির কি আছে? অতবড় একটা জানোয়ারের গায়ে তো যে-কেউ গুলি লাগাতে পারে।'

'ইশ! বললেই হলো?' খেপে উঠল জামিল। 'কিচ্ছু জানো না তুমি।'

'অ্যাই, ছোঁড়া! কি জানি না আমি?' চোখ পাকাল সুফিয়া। 'তিন-তিনটে গুলি লাগে নাকি? আমি ব্যাটাছেলে হলে এক গুলিতেই ফেলে দিতাম চারটে মহিষ!'

'কী যে যা-তা বলো তুমি, আপা! আঙ্কেল তো বলেছে, রানিং টার্গেটে এর চেয়ে ভাল টিপ সে জীবনে দেখেনি। শেষ গুলিটা ঠিক জায়গা মত না লাগলে নাকি ঢুঁশ দিয়ে চিৎ করে ফেলত ওটা এই গাড়িটাকে। তুমি আঙ্কেলের চেয়ে বেশি জানো?'

'নিশ্চয়ই জানি।'

'তাহলে ঢুঁশ দিলেই ভাল হত...গাড়ির মধ্যে কয়টা ডিগবাজি খেতে দেখতাম!' হা-হা করে হেসে উঠল জামিল। 'তখন তো চিঁ চিঁ করে ডাকতে আমার হীরোকেই!'

'কি বলছ তোমরা?' না বোঝার ভান করল রানা।

'রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে এখন, তাই বলছিলাম।' মুচকি হেসে চলে গেল সুফিয়া রান্নার আয়োজনে।

বাইশ

খেতে বসেছে সবাই। বারোটা চুলো থেকে রান্নার গন্ধ সারা ক্যাম্পে ভেসে বেড়াচ্ছে। লম্বা লম্বা গাছের কালো মাথাগুলোর সিলুয়েট দেখা যাচ্ছে তারা জ্বলা আকাশে। কথা, হাসি ঠাট্টার শব্দ। গান জুড়েছে একজন। চমৎকার হাওয়া বইছে

বলে মশার উপদ্রব নেই। প্লেটে উঁচু করে রাখা হয়েছে গ্রিল করা মাংস আর কলিজা। কম্বল বিছিয়ে বসেছে সুফিয়া, রানা আর জামিল।

খেতে খেতে জো এগিয়ে এল ওদের দিকে। হাতে একটা কাঠিতে কয়েক টুকরো মাংস গাঁথা। রস চুইয়ে পড়ছে মাংস থেকে, অন্য হাতে বিয়ারের বোতল।

'আর একটা বিয়ার চলবে, বস্?' জিজ্ঞেস করল সে মাংস চিবাতে চিবাতে। 'কয়েক টুকরো মাংস দিই?'

'বিয়ার চলতে পারে,' বলল রানা, 'কিন্তু মাংস আর না। এক্কেবারে গলা পর্যন্ত ভরে গেছে। আর পারছি না।'

'পেট ফেটে মরি, তবু ভাল, কিন্তু মোষ দুটোকে খেয়ে শেষ না করে উঠছি না আমি।' রানার পাশে বসে পড়ল জো। হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন করল সে, যেন দারুণ মজার কিছু বলছে, এমনি ভঙ্গিতে চাপা গলায় বলল, 'ট্রাকগুলোর একটাতেও মোবিল নেই, বস্! কেউ ফেলে দিয়েছে মনে হয়!'

একবার কুঁচকে উঠেই আবার সোজা হয়ে গেল রানার ভুরু জোড়া। চাপা গলায় বলল, 'তুমি খেতে থাকো, আমি একপাক ঘুরে দেখে আসছি।' হাত ধুয়ে উঠে পড়ল রানা। সত্যিই! বিপদের গুরুত্ব টের পেয়ে মাথা ঘুরে গেল ওর। প্রত্যেকটা ট্রাকেরই মোবিল নাট খোলা। তেল পড়ে কালচে হয়ে গেছে ট্রাকের নিচের অনেকখানি জায়গা। আবার আটকা পড়েছে ওরা জঙ্গলে।

ফিরে এল রানা। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'কে এমন কাজ করল, বস্?' প্রশ্ন করল উদ্বিগ্ন জো।

'কে যে করেছে তা আমিও বুঝতে পারছি, তুমিও পারছ!' বলল রানা। 'কিন্তু কেন কাজটা করল বোঝা যাচ্ছে না।' দাঁতে দাঁত চাপল সে রাগ দমন করতে গিয়ে।

'এখন কি হবে?'

'সারা রাত পাহারা দিতে হবে ফোর্ড ক্রাইসলারটাকে।'

'কেন?'

'ওটাই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। ওতে করেই সাহায্যের ব্যবস্থা করতে যাব কাল ম'সাপা জংশনে।'

'সে তো বহু দূর! অত পেট্রল কি আছে ক্রাইসলারে?'

'নেই। আজই ট্রাক থেকে তেল বের করে ফোর্ডের পেট্রল ট্যাঙ্ক ভর্তি করে রাখতে হবে।'

'আর লেফটেন্যান্ট ফ্রেড?'

'ফ্রেড থাকবে এখানেই।'

'কি কথা হচ্ছে আমার সম্বন্ধে?' এগিয়ে এল ফ্রেড।

'জো আর আমি সাহায্যের জন্যে চেষ্টা করতে যাচ্ছি কাল ভোরে ম'সাপা

জংশন। তুমি এখানকার চার্জে থাকবে। এদিকটা সামলাবে।'

'কেন, সাহায্যের দরকার পড়ল কেন আবার?' যেন কিছুই জানে না এমনি মুখ করে জিজ্ঞেস করল সে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল রানার। নিজেকে সংযত রাখল সে, ধৈর্যের সাথে ব্যাখ্যা করল, 'ট্রাকের মোবিল স্ক্রু ঢিলে হয়ে সব মোবিল পড়ে গেছে। বালুবা অঞ্চল ছাড়িয়ে গিয়ে ক্যাম্প করব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হলো না। এখানেই থামতে হচ্ছে আমাদের। ক্রাইসলার নিয়ে ম্'সাপা জংশনে গিয়ে যোগাযোগ করব আমরা হেড-কোয়ার্টারের সাথে। এয়ার-ড্রপ করে মোবিল আর আরও পেট্রল না পাঠালে আমরা অচল।' ফ্রেডের দিকে একবারও চাইল না রানা কথাগুলো বলার সময়ে। 'জো, খাওয়া শেষ হলে ম্যাপটা নিয়ে এসো।'

উঠে পড়ল বিগ জো, জানাল খাওয়ার রুচি নেই আর, প্যান্টের পেছনে হাত মুছে চলে গেল ম্যাপ আনতে।

ম্যাপ বিছিয়ে সরু রাস্তাটার এক জায়গায় আঙুল রাখল রানা। 'এইখানে আছি আমরা এখন। ম্'সাপা এখান থেকে সত্তর-আশি মাইল হবে।' মনে মনে হিসেব করল রানা, 'ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে আমাদের ফিরতে। কিন্তু যদি কোন কারণে স্টেশনের টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা নষ্ট থাকে, তাহলে ফিরতে দেরি হবে আমাদের। হয়তো এলিজাবেথভিল পর্যন্ত যেতে হতে পারে।'

রাস্তাটার দুই ইঞ্চি পাশ দিয়েই গেছে উত্তর রোডেশিয়ার লাল সীমান্ত রেখাটা। কুঁতকুঁতে চোখ দুটোকে আরও ছোট করে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে ফ্রেড ম্যাপটা।

'জো-কে এখানে রেখে গেলেই তো হয়? তুমি আর আমি যাই না কেন একসাথে?' রানার দিকে মুখ তুলে চাইল ফ্রেড জবাবের প্রতীক্ষায়।

'তুমি ইংরেজি ছাড়া অন্য কোন ভাষাই বলতে পারো না। জো-কে আমার দরকার। রাস্তায় কারও দেখা পেলে দোভাষীর কাজ করতে পারবে ও।' মুখে এই যুক্তি দিল বটে, আসলে ফ্রেডকে নিতে চায় না রানা অন্য কারণে। ওকে নিলে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে ওর, তা নইলে প্রথম সুযোগেই রানার পিঠে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালাবে সে এলিজাবেথভিলের দিকে।

'ঠিক আছে।' আবার মনোযোগ দিল ফ্রেড ম্যাপটার দিকে। মাইল চল্লিশেক দূরে বর্ডার। একটু জোরে হাঁটলে একদিনের পথ।

ফ্রেঞ্চ ভাষার আশ্রয় নিল রানা, 'হীরাগুলো তোমার ট্রাকের ড্যাশবোর্ডে লুকিয়ে রাখো। ওগুলো যতক্ষণ আছে আমাদের সাথে, ওরা সাহায্য পাঠাতে বাধ্য।'

'ইংরেজিতে কথা বলো, খেঁকিয়ে উঠল ফ্রেড।

কিন্তু জো মাথা নেড়ে ফ্রেঞ্চেই জিজ্ঞেস করল, 'সার্জেন্ট আগুকে পাহারায়

লাগিয়ে দেব?'

'না, কাউকে জানানোর দরকার নেই।'

'ইংরেজি বলছ না কেন? তোমরা কি বলছ জানার অধিকার আছে আমার!' খেপে উঠেছে ফ্রেড।

'আমরা কাল ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই রওনা হব,' এবার ইংরেজিতেই বলল রানা।

'আমি সাথে যেতে পারব?' জিজ্ঞেস করল সুফিয়া।

'না পারার তো কোন কারণ দেখছি না,' বলল রানা।

'আমি দেখি,' চট করে বলল ফ্রেড।

'অর্থাৎ?' ভুরু কুঁচকে তেরছা চোখে চাইল রানা ফ্রেডের মুখের দিকে। 'আর একটু পরিষ্কার করে বলো।'

'নিশ্চয়ই ওই ছোট ছোঁড়াটাকেও সাথে নিতে চাইবে তোমরা?'

'তাতে কি? জামিল সাথে গেলে কার কি ক্ষতি?'

'তোমাদের খুবই লাভ, বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাদের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাতে।'

'কি রকম? ভাবছ, পালিয়ে চলে যাব, আর আসব না? যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো, ফ্রেড।'

'আরও পরিষ্কার করে?' বিদ্রূপের হাসি ফ্রেডের ঠোঁটে। 'ভাবছ কিছুই বুঝি না? ওই মেয়েমানুষ আর তার ভাইকে নিয়ে ক্লিন কেটে পড়তে চাইছ, এটা বুঝে নিতে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না। আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, লুইস! আমাদের সবাইকে পথে বসিয়ে ভেগে যাবে, সেটি হচ্ছে না। তোমার ফিরে আসার গ্যারান্টি হিসাবে ওরা থাকবে এখানে। ইচ্ছে করলে ভোট নিয়ে জনমত যাচাই…'

'ঠিক আছে,' হঠাৎ বলল সুফিয়া, 'ভোটাভুটির কোন দরকার নেই। আমি এখানেই থাকব। নোংরা সন্দেহ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে আরও নোংরা হয়ে উঠবে পরিবেশটা। ব্যাপারটার এখানেই ইতি হোক।'

'বিশজন সমর্থ পুরুষ ওর দেখা শোনা করবে, বস্, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি আবার দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে পোড়ো না…অন্তত আজকের রাতটা।'

'সকালে দেখা হবে, বস্।' চলে গেল জো মাথা ঝাঁকিয়ে। রানার বক্তব্য সে বুঝতে পেরেছে পরিষ্কার।

'আমিও যাই, সব সাবাড় হয়ে যাওয়ার আগে খানিক ভাগ বসাই গিয়ে।' উঠে পড়ল ফ্রেড। সবার অলক্ষ্যে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ম্যাপটা তুলে নিয়ে গেল সে।

তেইশ

ভোরের দিকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল রানার। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। এমন অসময়ে বৃষ্টি আশা করেনি ও। কেমন যেন অমঙ্গলের আভাস রয়েছে আজ দিনের শুরুতেই।

সকালের নাস্তা সারল ওরা মোষের মাংস দিয়েই। কফি নেই—ফুরিয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে খেয়ে উঠেই হাঁক ছাড়ল রানা।

'রেডি, জো?'

'ইয়েস, বস্।' গাড়িতে উঠে বসল ওরা। সীটের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে জো। উইণ্ডস্ক্রীন নেই। জো-র রাইফেলের মাথাটা বেরিয়ে রয়েছে ওই ফাঁক দিয়ে। সীটের সামনে মেঝেতে রাখা বিয়ার কেসটার ওপর পা রেখেছে জো।

চাবি ঘোরাতেই স্টার্ট নিল গাড়ি। একসেলারেটর দাবিয়ে এঞ্জিনটা একটু গরম করে নিল রানা।

'দশটা এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসব আমরা। লক্ষ রেখো, কেউ যেন ক্যাম্প ছেড়ে এদিক ওদিকে না যায়।' ফ্রেডের উদ্দেশে বলল সে।

একটা ট্রাকের বনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ক্রাইসলারে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখছে ফ্রেড। কোন জবাব দিল না।

'লোকজনকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা কোরো, নইলে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধাবে ওরা।'

'আর জ্ঞান দিতে হবে না, তোমার কাজে তুমি যাও।'

সুফিয়ার সাথে চোখাচোখি হতেই হেসে হাত নেড়ে বাই বাই জানাল সে। ট্রাকের টেইল বোর্ডের ওপর বসে আছে সুফিয়া। লোকজন সবাই উৎফুল্ল চিৎকারে বিদায় জানাল ওদের। রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল গাড়ি। বাঁক নিতেই রিয়ার ভিউ মিরর থেকে হারিয়ে গেল ক্যাম্পটা। রাস্তার জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে রয়েছে। আকাশের মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। টুকরোগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে।

'একটা বিয়ার চলবে, বস্?'

'কফির বদলে বিয়ার?'

'আরে জানেন না, বস্, পেট পরিষ্কার করায় এর জুড়ি নেই।' ঝুঁকে দুটো বোতল তুলে নিল জো।

হেলমেটটা খুলে মাথা চুলকাল ফ্রেড। ঘাম শুকিয়ে তার ছোট করে ছাঁটা লালচে চুল তারের মত হয়ে রয়েছে। কানের পাশটা চুলকাচ্ছে। আস্তে আস্তে আঙুল

বুলাল সে জায়গাটার ওপর।

বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ফোর্ডটা গাছের আড়ালে। ভাল করে লক্ষ করেছে সে, হীরা নেয়নি ওরা গাড়িতে। এটাই আশা করেছিল ও। মেয়েটা নিশ্চই জানে হীরাগুলো কোথায় আছে। কিন্তু না, ওকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। সাবধান হয়ে যাবে সবাই।

আড়চোখে চেয়ে দেখল একবার সুফিয়ার দিকে। এখনও বাঁকের দিকে চেয়ে আছে সে। পটেছে মাগী। বুক দুটো বেশি বড় না। লুইস কি করে ওই ছোট বুক পছন্দ করল, বুঝতে পারে না ফ্রেড। তবে পাছাটা দেখবার মত বটে। একবার শোয়াতে পারলে আশ মিটত। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব। কালুয়াগুলো লুইসকে খোদার সমান বা সেই রকম কিছু মনে করে। ওর গায়ে হাত দিলে শালারা ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। ওর চিন্তা বাদ দিয়ে হীরা নিয়ে বর্ডারের দিকে কেটে পড়াই ভাল।

হেলমেটটা মাথায় বসিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে জো-র ট্রাকটার দিকে এগোল ফ্রেড। ম্যাপ, কম্পাস, দুটো বাড়তি ম্যাগাজিন সবই জোগাড় হয়ে গেছে; এখন হীরাগুলো পেলেই ষোলো কলা পূর্ণ হয়। ট্রাকে উঠে বসল সে। ড্যাশবোর্ড খুলে হাতড়াল। না, এখানে নেই। কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারে সে এই ট্রাকেই কোথাও লুকানো আছে হীরা। ওরা ভাবছে, ট্রাক অচল হয়ে যাওয়ায় ও বুঝি বাঁধা পড়ে থাকবে এখানে। ওদের একবারও মনে হয়নি যে আঙ্কেল ফ্রেড হীরা নিয়ে হাঁটা দিতে পারে। শব্দ করে বন্ধ করল সে ড্যাশ বোর্ড। গেল কোথায়! সীটের তলায় থাকতে পারে। ঝুঁকে হাত ঢুকাল সে সীটের নিচে। ক্যাপ্টেন, ভেবেছ বোকার মত আমি বসে থাকব তোমার অপেক্ষায়? আমাকে ফেরত নিয়ে গিয়ে কোর্ট মার্শাল করাবে? খবর আছে তোমার জন্যে ক্যাপ্টেন, নতুন খবর, পিলে চমকানো খবর।

বর্ডারে গার্ড নেই। তিন-চার দিন লাগবে সীমানা পেরিয়ে ফোর্ট রোজবেরীতে পৌঁছতে। সাথে পকেট ভর্তি হীরা। ওখান থেকে সোজা প্লেনে চেপে ন্ডোলা। তারপরেই খোলা দুনিয়া আর ফুর্তি। এই মাগীর চেয়ে কত সুন্দরী মেয়ে তখন পায়ে লুটাবে ওর।

সীটের তলায় ধুলো, জ্যাক আর স্প্যানার ছাড়া কিছুই নেই।

দুঃখ এই যে হারামজাদা লুইসকে একটা সমুচিত শিক্ষা দিয়ে যেতে পারছি না। মনে পড়ল ঠিকই, কিন্তু বড় দেরিতে। এলিজাবেথভিলে থাকতেই যদি কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারতাম, তাহলে বোঝা যেত কে কার কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করে! পরিষ্কার মনে পড়েছে ওর, ব্যাটা আরব, ওকে বন্দী করে এই লোকের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দু'বছর আগে লেবাননের এক আলফাত্তাহ্ ক্যাম্পে। সিভিল ড্রেসে ছিল লোকটা, কিন্তু মেজর, এমন কি কর্ণেল পর্যন্ত সমীহ

করে কথা বলছিল এর সাথে। নিশ্চয়ই কোন কুমতলবে ঢুকেছে ব্যাটা কাতাঙ্গা আর্মিতে। সময় মত ফাঁস করে দিতে পারলে কাজ হত। কিন্তু উপায় নেই, এখন ওর নিজেরই দৌড়াবার সময়।

পড় পড় করে রবারের ম্যাটটা ছিঁড়ে ফেলল সে মেঝে থেকে। ধুলোয় কাশল একটু। ভুল হয়েছে, ওকে পোর্ট রিপ্রিভেই শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু না, ওই শালা না থাকলে ব্রিজ মেরামত করে নদী পার হতে পারত না ওরা, এটাও ঠিক।

স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরল ফ্রেড। বাইরে চোখ পড়ল। ট্রাকটার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েলোকটা। একটা তোয়ালে, কিছু কাপড় আর একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ রয়েছে ওর হাতে।

সার্জেন্ট আগু বাধা দিল। তর্কাতর্কি করছে ওরা। ব্যাগের ভেতর কি যেন দেখাল মেয়েলোকটা জিপ খুলে হাসল। কি দেখাচ্ছে মাগী? মাথা নাড়ছে আগু। অনুমতি দিল সার্জেন্ট ভেবেচিন্তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েলোকটা ছোট্ট ঝর্ণাটার দিকে। পনি টেইল করে বেঁধেছে চুল। গোলাপী শার্টের কলারের কাছে দোল খাচ্ছে চুলের গোছা। কোমরে পরিপূর্ণ যৌবনের দোল। খচ করে উঠল ফ্রেডের কলজেটা। তল পেটের পেশীতে কেমন যেন অদ্ভুত এক অনুভূতি। স্নান করতে যাচ্ছে লুইসের মেয়েলোক। নিশ্চয়ই ন্যাংটো হয়ে নামবে পানিতে! বুকের ভেতর ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। ঝর্ণার ঢালে অদৃশ্য হয়ে গেল পনি টেইল।

পেয়েছে! লুইসকে জব্দ করার একটা উপায় পেয়েছে ফ্রেড। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। আসছি, দাঁড়াও!

ঝুঁকে পড়ে ড্যাশ বোর্ডের পেছনের ফোকরে হাত ঢোকাল ফ্রেড। ইলেকট্রিক্যাল তারের পাশে ক্যানভাস ব্যাগের স্পর্শ পাওয়া গেল। এসো, আঙ্কেল ফ্রেডের কাছে এসো! ব্যাগগুলো খুলে পরীক্ষা করে দেখল সে। তৃতীয়টায় পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। ব্যাগের ভেতর ঝলমল করছে হীরা। ব্যাগটা পকেটে ভরে বোতাম এঁটে দিল সে। বাকি ব্যাগগুলো নিচে ফেলে লাথি দিয়ে সীটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। রাইফেলটা তুলে নিয়ে নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

অবাক হয়ে চাইল সবাই ওকে জঙ্গলের দিকে এগোতে দেখে। পেটে হাত বুলিয়ে ফ্রেড বলল, 'বড় বেশি মাংস খাওয়া হয়ে গেছে!' ইংরেজি যারা বোঝে তারা হেসে উঠল। ফ্রেঞ্চে বুঝিয়ে বলতেই বাকি সবাইও হেসে উঠল। একজন কি যেন বলল ওদের নিজেদের ভাষায়, বুঝল না ফ্রেড। বনের মধ্যে ঢুকে গেল সে। ক্যাম্প থেকে এখন আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওকে। ঘুরেই ছুটল সে ঝর্ণার দিকে। এমন একটা সুযোগ পেয়ে যাবে কল্পনাও করেনি সে। নিজের মনেই হেসে উঠল খুশিতে।

রাস্তাটা যেখানে ঝর্ণা পার হয়েছে তার গজ পঞ্চাশের মধ্যেই মনের মত জায়গা পেয়ে গেল সুফিয়া। দু'পাশেই নলখাগড়ার-ঝোপ। বেশ নিরিবিলি জায়গাটা। দুই তীরে ঝাঁকড়া হয়ে ফুটেছে অসংখ্য ফুল। বালি চিকচিক করছে ঝর্ণার তলায়। দুই ফুট মত গভীর হবে, তলা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কালো মসৃণ পাথরগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। চকচকে, গোল। ছোট ছোট মাছগুলো পাথরের গায়ে শ্যাওলা ঠোকরাচ্ছে।

খালি পায়ে বালির ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিল সুফিয়া। নল-খাগড়ার ঝোপ পর্দার কাজ করছে। সার্জেন্ট আগুকে বলে এসেছে সে, যতক্ষণ আছে এদিকে যেন কাউকে আসতে না দেয়।

জামা-কাপড় খুলে ফেলল সে। বড় কালো পাথরটার ওপর সব রেখে সাবানটা হাতে নিয়ে পানিতে নামল। মাঝামাঝি গিয়ে বসল বালির ওপর। গলা পর্যন্ত পানি। সাবান দিয়ে চুল ধুয়ে নিল, উঠে দাঁড়িয়ে সারা গায়ে মাখল মনের সুখে। তারপর লম্বা হয়ে গা এলিয়ে দিল পানিতে।

ছোট ছোট মাছগুলো ঘুরঘুর করছে কাছে পিঠে। কেউ কিছু বলছে না দেখে দুঃসাহসী হয়ে উঠল। কাছে এসে ঠোকর দিচ্ছে, কেউ বা গা ঘষছে। সুড়সুড়ি লাগছে সুফিয়ার। হাত নেড়ে পানি ছিটিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল মাছগুলোকে। ঝিলিক দিয়ে একটু সরে যায়, আবার ছেঁকে ধরে। একেবারে বেহায়া নাছোড়বান্দা। শেষে কয়েকটা যখন ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে শরীরের যত্রতত্র হামলা চালাল, বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল সুফিয়া। তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে এমনি সময় দূরের একটা ঝোপ নড়ে উঠতে দেখল। প্রথমেই মনে পড়ল ফ্রেডের কথা। ত্রস্ত হাতে কোনমতে জামা-কাপড় পরে নিয়েই ছুটল সে ক্যাম্পের দিকে। ভীষণ ভয় পেয়েছে।

ছুটতে ছুটতে ক্যাম্পে পৌঁছে গেল সে। অমন করে ছুটতে দেখে সার্জেন্ট আগু রাইফেল তুলে নিল হাতে। 'কিছু হয়েছে, ম্যাডাম?' রাইফেলের সেফটি ক্যাচে তার বুড়ো আঙুল।

'না, এমনি দৌড়েছি আমি।' সার্জেন্ট আগুর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চাইল সুফিয়া। দেখল সে যে-পথে এসেছে, সেই পথ ধরেই এগিয়ে আসছে ফ্রেড ক্যাম্পের দিকে।

'আশ্চর্য!' বলল আগু। আঙুল তুলে দেখাল, 'গেল ওই দিকে, ফেরত আসছে এই দিক থেকে। সাঙ্ঘাতিক হারামী লোক তো!'

ভীষণ একটা ফাঁড়া কেটেছে, বুঝল সুফিয়া। ক্যাম্পে ফিরতে আর একটু দেরি করলেই জঘন্য রকমের অসভ্য লোকটার লালসার শিকারে পরিণত হতে হত ওকে।

হ্যাণ্ড ব্যাগের জিপ খুলে পিস্তলটা দেখল সে। সাহস ফিরে এল কিছুটা।

সাবধান থাকতে হবে! কখন পিস্তল দরকার পড়বে বলা যায় না।
অশুভ কোন প্যাঁচ আঁটছে লোকটা মনে মনে।

চব্বিশ

বিয়ারের খালি বোতলটা তুলে ধরে পরীক্ষা করল জো। সন্তুষ্ট নয় সে। 'এক ঢোক খেতে না খেতেই শেষ!' জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল সে বোতলটা। একটা গাছে বাড়ি খেয়ে ভাঙল সেটা।

'ফেরার পথে কোন অসুবিধে হবে না, খালি বোতলগুলো দেখেই পথ চিনে ফিরতে পারব আমরা,' হাসল রানা। বিয়ার খেতেও পারে লোকটা। সেই রওনা হবার পর থেকেই একের পর এক চালিয়ে যাচ্ছে, থামার নাম নেই।

'আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল জো।

মাইল মিটারের দিকে চেয়ে রানা বলল, 'সত্তর মাইল এসেছি আমরা। আর বেশি বাকি নেই।'

চুপচাপ চলল ওরা কিছুক্ষণ। খোলা উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে বাতাস এসে লাগছে ওদের চোখে মুখে। উড়ছে রানার চুল।

'ওই যে রেললাইন দেখা যাচ্ছে,' আঙুল তুলে দেখাল জো।

'হ্যাঁ, প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা।' খোলা জায়গা দিয়ে চলছে গাড়িটা। গাছের ওপর দিয়ে ম'সাপা জংশনের পানির ট্যাঙ্কটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'এসে গেছি!' হাতের বোতলটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল জো।

'এখন টেলিগ্রাফ লাইনটা ঠিক থাকলেই হয়,' বাড়ির সারি পার হতে হতে বলল রানা। গাড়ির গতি কমাল একটু। ক্যাসিয়া ফ্লোরা গাছের তলায় কবরগুলো দেখা যাচ্ছে, জো-ও দেখল চেয়ে, কিন্তু কেউই কোন মন্তব্য করল না।

স্টেশন ঘরের সামনে গাড়ি থামাল রানা। চারদিক জনমানব শূন্য—খাঁ খাঁ করছে। একসাথে বুটের আওয়াজ তুলে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা অফিস ঘরটার দিকে।

দরজা খুলে ভেতরে চাইল রানা। দেওয়ালে সবুজ রং, কয়েকটা কাগজ পড়ে আছে মেঝেতে। যত্নের অভাবে সব কিছুর ওপরই পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। একপাশে ড্রয়ার খোলা একটা ছোট টেবিল, তার সামনে হাতল ভাঙা চেয়ার। টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা। পিতল আর বার্নিশ করা কাঠের একটা জটিল সমাবেশ।

'ওই যে ওখানে, বস্,' প্রয়োজন ছিল না, তবু বলল জো।

'ভালই আছে মনে হচ্ছে, কোথাও লাইন কেটে না থাকলেই বাঁচা যায়।'

লাইন যে কাটা নয়, এটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন ঠিক সেই মুহূর্তে কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজ শুরু করল যন্ত্রটা।

'কপাল ভাল আমাদের!' এগিয়ে গেল ওরা টেবিলটার দিকে।

'আপনি চালাতে পারেন এই মেশিন?' জিজ্ঞেস করল জো।

'খুব ভাল না। প্র্যাকটিস নেই। তবে, মনে হয় কাজ চালাবার মত পারব।' এলিজাবেথভিলের কোড ট্র্যান্সমিট করতেই সাথে সাথে জবাব পাওয়া গেল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, যে কিছুই বুঝল না রানা। একটু ধীরে ট্র্যান্সমিট করার অনুরোধ জানাল সে। অনেক চেষ্টার পরে ওদিককার অপারেটরকে বোঝাতে পারল যে প্রেসিডেন্টের স্টাফ, কর্নেল ডেভিডের জন্যে একটা জরুরী সংবাদ আছে।

ওদেরকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে থেমে গেল টরে-টক্কা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ওরা। পনেরো মিনিট, একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা কেটে গেল, কোন সাড়া শব্দ নেই ওদিক থেকে। 'শালা ঠিক ভুলে গেছে আমাদের কথা।' বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে বিয়ার আনতে গেল জো।

এলিজাবেথভিলে পৌঁছে হোটেলের নরম বিছানায় কেমন আরামে গা এলিয়ে দেবে, ভাবছে রানা। নরম বিছানার আরামে মুখটা হাসি হাসি হয়ে উঠেছে। 'হাসছেন কেন, বস্?' বিয়ার নিয়ে ফিরে এসেছে জো।

'নরম একটা বিছানার কথা ভাবছিলাম আমি।'

'সত্যি? ভাল কথা ভাবছেন, বস্। আমাদের জন্ম বিছানায়। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় আমরা কাটাই বিছানায়। আনন্দ যা পেয়েছি, সে-ও ওই বিছানাতে। আর কপাল ভাল থাকলে মরবও ওখানেই। বিয়ার চলবে, বস্?'

হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল টেলিগ্রাফ মেশিনটা রানার কনুইয়ের কাছে। তাড়াতাড়ি ওদিকে মনোযোগ দিল রানা।

'লুইস্—ডেভিড।' কটকট কটকট করে বলল ওটা। ছোটখাট লাল মুখো মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা কল্পনায়। থার্ড ব্রিগেডের অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। ও. এ. এস-এর একজন হর্তাকর্তা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে এখনও ওর মাথার অনেক দাম ফ্রেঞ্চ বাজারে।

'ডেভিড—লুইস্।' জবাব দিল রানা। 'ট্রেন অচল, জেনারেল ফ্রস্টের ট্রাকে করে ফিরছি আমরা। পেট্রল ও মোবিলের অভাবে এখন ট্রাকও অচল হয়ে পড়েছে ম'সাপা থেকে আশি মাইল দূরে। বারো গ্যালন মোবিল আর দু'শো গ্যালন পেট্রল দরকার।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ; কোন সাড়া পাওয়া গেল না ওদিক থেকে।

'ইউনিয়ন মিনিয়ের-এর মাল কার হেফাজতে আছে?' প্রশ্ন এল আচমকা।

'আমার,' মুচকি হেসে জবাব দিল রানা।

'যত জলদি সম্ভব প্লেনে করে মোবিল আর পেট্রল পাঠাচ্ছি। অপেক্ষা করো।'

‘ধন্যবাদ, ওভার অ্যাণ্ড আউট।’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে জো রানার দিকে। টরে-টক্কা করে এতক্ষণ কি কথা হলো কিছুই বোঝেনি সে।

‘ওরা প্লেনে করে তেল-মোবিল পাঠাবে…সম্ভবত আগামীকাল সকালে,’ ব্যাখ্যা করল রানা, ‘আর কোন চিন্তা নেই। এগারোটা বাজে, এবার ফেরা যাক।’

ড্রাইভ করছে রানা। মনটা খুশি। সহজেই কাজ হয়ে গেল।

‘এত খুশি হতে আপনাকে কোনদিন দেখিনি, বস্।’

‘কারণ আছে খুশি হবার।’ এতগুলো মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব তার ওপর। দায়িত্ব সমাধা করেছে, ওদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছে সে, খুশি তো হবেই।

ভুল বুঝল জো। ‘ভাল মেয়ে, এখনও নবীন, শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের মন মত গড়ে তুলতে পারবেন।’

হাসল রানা।

‘সত্যিই, বিয়ে করবেন ওকে, বস্?’

‘ভবিষ্যতের কথা কেউ কিছু বলতে পারে?’

‘সুখে থাকতে হলে একটা মানুষের অনেকগুলো বৌ দরকার,’ বিজ্ঞের মত বলল জো। ‘আমার তিনটে আছে, আরও গোটা দু’য়েক হলে ভাল হয়।’

‘একটাকেই সামলাতে পারব না, এই ভয়ে আজ পর্যন্ত বিয়েই করলাম না, এতগুলোকে সামলাও কি করে তুমি?’ মজা পাচ্ছে রানা জো-র কথায়।

‘একটা সামলানো সত্যিই কঠিন। দুইটায় একটু চেষ্টা লাগে। তিনটে হলে নিশ্চিন্ত। আর চারটে হলে তো কথাই নেই, ওরা নিজেদের ঝগড়া নিয়ে এমনই ব্যস্ত থাকবে যে মোটেও জ্বালাতন করবে না আপনাকে।’

‘ইসলাম ধর্মে সেই জন্যেই বোধহয় চারটে বিয়ে জায়েয্ আছে।’

গোটা পথ একের পর এক বিয়ারের বোতল শেষ করল জো।

বাঁক নিতেই গোল করে রাখা ট্রাকগুলো দেখতে পেল ওরা। গাড়ি আসতে দেখে সবাই জড় হচ্ছে একসাথে। হ্যাণ্ডব্যাগ কাঁধে সুফিয়াকে দেখা যাচ্ছে সবার আগে। হৈ-চৈ চিৎকার আর অভ্যর্থনার মাঝে রিভার্স করে পার্ক করল রানা গাড়িটা।

গাড়ি থেকে নেমেই ভরাট গলায় ঘোষণা করল জো এয়ারড্রপের কথা। প্রচণ্ড এক হর্ষধ্বনি বেরিয়ে এল সবার মুখ থেকে। দারুণ খুশি ওরা। আর কোন চিন্তা নেই, কেবল অপেক্ষা।

রানাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল জো। ‘বস্, কেউ ইচ্ছে করে ট্রাকের তেল ফেলে দিয়েছিল। আবারও যদি সে সেই চেষ্টা করে?’

‘চলতি গাড়িতে কেউ আর সে সুযোগ পাবে না। এরপর কোথাও থামছি না

আমরা। একটানে এলিজাবেথভিল।' হাসল রানা, 'ভাল কথা, হীরাগুলো ঠিক আছে কিনা চেক করো জলদি। ওগুলো খোয়ালে জবাই করে ফেলবে ডেভিড।'

'এই যাচ্ছি, বস্।'

দু'জন একসাথে এগুলো ট্রাকের দিকে।

হঠাৎ মেয়েলি চিৎকারে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। হ্যাঁচকা টানে সুফিয়াকে গাড়িতে তুলে নিয়েছে ফ্রেড। ধুলো উড়িয়ে রওনা হয়ে গেল ফোর্ড। জো-র রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। বাঁক ঘুরতে পারলেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে ওরা। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা বাঁকের দিকে। পরপর কয়েকটা গুলি করল রানা। স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি। দূরে দেখা গেল, সুফিয়ার হাত ধরে টানতে টানতে উঁচু পাহাড়টার দিকে দৌড়াচ্ছে ফ্রেড।

'হীরা খোয়া গেছে, বস্!' অপরাধীর মত ঘোষণা করল জো।

'জানি,' বলল রানা। গম্ভীর।

জো আর আগু তাদের লোকজন নিয়ে ঘিরে ফেলেছে পাহাড়টা। অদ্ভুত শব্দ করছে ওরা মুখ দিয়ে। রণ-হুঙ্কার! খেপেছে ওরা। ক্ষমা নেই ফ্রেডের। অল্প দিনেই সবার প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছিল সুফিয়া।

চারদিক ঘুরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। খাড়াভাবে উঠে গেছে পাহাড়টা। একটাই মাত্র পথ। এই পথেই উঠতে হবে তাকে। ফ্রেডকেও নামতে হলে ওই পথেই নামতে হবে। রাইফেলটা চেক করে নিল একবার। সাবধানে গাছের আড়ালে আড়ালে ওপরে উঠে যাচ্ছে সে। নিচে থেকে অনেকগুলো উদগ্রীব চোখ লক্ষ্য করছে ওকে। মাঝামাঝি উঠে নিচের দিকে চাইল রানা। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে জো ওর দিকে। একটা ছুতো পেলেই সাহায্য করার জন্যে ছুটে আসার জন্যে তৈরি সে। ওর প্রকাণ্ড শরীরের সাথে ওর হাতে ধরা রাইফেলটা মানাচ্ছে না, খেলনা রাইফেলের মতই দেখাচ্ছে দূর থেকে।

উপরে উঠতে আরম্ভ করল রানা আবার। প্রায় পৌঁছে গেছে সে। বড় পাথরটার পাশে শুয়ে পড়ল। আর পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ফ্রেড নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে বসে আছে, কোন মাথা দেখা দিলেই গুলি করে ছাতু করে দেবে। ক্রল করে এগিয়ে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে উঁকি দিল রানা। ওপরটা খোলামেলা। তিন চারটে বড় গাছ ছাড়া কিছুই নেই। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে একটা বড় পাথরের ওপর দিয়ে ফ্রেডের হেলমেট দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ক্রল করে ডান দিকে সরে এল রানা। পঁচিশ হাত দূরের হিজল গাছটা বেশ মোটা। সম্পূর্ণভাবে আড়াল করেছে ওটা ফ্রেডকে। গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল সে। কিন্তু এখন? আর মাত্র বিশ হাত দূরে পাথরটার আড়ালে রয়েছে ফ্রেড। মাঝে আর কিছু নেই। একেবারে ফাঁকা। লুকিয়ে এগোবার উপায় নেই।

গাছের গুঁড়িটার আড়ালে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। কোন রকমে ফ্রেড একবার উঠে দাঁড়ালেই হয়। কিন্তু, সুযোগ পেল না সে। ও কি তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেল? উত্তর পেয়ে গেল রানা প্রায় সাথে সাথেই। 'লুইস, আমি জানি, তুমি হিজল গাছের পেছনে লুকিয়ে আছ। রাইফেল ফেলে দিয়ে হাত তুলে বেরিয়ে এসো।' ফ্রেডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কোন সাড়া দিল না রানা।

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না আমি।' আবার শোনা গেল ফ্রেডের গলা। 'পাঁচ পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে বেরিয়ে না এলে কড়ে আঙুলটা উড়ে যাবে ওর।'

জবাব দিল না রানা।

সামান্য একটু চোখ বের করে দেখল সে গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে। দুটো হাত দেখা যাচ্ছে পাথরের ওপর দিয়ে। বাম হাতে সুফিয়ার কব্জি ধরেছে ফ্রেড। কড়ে আঙুলের নিচে রাইফেলের নলটা দেখা যাচ্ছে।

'এক,' গুনছে ফ্রেড, 'দুই!'

'যত নির্যাতনই করুক, আমি সহ্য করতে পারব, তুমি বেরিয়ো না, লুইস।' সুফিয়ার গলা শুনতে পেল রানা। 'তুমি বেরুলেই তোমাকে গুলি করবে ও।'

'তিন···চার···'

হাত তুলে এগিয়ে এল রানা।

খালি হাতে ওকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল ফ্রেড। রাইফেলটা রানার বুকের দিকে তাক করা। মুখে ম্যানিয়াকের হাসি। 'অনেক অপমান সহ্য করেছি আমি, ক্যাপ্টেন লুইস্। আজ তোমাকে···'

'নিচের দিকে চেয়ে দেখো, গর্দভ!' ধমক দিল রানা। 'পাগলামি কোরো না; সারেণ্ডার করো, তোমার যাতে হালকা শাস্তি হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব।'

'এখনও চালবাজি! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও?' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল ফ্রেড। 'আমার পিঠটা দেয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছ তুমি, লুইস। আমি জানি, মরতে হবে আমার। কাজেই নাটুকে প্যাচাল বাদ দাও। এরা ছাড়বে না আমাকে। আমিও ছাড়ব না তোমাকে। রেডি, ওয়ান, টু, থ্রী!' ট্রিগার টেনে দিল সে।

ঝাঁপিয়ে পড়ল সুফিয়া রাইফেলটার ওপর। ট্রিগার টিপে দিয়েছে ফ্রেড, কিন্তু ওয়ান, টু, থ্রী বলেই করেছে ভুলটা। থ্রী বলার ঠিক আগের মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়েছে রানা ডানদিকে। কিন্তু কপাল মন্দ, গুলিটা ওর বাম পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু সুফিয়ার ধাক্কায় নলটা খানিক সরে গেল ডাইনে। রানার বাম হাতের বাহুমূল থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

ঠিক যেন ইলেকট্রিক শক খেল ও।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। দড়াম করে পড়ল মাটিতে। এদিকে রাইফেল ধরে ঝুলছে সুফিয়া। অটো-তে সেট করা রাইফেল থেকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই

বেরিয়ে গেল বিশটা গুলি, রানার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে ঝাঁঝরা করে দিল হিজল গাছটাকে।

প্রচণ্ড এক ঝটকা দিয়ে সুফিয়ার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিল ফ্রেড, টান দিয়ে বের করে নিল বেল্টে গোঁজা স্পেয়ার ম্যাগাজিন। মরিয়া হয়ে পা চালাল রানা। ফ্রেডের পায়ের গোড়ালির একটু ওপরে পড়ল লাথিটা। বাম পা শূন্যে উঠে গেল ওর। ঠিক সেই সময় ধাক্কা দিল ওকে সুফিয়া। ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল ফ্রেড মাটিতে, হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল স্পেয়ার ম্যাগাজিন, কিন্তু রাইফেলটা ছাড়েনি সে; একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারল সুফিয়ার চোয়ালে। পড়ে গেল সুফিয়া। সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়াল সে রানার দিকে।

দরদর করে রক্ত বেরিয়ে ইউনিফরম ভিজিয়ে দিচ্ছে, কাঁধ থেকে মরা সাপের মত ঝুলছে রানার অবশ হয়ে যাওয়া বাম হাত। ব্যথায় কুঁচকে আছে মুখ। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে, এমনি সময় প্রাণপণ শক্তিতে রাইফেলের কুঁদো চালাল ফ্রেড। আঘাতটা মাথায় পড়লে ছাতু হয়ে যেত রানার মাথাটা। কাঁধের ওপর পড়লে অবশ হয়ে যেত ডান হাতটাও। কিন্তু লাগল না। ওর শরীর স্পর্শই করতে পারল না রাইফেলের বাঁট। চোখের পলকে সরে গেছে সে জায়গা থেকে। প্রচণ্ড বেগে নেমে এল কুঁদোটা, একটা কৎবেল সাইজের পাথরের ওপর এতই জোরে পড়ল যে চৌচির হয়ে চারদিকে ছিটকে গেল সেটা, দু'টুকরো হয়ে ফেটে গেল কুঁদো, প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে ছুটে গেল রাইফেলটা ফ্রেডের হাত থেকে।

মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার ওপর। দুই হাতে সামনে ঘুসি চালাচ্ছে সে। এক হাত দিয়ে কিছুতেই সামলাতে পারছে না রানা ওকে। একবার একটা লাথি মারার সুযোগ পেল রানা, আরেকবার ফ্রেডের ভুল স্টেপিঙের সুযোগে ল্যাং মেরে ফেলে দিল তাকে মাটিতে, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারল না ওকে। খ্যাপা ষাঁড়ের শক্তি ফ্রেডের গায়ে, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিগুণ বিক্রমে আক্রমণ করল আবার।

পেটে, বুকে, নাকে, মুখে ঘুসি খেয়ে ভোঁ ভোঁ করছে রানার মাথা। মারতে মারতে তাকে খাড়ির দিকে নিয়ে চলেছে ফ্রেড। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা ওর মতলব: পাহাড় থেকে ওকে নিচে ফেলে দিতে চাইছে ফ্রেড। এক পলক দেখতে পেল রানা জো-কে। দৌড়ে উঠে আসছে ওপরে, ওর পেছনে আরও কয়েকজন। কিন্তু এখনও অনেক নিচে রয়েছে ওরা, অন্তত দশ মিনিট লাগবে ওদের এখানে এসে পৌঁছতে। জানে রানা, ততক্ষণ টিকতে পারবে না সে ফ্রেডের ঘুসির তোড়ের মুখে। জখমের ওপর দুটো ঘুসিই ওকে কাহিল করেছে বেশি।

প্রাণপণ যুঝতে চেষ্টা করল রানা একহাতে যতটা সম্ভব। খাড়ির একেবারে কিনারে চলে এসেছে সে। নিচের দিকে একবার চেয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল ওর।

তিন হাত-পা চালিয়ে সরে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু এক কদম সামনে বাড়তে দিচ্ছে না ওকে ফ্রেড। দমাদম ঘুসি চালাচ্ছে সে, সুযোগ পেলেই লাথি।

ঠিক এমনি সময়ে ফ্রেডের তলপেট বরাবর একটা লাথি মারতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা, চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায়। অভিনয়টুকু বুঝতে পারল না ফ্রেড, ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকের ওপর। ভেবেছিল, শেষ কয়েকটা ঘুসি মেরে সংজ্ঞাহীন করবে রানাকে, তারপর লাথি মেরে ফেলে দেবে নিচে। কিন্তু কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। নিজের ভুলটা যখন বুঝতে পারল, তখন অন্তিম চিৎকার দেয়া ছাড়া করার আর কিছুই রইল না ওর।

ফ্রেড ঝাঁপ দেয়ার সাথে সাথেই ব্যথার চিহ্ন মুছে গেছে রানার মুখ থেকে, চোখের নিমেষে পা ভাঁজ করে হাঁটু দুটো বুকে লাগিয়ে ফেলেছে সে। উড়ে গিয়ে পড়ল সে বুকে নয়, রানার বুটের ওপর। সাথে সাথেই স্প্রিঙের মত সোজা হয়ে গেল রানার পা দুটো। শূন্যে উঠে গেল ফ্রেড তলপেটে লাথি খেয়ে, শূন্যেই ঘুরল একপাক; তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে।

বুক ফাটা চিৎকার শুনে সংবিৎ ফিরল রানার। উঠে বসে যখন নিচের দিকে চাইল, তখনও নামছে ফ্রেড। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল সে পাথরের ওপর, পড়েই কাত হয়ে গেল। পতনের শব্দটা পৌঁছল না এত উঁচুতে, কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মাথার পিছনটা থেঁতলে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল রানা। মাথাটা ঘুরে উঠল। ইউনিফর্মের বাম হাতটা ভিজে চটচট করছে। বসে পড়ল আবার।

'চোট পেয়েছেন, বস্?' সুফিয়াকে দু'জনের কাঁধে তুলে দিয়ে রানার দিকে এগিয়ে এল জো।

'সুফিয়ার কি অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভয়ের কিছু নেই, জ্ঞান হারিয়েছে, ঠিক হয়ে যাবে,' রানার হাতের ক্ষতটা পরীক্ষা করতে করতে বলল জো। 'গুলি বেরিয়ে গেছে, বস্, ব্যাণ্ডেজ করে দিলেই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।'

নিচে নেমে মৃতদেহটার সামনে দাঁড়াল রানা। ওরই এই অবস্থা করতে চেয়েছিল ফ্রেড। কাত হয়ে পাথরের ওপর পড়ে আছে দেহটা। ওর পকেট থেকে ক্যানভাসের ব্যাগটা বের করে নিয়েই ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াল সে।

ক্যাম্পে ফিরে দেখল, চোখেমুখে পানি ছিটানোর পরও জ্ঞান ফেরেনি সুফিয়ার। লোকজন জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর চার পাশে। জো-কে একপাশে ডেকে নিল রানা। স্মেলিং সল্ট নেই, সুতরাং বিকল্প উপায়ই বেছে নিতে হবে। 'তোমার লোকজনের মধ্যে কার মোজায় দুর্গন্ধ বেশি?'

'নয়াঙ্গার মোজায়, বস্।' অবাক হলো জো। 'কেন?'

'ওর একটা মোজা নিয়ে এসো।' জো-কে নির্দেশ দিয়ে সুফিয়ার মাথার কাছে বসল রানা। পাল্স পরীক্ষা করে দেখল, নরমাল। সামান্য একটু ফুলে আছে ডান দিকের চোয়াল। কপাল ছুঁয়ে দেখল টেম্পারেচার নেই।

মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে জামিলের।

'আপা বাঁচবে তো?'

হাত বাড়িয়ে ওর থুতনি নেড়ে দিল রানা।

'কোন চিন্তা নেই, ক্যাপ্টেন। এক্ষুণি ভাল করে দিচ্ছি তোমার আপাকে।'

রানাকে দিল জো মোজাটা। সবাই অবাক হয়ে দেখছে ক্যাপ্টেনের কার্যকলাপ।

সুফিয়ার নাকের সামনে ধরল সে মোজাটা। নিজের নাকটা টিপে রেখেছে রানা দুই আঙুল দিয়ে। পাঁচ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। কিচ্ছু না। তারপরেই চোখের পাপড়ি দুটো একটু কেঁপে উঠল সুফিয়ার। নাকটা কুঁচকে উঠছে। অচেতন অবস্থাতেও ওই গন্ধ শুঁকতে রাজি নয় সে। নড়ে উঠল এবার। পরমুহূর্তে চোখ মেলে চেয়েই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানার হাত। মোজায় এমনই বিটকেল দুর্গন্ধ যে ফ্রেডের নাকের সামনে ধরলে সে-ও হয়তো উঠে বসতে বাধ্য হত।

ন্‌য়াঙ্গাও এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। সলজ্জ হাসি হাসছে সে। আবার একটু গর্বও বোধ করছে এই ভেবে যে এমন কঠিন রোগের ওষুধ তার কাছে আছে সে নিজেও জানত না! মোজাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রানা।

পঁচিশ

হোটেল গ্র্যাণ্ড লিওপোল্ড দি সেকেণ্ড-এর বার রিজার্ভ করেছে রানা। লাউঞ্জ থেকে ডিনার সেরে বারে উপস্থিত হয়েছে টার্গেট নাইনের সকল জীবিত অভিযাত্রী। আজ যে যা খাবে সব বিল দেবে ক্যাপ্টেন লুইস, ঘোষণা করে দিয়েছে রানা। যার যা খুশি, বিয়ার, হুইস্কি, জিন, রাম চালাচ্ছে সবাই। জো-র ব্যারেলটা রাখা হয়েছে ঠিক মাঝখানে। ইতিমধ্যেই সিকিভাগ খালি হয়ে গেছে ব্যারেল। ঘন ঘন টয়লেটে যাচ্ছে, কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে জো সমানে।

সবাই লক্ষ করেছে আজ সকাল থেকে বিগ জো আর সার্জেন্ট আগুর বাম হাতের মধ্যমায় শোভা পাচ্ছে অত্যন্ত দামী দুটো হীরের আংটী, কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করলে হাসে, জবাব দেয় না।

মেজর ডেভিডের হাতে গুনে গুনে নয়টা হীরা তুলে দিয়েছে রানা। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হীরার থলেগুলোও। সেই সাথে রেজিগনেশন লেটার। আগামী কাল সকাল দশটায় ওর ফ্লাইট। অ্যালিটালিয়ার মর্নিং ফ্লাইটে রোম যাচ্ছে সে। শেষ সন্ধ্যাটা দলের

লোকজনের সাথে কাটানোর ইচ্ছেতেই পার্টি। সবাই কাতাঙ্গা আর্মির স্পেশাল স্ট্রাইকার ফোর্স-এর যোদ্ধা, ব্যতিক্রম শুধু সুফিয়া ও জামিল। একটা টেবিলে রানার সাথে বসে আছে ওরা। হাসছে সবার কাণ্ড কারখানা দেখে। জামিলের হাতে একটা বেবি শ্যাম, রানা-সুফিয়া চুমুক দিচ্ছে শ্যাম্পেনে। টেবিলের ওপর পিতলের বালতিতে বরফ কুচির মধ্যে শ্যাম্পেনের বোতলটা রাখা।

রানার পরনে ছাই রঙা দামী একটা সিভিলিয়ান স্যুট, মেরুন স্ট্রাইপড় টাই। কোটের বাটন হোলে সদ্য প্রস্ফুটিত একটা লাল গোলাপের কলি। সুফিয়ার দেয়া। নোংরা ইউনিফরম্ পরা সেই ঘর্মাক্ত ক্যাপ্টেন লুইস পেগান বলে চেনাই যায় না। অপরূপ সুন্দর লাগছে আজ সুফিয়াকেও। হালকা নীল সিল্কের শাড়ি পরেছে সে, কালো সুতীর ব্লাউজ। রানাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আজকের পার্টিতে কি পরলে ভাল লাগবে ওর। রানা বলেছে, বাংলাদেশের সাজ। একটু অবাক হয়েছিল সুফিয়া, কিন্তু কথা রেখেছে। পরীর মত লাগছে ওকে দেখতে। খোঁপায় একটা ধবধবে সাদা গন্ধরাজ। রানার দেয়া।

'উহ্, কত কী ঘটল গত কয়দিনে!' মৃদু কণ্ঠে বলল সুফিয়া। 'মনে হচ্ছে, একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম!' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে শ্যাম্পেনের গ্লাসটা নাড়াচাড়া করছে সে। কাল সকালেই হারাবে সে ক্যাপ্টেনকে। চলে যাচ্ছে লুইস। কিছুই ভাল লাগছে না তার। মনে হচ্ছে, দুই হাতে কলজেটা ধরে নিংড়াচ্ছে কেউ। টপ্ টপ্ রক্ত ঝরছে বুকের ভেতর।

'কেমন লাগছে এখন? বিপদমুক্ত হয়ে ভাল লাগছে না?' মৃদু হেসে জানতে চাইল রানা।

চোখ নামিয়ে নিল সুফিয়া, জবাব দিল না।

'আমার খুব খারাপ লাগছে,' বলে উঠল জামিল।

'কেন, ক্যাপ্টেন? খারাপ লাগছে কেন?'

'আপনি চলে যাচ্ছেন, তাই,' শিশুর সরল অকপট স্বীকারোক্তি। 'আপা বলছে, আর কোনদিন নাকি দেখা হবে না আপনার সাথে।'

'দূর, বাজে কথা,' বলল রানা। 'কেউ কিছু বলতে পারে? হয়তো আবার দেখা হয়ে যাবে কোথাও!' সুফিয়ার চোখে চোখে চাইল, 'তোমরা তাহলে লণ্ডন ফিরে যাচ্ছ? কবে?'

'কাল তোমাকে সী-অফ করে লিখব রেজিগনেশন লেটার। খুব সম্ভব পরশু।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা, লুইস··· তোমার ঠিকানাটা দেবে না?'

'দেব। কাল এয়ারপোর্ট-লাউঞ্জে। প্রমিজ।'

বেসামাল পা ফেলে ওদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল বিগ জো। হাতে বিয়ার ভর্তি মগ। নেশা হয়েছে ওর।

'বস্, আমাদের ফেলে এইভাবে চলে যাওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে?' বাম

হাতটা চোখের সামনে তুলে আংটির মস্ত পাথরটা দেখল। 'যতদিন বেঁচে আছি, সাথে থাকবে আপনার স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি তো শুধু দুঃখ দেবার জন্যে, বস্। কি এমন ক্ষতি হত ক'টা বছর আমাদের সাথে এখানে থেকে গেলে?'

'উপায় নেই, জো,' মৃদু হাসল রানা। গত এক ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে চারবার এসেছে সে টেবিলের ধারে এই একই প্রশ্ন নিয়ে। একই উত্তর দিল রানা। ম্লান মুখে ফিরে গেল সে ব্যারেলের কাছে। রানা জানে, আবার কয়েক পাইন্ট পেটে পড়লেই এই প্রশ্নটা উদয় হবে তার মনে, টলতে টলতে এসে হাজির হবে টেবিলের পাশে।

উঠি উঠি করছে রানা, এমনি সময় পকেট থেকে কি একটা বের করে রানার হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল জামিল। 'কি এটা?' অবাক হয়ে চাইল রানা ওর মুখের দিকে।

'গাড়ি। আপনাকে দিলাম।'

বলল জামিল।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রানা, ম্যাচ-বক্স খেলনার ছোট্ট বাক্স।

'ওর সবচেয়ে প্রিয় খেলনা,' বলল সুফিয়া বাক্সটা চিনতে পেরে।

গাড়িটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল রানা। অত্যন্ত পরিচিত মডেল। একেবারে হুবহু এক, রঙটাও মিলে যাচ্ছে ঢাকার লাল ডাটসনটার সাথে। হাত থেকে পড়ে একটা চোখ বসে গেছে একটু। টান দিতেই দরজা খুলে গেল। কল্পনায় চড়ে বসল রানা গাড়িতে। আস্তে করে ঠেলা দিল আঙুল দিয়ে। ঢাকার পরিচিত রাস্তায় চলছে গাড়িটা। একটা বেবি-ট্যাক্সিকে ওভারটেক করছে এখন।

'এটার বুটও খোলা যায়!' রানাকে গাড়ি নিয়ে খেলতে দেখে উৎসাহী হয়ে উঠল জামিল।

'তাই বুঝি?' ফিরে এল রানা ঢাকার রাস্তা থেকে। বুটটা খুলে দেখল একবার। 'বেশ মজার তো!' তারপর চট্‌পট্ কাগজের প্যাকেটে ভরে মাথা ঝাঁকাল জামিলের দিকে। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ক্যাপ্টেন!' পকেটে রেখে দিল গাড়িটা।

আধ ঘণ্টা পর টেবিল ছেড়ে উঠল ওরা। হৈ-হল্লায় মত্ত সবাই। বিয়ার-ব্যারেলের পাশে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে বিগ জো। কাউকেই আর চিনতে পারছে না এখন।

সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে রানার কামরাতেই ঢুকল সবাই। পাশের রুমটা বুক করা হয়েছে সুফিয়া আর জামিলের জন্যে। ওদের দু'জনকেই দাঁড়াতে বলে টেবিলের ওপর থেকে দুটো প্যাকেট তুলে নিল রানা। বড় প্যাকেটটায় জামিলের, ছোটটায় সুফিয়ার নাম লেখা।

প্যাকেট খুলে একটা প্লাস্টিক কেস বের করল জামিল, কেসটা খুলে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল সে। দুটো বাদামী বাঁটের কোল্ট অটোম্যাটিক মুখোমুখি সাজানো

রয়েছে কেসের ভেতর, দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিনে রাবারের বুলেট ভরা, দুটো বাক্সে একশো একশো করে দু'শো গুলি। সেই সাথে রয়েছে একটা বেল্টে পরানো দুটো চামড়ার হোলস্টার। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জামিলের চোখমুখ। ছুটে এসে চুমো খেল রানার গালে। 'অনেক ধন্যবাদ!'

হোলস্টার সহ বেল্টটা ওর কোমরে বেঁধে দিল রানা, দুই হোলস্টারে দুটো পিস্তল ভরে নিয়ে পা ফাঁক করে এমনভাবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল সে যে হেসে ফেলল রানা-সুফিয়া দু'জনেই।

'তুমি জাদু করেছ ওকে!' বলল সুফিয়া।

ওদের দু'জনের হাসিমুখের দিকে চাইল জামিল। বাংলায় বলল, 'আপা, তোমাদের দু'জনকে এত সুন্দর মানায় না! তুমি ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করছ না কেন?'

'যাহ্!' গাল দুটো লাল হয়ে উঠল সুফিয়ার।

'যাহ্ কেন? পছন্দ হয় না তোমার ক্যাপ্টেনকে?'

'তুই থামবি?' ধমক দিল সুফিয়া। 'অভদ্রতা হচ্ছে, ইংরেজিতে কথা বল্!'

'ইংরেজিতে এই কথা বলি?'

'অ্যাই, না! খবরদার!'

অনেক রাত। জানালার ধারে কাউচটা টেনে নিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে রানা। বাইরে ফাঁকা রাস্তার দিকে চেয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে সে। ঘুম আসছে না চোখে। অন্ধকার ঘরে ধিকি ধিকি জ্বলছে আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেট।

খুট্ করে শব্দ হলো। পাশের কামরার দরজাটা খুলল কেউ। মুন ড্রপের গন্ধে টের পেল রানা, তার প্যাকেটটাও খুলেছে সুফিয়া। নিশ্চয়ই রুবির ছোট্ট আংটিটাও পরেছে সে।

পেছন থেকে রানার গলা জড়িয়ে ধরল দুটো মৃণাল বাহু।

'ভয় করছে?' জানতে চাইল রানা হাসিমুখে।

'হ্যাঁ।' মৃদু, মসৃণ, সুরেলা সুফিয়ার কণ্ঠ।

'কিন্তু ড্রামের আওয়াজ কোথায়?'

'আমার বুকের ভেতর।'

'দেখি?' মাথাটা কাত করে ওর বুকে কান ঠেকাল রানা।

সত্যিই! উদ্দাম, জংলী ছন্দ বাজছে সেখানে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে দেরি করে ফেলল রানা। ন'টা রিপোর্টিং টাইম, এখন বাজছে সোয়া ন'টা। প্যাসেঞ্জাররা লাউঞ্জ ছেড়ে কাস্টম আর ইমিগ্রেশন কাউন্টারে চলে গেছে।

লোহার শিকলটার কাছে এসে থেমে দাঁড়াল সুফিয়া আর জামিল। সুটকেসটা

নামিয়ে রাখল রানা মেঝের ওপর।

আনুষ্ঠানিক ভাবে করমর্দন করল রানা ক্যাপ্টেন জামিলের সাথে। হাসল। কিন্তু জামিল হাসল না।

রানার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল সুফিয়া।

'লুইস! এই শেষ?' ঠোঁট জোড়া কাঁপছে ওর।

আলতো করে চুমো খেল রানা ওর ঠোঁটে। তারপর তুলে নিতে গেল সুটকেসটা।

আপার আঁচলে চোখ মুছছে জামিল।

'কি রে, খুব খারাপ লাগছে বুঝি?' বলতে বলতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল সুফিয়ারও।

'হ্যাঁ।'

'আমারও।' পরিষ্কার বাংলায় বলল রানা।

'তুমি···তুমি বাংলা জানো?' চমকে গেল সুফিয়া।

'আমি বাংলাদেশী।'

হাঁ হয়ে গেল সুফিয়ার মুখটা। 'তুমি রানা এজেন্সির লোক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

ঠিক এমনি সময়ে লাউড স্পীকারে ভেসে এল ডাক।

'অ্যাটেনশান! মিস্টার মাসুদ রানা অভ বাংলাদেশ ইজ রিকোয়েস্টেড টু প্লীজ রিপোর্ট টু দা ইমিগ্রেশন ইমিডিয়েটলি। আই রিপিট। মিস্টার মাসুদ রানা অভ বাংলাদেশ ইজ···'

মাসুদ রানার নাম শুনেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল সুফিয়ার। দ্রুত চোখ বুলাল চারপাশে। না, অন্য কোন প্যাসেঞ্জার নেই। তবে কি···তবে কি···!

হাসছে রানা।

'চলি। ডাক পড়ে গেছে। দেরি দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা।'

'তবে কি তুমি···মানে আপনিই আমাদের চীফ মাসুদ রানা?'

'আপনি নয়, "তুমি"। চীফ-টীফ কিচ্ছু না, "বন্ধু"। হ্যাঁ আমি মাসুদ রানা। তোমার বন্ধু।'

'আমার জন্যে···আমারই জন্যে গিয়েছিলে তুমি পোর্ট রিপ্রিভে?'

'শুধু তোমারই জন্যে।' হাসল রানা। 'তোমাকে হাফ-ব্রীড মনে করি না আমরা। বিশ্বাস করো।'

অবিশ্বাস করার আর কোন কারণ খুঁজে পেল না সুফিয়া। আশ্চর্য এক গর্ব আর আত্মবিশ্বাসে বুকটা ভরে উঠল ওর। মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাসতে পারবে সে এবার। আর কোন ক্ষোভ নেই ওর মনে। রানা এজেন্সীর চীফ···তাকে···

'চলি, ক্যাপ্টেন,' জামিলের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সুফিয়ার উদ্দেশে। চোখ টিপল। 'দেখা হবে আবার। চলি।'

একহাতে সুটকেস, দীর্ঘ পদক্ষেপ; চলে গেল মাসুদ রানা।

'হায়, হায়, আপা!' হঠাৎ বলে উঠল জামিল। 'এতদিন আমরা বাংলায় কথা বলেছি, সবই বুঝেছে ক্যাপ্টেন! কি হবে এখন?'

'কিচ্ছু হবে না,' বলল সুফিয়া। ঠোঁটে সলজ্জ হাসি। 'চল, অফিসে যেতে হবে। অনেক কাজ আছে।'

***